বাংলা জাতীয় মাসিক

পরওয়ানা

www.parwana.net

মে ◆ ২০২১

আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.)'র

আত্‌তানভীর

[তাফসীরুল কুরআন]

এ সংখ্যায় রয়েছে...

তাসাওউফের দলীল
ইতিকাফ: সংক্ষিপ্ত আলোকপাত
ঈদুল ফিতর-এর দিনের আমল
প্রিয়নবী ﷺ এর রাত্রিকালীন ইবাদাত
ঐতিহাসিক বদর যুদ্ধের তাৎপর্য ও শিক্ষা
সায়্যিদ আহমদ বেরলভী (র.): চেতনার বাতিঘর
সাদাকাতুল ফিতর ও সংশ্লিষ্ট মাসাঈল
ইজমা-কিয়াস ও ইজতিহাদ
আফগানিস্তান: শান্তি কতদূর?
শ্রমের মর্যাদায় ইসলাম
স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ইসলামী নির্দেশনা

নিয়মিত
জীবন জিজ্ঞাসা
জানার আছে অনেক কিছু
একনজরে গত মাস
বিজ্ঞান
ক্যারিয়ার
আবাবীল ফৌজ
কবিতা
চিঠিপত্র

মীম ইসলামিক টিভি
MEEM ISLAMIC TV

Voice of Ummah

প্রতি মাসের নিয়মিত আয়োজন

- তাফসীরুল কুরআন
- দারসুল হাদীস
- সীরাতুল মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
- হায়াতুস সাহাবা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম
- দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম: আপনার জিজ্ঞাসা

বিশেষ আয়োজন

- সমকালীন বিষয়াবলি নিয়ে বিশেষ টক শো
- স্মরণীয় দিবস উপলক্ষে সেমিনার

আমাদের পরিকল্পনা

মীম ইসলামিক ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা

- হিফজুল কুরআন বিভাগ (২০২১ সাল থেকে শুরু)
- মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের কারিকুলাম অনুসরণে সর্বাধুনিক পদ্ধতি প্রয়োগে পাঠদান
- ভাষা শিক্ষা কোর্স (আরবী-ইংরেজি)
- কর্মমুখী শিক্ষা (কম্পিউটার, গ্রাফিক্স ডিজাইন, ড্রাইভিং ইত্যাদি)

একটি সমৃদ্ধ ওয়েবসাইট প্রতিষ্ঠা: যার মাধ্যমে ইতিহাস, দর্শন, মাসাঈলসহ ইসলামের সঠিক ধারার বক্তব্য উপস্থাপন করা।

মীম পাবলিকেশন: যার মাধ্যমে সুন্নী মতাদর্শ ভিত্তিক গ্রন্থ, ম্যাগাজিন, সুভেনির ইত্যাদি প্রকাশ করা।

চ্যারিটি ফান্ড: যার মাধ্যমে আর্তমানবতার বহুমুখী সেবা প্রদান করা

এ ছাড়া সময়োপযোগী প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে দ্বীন-মিল্লাতের কল্যাণ সাধন করা।

ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতি, দর্শন, মূল্যবোধ প্রচারের লক্ষ্যে
মীম ইসলামিক টিভির ফেইসবুক পেইজ ও ইউটিউব চ্যানেলের সাথে থেকে
সাবস্ক্রাইব, লাইক, কমেন্ট, শেয়ারের মাধ্যমে দ্বীনের খিদমতে অংশীদার হোন

সার্বিক দিকনির্দেশনায়: **আল্লামা জ.উ.ম আব্দুল মুনইম মনজলালী**

Meemislamictv

বাংলা জাতীয় মাসিক
পরওয়ানা
২৮তম বর্ষ ■ ৫ম সংখ্যা
মে ২০২১ ♦বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮ ♦ রামাদান-শাওয়াল ১৪৪২

পৃষ্ঠপোষক
মুহাম্মদ হুছামুদ্দীন চৌধুরী

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
আহমদ হাসান চৌধুরী

সম্পাদক
রেদওয়ান আহমদ চৌধুরী

সহকারী সম্পাদক
আখতার হোসাইন জাহেদ

নিয়মিত লেখক
আবু নছর মোহাম্মদ কুতুবুজ্জামান
রহমান মোখলেস
মোহাম্মদ নজমুল হুদা খান
মারজান আহমদ চৌধুরী

সহ-সম্পাদক
মুহাম্মদ উসমান গণি
মোহাম্মদ কামরুজ্জামান

সার্কুলেশন ম্যানেজার
এস এম মনোয়ার হোসেন

কম্পোজ ও প্রচ্ছদ ডিজাইন
পরওয়ানা গ্রাফিক্স

যোগাযোগ
সম্পাদক, মাসিক পরওয়ানা
বি.এন টাওয়ার (৯ম তলা)
২৮/১ বি, দৈনিক বাংলা মোড়, মতিঝিল
ঢাকা-১০০০
মোবাইল: ০১৭৯৩ ৮৭৭৭৮৮

সিলেট অফিস
পরওয়ানা ভবন
৭৪ শাহজালাল লতিফিয়া আ/এ
সোবহানীঘাট, সিলেট-৩১০০
মোবাইল: ০১৭৯৯ ৬২৯০৯০

parwanabd@gmail.com
www.parwana.net

মূল্য: ২৫ টাকা

সূচিপত্র

তাফসীরুল কুরআন
আত-তানভীর/আল্লামা আব্দুল লতিফ চৌধুরী ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ্ (র.)
অনুবাদ: মুহাম্মদ হুছামুদ্দীন চৌধুরী ০৩

শারহুল হাদীস
রামাদান ও অন্যান্য মাসে প্রিয়নবী ﷺ এর রাত্রিকালীন ইবাদাত
মোহাম্মদ নজমুল হুদা খান ০৬

সাহাবা
আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী (রা.)/ মাওলানা মো. নজমুদ্দীন চৌধুরী ০৮

তাসাওউফ
তাসাওউফের দলীল/ মাওলানা গিয়াস উদ্দিন চৌধুরী ০৯

প্রবন্ধ
ইতিকাফ: সংক্ষিপ্ত আলোকপাত/ আহমদ হাসান চৌধুরী ১২
ঈদুল ফিতর-এর দিনের আমল/ মুহাম্মদ হবিবুর রহমান ১৪
ঐতিহাসিক বদর যুদ্ধের তাৎপর্য ও শিক্ষা/ মোহাম্মদ মঈনুল ইসলাম পারভেজ ১৬
শাওয়ালের রোযার গুরুত্ব/ ইব্রাহিম আহমদ আরিফ ১৮

ফিকহ ও উসূল
সাদাকাতুল ফিতর ও সংশ্লিষ্ট মাসাঈল/ মো. কুতবুল আলম ১৯
ইজমা-কিয়াস ও ইজতিহাদ/ মোস্তফা মনজুর ২২

আউলিয়া
সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.): উপমহাদেশের ইসলামী চেতনার বাতিঘর
মারজান আহমদ চৌধুরী ২৪
সূফী নূর মুহাম্মাদ নিজামপুরী (র.): জীবন ও অবদান / মাসুক আহমেদ ২৭

আন্তর্জাতিক
আফগানিস্তান: এখনই সব মার্কিন সেনা সরছে না, শান্তি কতদূর?/ রহমান মোখলেস ৩৫

মনীষী
অধ্যাপক মুহাম্মদ আব্দুল মালেক (র.) জীবনালেখ্য ও অবদান/ আব্দুল্লাহ জুবায়ের ৩৮

মে দিবস স্মরণে
শ্রমের মর্যাদায় ইসলাম/ মাহফুজ আল মাদানী ৪০

সাক্ষাৎকার
একজন নওমুসলিমের অভিব্যক্তি: আযান আমার হৃদয়কে জাগিয়েছে ৪১

স্বাস্থ্য
স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ইসলামী নির্দেশনা ৪২

ফিচার
সুয়েজ খাল ৪৩

খাতুন
গায়ে হলুদ : একটি বিধর্মী অনুষ্ঠান/ সৈয়দা নাদিরা হোসেন ৪৪

নিয়মিত
জীবন জিজ্ঞাসা ৪৫
এক নজরে গত মাস ৫১
জানার আছে অনেক কিছু ৫৩
বিজ্ঞান ৫৪
ক্যারিয়ার ৫৫
কবিতা ৫৬
আবাবীল ফৌজ ৫৭
সম্পাদকীয় ০২

সম্পাদক কর্তৃক বি.এন টাওয়ার (৯ম তলা), ২৮/১ বি, দৈনিক বাংলা মোড়, মতিঝিল ঢাকা-১০০০ হতে প্রকাশিত এবং সানজানা প্রিন্টার্স, ৮১/১, নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০ হতে মুদ্রিত।

সম্পাদকীয়

نحمده ونصلى على رسوله الكريم– اما بعد

৬ মে ঐতিহাসিক বালাকোট দিবস। ১৮৩১ সালের এ দিনে বালাকোট প্রান্তরে ইংরেজদের দোসর শিখদের সাথে সম্মুখ সমরে শাহাদাত বরণ করেন উপমহাদেশের আধ্যাত্মিকতার প্রাণপুরুষ সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.)। জালিম ১০ হাজার শিখ সৈন্যের বিপরীতে মাত্র ছয়-সাত শত মুজাহিদীন এ লড়াইয়ে অবতীর্ণ হন। অসম এ যুদ্ধে হোসাইন (রা.) এর সার্থক অধঃস্তন পুরুষ হযরত সায়্যিদ আহমদ বেরলভী (র.) যখন অদম্য সাহসিকতার সাথে লড়ে যাচ্ছেন তখন অত্যাচারী শিখ সৈন্যদের দমন করার জন্য যারা তাঁকে আহ্বান করেছিল তারা যথাসময়ে নিরব কিংবা শত্রুপক্ষের ক্রীড়নকের ভূমিকা পালন করে বালাকোটের ময়দানে যেন কারবালারই পুনরাবৃত্তি ঘটিয়েছিল।

হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.) ছিলেন আল্লাহর মকবুল ওলী, তরীকতের ইমাম। দ্বীন ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে মুসলিম মানসে প্রতিষ্ঠা করার জন্য তিনি আজীবন চেষ্টা করে গেছেন। তাযকিয়ায়ে নাফস তথা মানুষের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করার জন্য তরীকায়ে মুহাম্মদিয়া প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে তিনি অগণিত মানুষকে রাহে লিল্লাহ নিবেদিত হবার প্রেরণায় উজ্জীবিত করেছেন। দেখিয়ে গেছেন তাদের ইহ ও পরকালীন কল্যাণের পথ। তাঁর প্রদর্শিত এ পথে আজও অসংখ্য-অগণিত মানুষ খুঁজে পায় মুক্তির ঠিকানা, তার পরিচালিত তরীকার পথ ধরে আজও জ্বলে ওঠে হাজারো প্রাণ, যাদের প্রভাবে আঁধার ঘেরা হৃদয়ের দ্বারে দ্বারে পৌঁছে যায় আলোর আহ্বান।

যেসব আলোকিত প্রাণ, প্রদীপ্ত দীপশিখা তরীকায়ে মুহাম্মদিয়ার ফায়য দিয়ে মানুষকে সঠিক পথের দিশা দিয়েছেন তাদের শীর্ষে রয়েছেন হযরত কারামত আলী জৌনপুরী (র.), সূফী নূর মুহাম্মদ নিযামপুরী (র.), হাফিয আহমদ জৌনপুরী (র.), সূফী ফতেহ আলী ওয়ায়েসী (র.), শাহ ইয়াকুব বদরপুরী (র.), ফুরফুরার মুজাদ্দিদে জামান হযরত আবূ বকর সিদ্দিকী (র.), হযরত শাহ নেছারুদ্দীন (র.) ও হযরত আল্লামা আব্দুল লতিফ চৌধুরী ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.) প্রমুখ জগদ্বিখ্যাত আল্লাহর ওলীগণ। বিশেষত বাংলা আসাম অঞ্চলের সিংহভাগ খানেকা-দ্বীনের দারসগাহ এই তরীকারই অবদান। অনাগত কালেও এ সিলসিলার অন্তর্ভুক্ত হয়ে দ্বীনের তরে নিবেদিত হবার শিক্ষা অর্জন করবে দুনিয়ার মানুষ। এখানেই হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.)-এর জীবনের সার্থকতা এবং এটিই আল্লাহর দরবারে তাঁর মাকবুলিয়াতের অন্যতম প্রমাণ। আল্লাহ তাঁর দরজা বুলন্দ করুন এবং তার রুহানী ফায়য দিয়ে আমাদের উপকৃত করুন। আমীন।

.....

রামাদান মুবারক শেষে খুশির বার্তা নিয়ে পবিত্র ঈদুল ফিতর আমাদের দ্বারে উপস্থিত হয়। এর মাধ্যমে মাসব্যাপী আত্মশুদ্ধির প্রশিক্ষণের সমাপ্তি ঘটে। ঈদুল ফিতর হলো রোযাদারের পারিশ্রমিক লাভের দিন, আনন্দে উদ্বেলিত হবার দিন, সহানুভূতি আর সহমর্মিতা প্রকাশের দিন। গরীব- দুঃখী, ধনী-দরিদ্র সবাই ঈদগাহে একত্রিত হয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ঈদের নামায পড়ার মাধ্যমে সব ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে সাম্যের অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করার দিন হলো পবিত্র ঈদের দিন। বর্তমান প্রেক্ষাপটে ঈদের এ শিক্ষা আমাদের জীবনে বাস্তবায়ন যেন আরো বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। সামাজিক ও সতর্কতার দূরত্ব আমাদের জীবনকে বিষিয়ে তুলেছে। এ অবস্থায় আমরা যেনো ইসলামের শিক্ষা থেকে বিন্দুমাত্র সরে না যাই। যদিও আমরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ঈদগাহে দাঁড়াতে না পারি তথাপি আমাদের উচিত পাড়া-প্রতিবেশী, গরীব-দুঃখী ও বঞ্চিত মানুষের পাশে সামর্থ্য অনুযায়ী দাঁড়ানো। শারীরিক দূরত্ব যেন সহানুভূতি ও সহযোগিতার অন্তরায় না হয় এটাই এই ঈদের কামনা। সবাইকে ঈদুল ফিতরের আগাম শুভেচ্ছা!

পবিত্র
ঈদুল ফিতর
উপলক্ষে
মাসিক পরওয়ানার
সকল পাঠক
গ্রাহক, এজেন্ট
বিজ্ঞাপনদাতা ও
শুভানুধ্যায়ীদের
জানাই

ঈদের শুভেচ্ছা

আত্ তানভীর

আল্লামা আব্দুল লতিফ চৌধুরী ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.)

অনুবাদ: মুহাম্মদ হুছামুদ্দীন চৌধুরী

الٓمٓ- ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ- هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ

আলিফ-লাম-মীম। এটা সেই কিতাব, যাতে কোনো সন্দেহ নেই, মুত্তাকীদের জন্য ইহা পথ প্রদর্শক।

الٓمٓ

এ ধরনের 'হরফ' যা কতগুলো সূরার শুরুতে রয়েছে, এ সম্পর্কে দুটি বক্তব্য রয়েছে। প্রথম বক্তব্য হচ্ছে, এগুলো হলো আশিক ও মাশুকের মধ্যে পরস্পর ভাব বিনিময়ের কতগুলো সংকেত। আর পৃথকভাবে একেকটি হরফ নিয়ে সম্বোধন করে আহ্বান করাই হচ্ছে অন্তিম ও অত্যধিক প্রেম-প্রীতির পদ্ধতি, এগুলো হলো প্রেমিকের সাথে প্রেমাস্পদের গোপন ভেদ। যার উপর কোনো পর্যবেক্ষকের নিয়ন্ত্রণ থাকে না অর্থাৎ যার অর্থ কোনো পর্যবেক্ষকও বুঝতে পারে না। যেমন কবি তার কবিতায় বলেন,

بين المحبين سر ليس يفشيه قول ولا قلم للخلق يحكيه

-দু'প্রেমিকের মধ্যে রয়েছে এমন কিছু গোপনীয় বিষয়, সৃষ্টি জগতের কাছে এমন কোনো কথা বা কলম সৃষ্টি হয়নি যা তা প্রকাশ করতে পারে।

হযরত আবূ বকর (রা.) হতে বর্ণিত, প্রত্যেক কিতাবেই কিছু গোপনীয় বিষয় থাকে, এ হরফগুলো হলো কুরআনের গোপনীয় কথা। হযরত আলী (রা.) বলেন, একথা অনস্বীকার্য যে, প্রত্যেক কিতাবের মধ্যে হৃদ্যতামূলক কিছু কথা থাকে, এ হরফগুলো হলো, কুরআনের হৃদ্যতার সংকেত[১]। দ্বিতীয় বক্তব্য হচ্ছে, কোনো কোনো আরিফ বলে থাকেন, ইলম বা জ্ঞানের উপমা হচ্ছে সাগরের মতো, যে সাগর থেকে প্রবাহিত হয়েছে একটি উপত্যকা, সে উপত্যকা প্রবাহিত হয়েছে একটি নদী, অতঃপর এই নদী থেকে প্রবাহিত হয়েছে একটি নালা। এ নালা থেকে প্রবাহিত হয়েছে ছোট একটি খাল।

একটি উপত্যকা সাগরের সমুদয় পানি ধারণ করতে পারে না, অনুরূপ একটি নদীও উপত্যকার সমুদয় পানি ধারণ করতে পারে না। এজন্য আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا

-তিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন, অতঃপর স্রোতধারা প্রবাহিত হতে থাকে নিজ নিজ পরিমাণ অনুযায়ী।[২]

ইলমের সাগর হলো আল্লাহর কাছে, তিনি এ সাগর থেকে তার রাসূলদেরকে উপত্যকাতুল্য দান করেন, রাসূলগণ তাদের ইলমের উপত্যকা থেকে আলিমদেরকে যা দান করেন তা নদীতুল্য। আলিমগণ তাদের ইলমের নদী থেকে সাধারণ মানুষকে তাদের সক্ষমতা অনুযায়ী যা দান করেন তা হলো নালার মতো, আর সাধারণ মানুষগণ তাদের ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী যা গ্রহণ করে তা ঐ খালের মতো।

এ বিষয়গুলো মূলত হাদীস শরীফ থেকেই চয়নকৃত। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, আলিমদের কিছু গোপন বিষয় রয়েছে, খলীফাদের অনুরূপ গোপন বিষয় রয়েছে, নবীগণের গোপন বিষয় রয়েছে, ফিরিশতাদের গোপন বিষয় রয়েছে, আর সমস্ত গোপনীয়তা আল্লাহ তাআলার কাছে রক্ষিত। উলামাদের গোপন তথ্য মূর্খ লোকেরা জানলে তা তারা অবশ্যই প্রকাশ করে দিত। খলীফাগণের গোপন তথ্য আলিমগণ জানলে তাদেরকে তারা গ্রহণ করত না। নবীদের গোপন তথ্য (যা সাধারণ মানুষ বুঝে না) খলীফাগণ জানলে অবশ্যই তাঁরা এর বিরোধিতা করত, নবীগণ ফিরিশতাদের গোপন তথ্য জানলে তাদেরকে দোষারোপ করতেন, ফিরিশতারা আল্লাহ তাআলার গোপনীয়তা সম্পর্কে জানতে পারলে তা নিয়ে তারা দিশেহারা হয়ে পড়তেন এবং ঘুরতে থাকতেন। এ রকম হওয়ার কারণ হচ্ছে বুদ্ধি ও জ্ঞানের দুর্বলতা। এর কারণ হলো তাদের বুঝের অপরিপক্কতা। এ অপরিপক্কতার জন্য তারা নিগূঢ় তথ্যের গোপন রহস্য বুঝতে পারেন না, যেভাবে বাদুরের চোখ সূর্যের আলো ধারণ করতে পারে না। অনুরূপভাবে কুরআনের এ হরফগুলোর মধ্যে গোপনীয় কিছু মাহাত্ম্য রয়েছে যা সাধারণ মানুষের বোধগম্য নয়।[৩]

হযরত শা'বী (র.) বলেন, এসব হরফ বা বর্ণ হচ্ছে আল্লাহ তাআলার একান্ত গোপনীয় বিষয়। কাজেই গোপনীয় বিষয়ে জানার চেষ্টা করো না। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এসকল হরফের অর্থ উপলব্ধি করতে আলিম সমাজ সক্ষম নয়। কোনো কোনো মুফাসসির এ বিচ্ছিন্ন হরফগুলোকে মুতাশাবিহ (অর্থাৎ যার অর্থ অস্পষ্ট ও বুঝা যায় না) বলেছেন।[৪]

ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ

ذٰلِكَ দূরবর্তী ইসমে ইশারা। যদিও আক্ষরিক দৃষ্টিকোণ থেকে কুরআন নিকটবর্তী, কিন্তু কুরআনের রহস্য আর নিগূঢ় তথ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে বুঝা যায় যে, কুরআনের সবই অদৃশ্য আর দূরের। অথবা দূরবর্তী ইসমে ইশারা এজন্য ব্যবহার করা হয়েছে যে, কুরআন লাওহে মাহফুজ হতে অবতীর্ণ হয়েছে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ

-নিশ্চয় এ কুরআন আমার কাছে সমুন্নত অটল রয়েছে লাওহে মাহফুযে।[৫]

ذٰلِكَ ইসমে ইশারার مشار اليه হয়েছে الكتاب। এজন্য ইসমে ইশারা مذكر ব্যবহার হয়েছে। আর এখানে কিতাব দ্বারা কুরআনকে বুঝানো হয়েছে।

পবিত্র কুরআন শরীফের অনেক নাম রয়েছে। নিম্নে এগুলো উল্লেখ করা হলো-

১. أُمُّ الْكِتَابِ যেমন- إِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ -নিশ্চয় ইহা কিতাবের মূল।

২. القران যেমন- بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ বরং এটি হচ্ছে মহিমান্বিত কুরআন।
৩. فرقان যেমন- تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ বরকতময় সেই সত্তা যিনি ফুরকান অবতীর্ণ করেছেন।
৪. تذكرة যেমন- وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ এটি পরহেযগার লোকদের জন্য নসীহত।
৫. ذكرى যেমন- وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ আপনি উপদেশ দিন। নিশ্চয় উপদেশ মুমিনদের উপকারে আসে।
৬. ذكر যেমন- وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ অর্থাৎ এ কুরআন তোমার জন্য (মুহাম্মদ ﷺ) আর তোমার কওমের জন্য নসীহত ও উপদেশ স্বরূপ।
৭. تنزيل যেমন- وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ নিশ্চয় ইহা জগৎসমূহের প্রতিপালকের পক্ষ হতে অবতীর্ণ।
৮. اَحْسَنَ الْحَدِيثِ যেমন- اللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ আল্লাহ তাআলা সর্বোত্তম বাণী অবতীর্ণ করেছেন।
৯. موعظة যেমন- قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ তোমাদের পরওয়ারদিগারের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে উপদেশ বাণী এসেছে।
১০. حكم যেমন- وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا এমনিভাবে আমি তা আরবী ভাষায় বিধানরূপে অবতীর্ণ করেছি।
১১. حِكْمَة যেমন- حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ ۖ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ ইহা পরিপূর্ণ জ্ঞান, তবে এ সতর্কবাণী তাদের কোনো উপকারে আসেনি।
১২. حكيم যেমন- تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ঐগুলো জ্ঞানগর্ভ কিতাবের আয়াত।
১৩. محكم যেমন- فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُّحْكَمَةٌ যখন মুহকাম সূরা অবতীর্ণ হয়।
১৪. شفاء যেমন- وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ-আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি মুমিনদের জন্য শিফা ও রহমত স্বরূপ।
১৫. رحمة যেমন- وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ-আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি মুমিনদের জন্য শিফা ও রহমত স্বরূপ।
১৬. هُدًى যেমন- هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ এ কুরআন মুত্তাকীদের জন্য হিদায়াতকারী।
১৭. هادي যেমন- إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ এ কুরআন হিদায়াতকারী ঐ সমস্ত লোকদের জন্য যারা প্রতিষ্ঠিত।
১৮. صِرَاطٌ لْمُسْتَقِيمَ যেমন- وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا এটি আমার সঠিক রাস্তা।
১৯. حبل الله যেমন- وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا তোমরা সকলেই আল্লাহ তাআলার রশি মজবুত করে ধর।
২০. روح যেমন- وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا এভাবে আমি তোমার নিকট ওহী পাঠিয়েছি।
২১. قصص যেমন- إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ অবশ্যই এগুলো সত্য কাহিনী।
২২. بَيَانٌ যেমন- هَٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ ইহা মানুষের স্পষ্ট বর্ণনা।
২৩. تِبْيَانٌ যেমন- وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ আমি আপনার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি প্রতিটি বিষয়ে বর্ণনা স্বরূপ।
২৪. مُبِينٌ যেমন- تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ঐগুলো স্পষ্ট কিতাবের আয়াত।
২৫. بَصَائِرُ যেমন- هَٰذَا بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُمْ এটি তোমাদের পরওয়ারদিগারের পক্ষ থেকে নিদর্শন স্বরূপ।
২৬. فَصْلٌ যেমন- إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ নিশ্চয় ইহা পার্থক্যকারী বাণী।
২৭. مَّثَانِيَ যেমন- اللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন উত্তম বাণী সম্বলিত কিতাব যা সুসামঞ্জস্য এবং যা পুনরায় তিলাওয়াত করা হয়।
২৮. نِعْمَةِ যেমন- وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ আপনার পরওয়াদিগারের পক্ষ থেকে প্রেরিত নিআমতের আলোচনা করুন।
২৯. بُرْهَانٌ যেমন- قَدْ جَاءَكُم بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ তোমাদের সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট এসেছে দলীল।
৩০. بَشِير যেমন- قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ بَشِيرًا وَنَذِيرًا এ আরবী ভাষায় প্রেরিত কুরআন সুসংবাদ প্রদানকারী এবং ভীতি প্রদর্শনকারী হিসেবে প্রেরিত হয়েছে।
৩১. نَذِير যেমন- قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ بَشِيرًا وَنَذِيرًا এ আরবী ভাষায় প্রেরিত কুরআন সুসংবাদ প্রদানকারী এবং ভীতি প্রদর্শনকারী হিসেবে প্রেরিত হয়েছে।
৩২. قَيِّمًا যেমন- قَيِّمًا لِّيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا ইহাকে করেছেন সুপ্রতিষ্ঠিত তাঁর কঠিন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করার জন্য।
৩৩. الْمُهَيْمِنًا যেমন- مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ এ কিতাব তার পূর্ববর্তী কিতাবে সত্যায়নকারী ও সংরক্ষক।
৩৪. النُّور যেমন- وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ আর তারা অনুসরণ করেছেন সেই নূরের যা তার সাথে অবতীর্ণ হয়েছে।
৩৫. الْحَقُّ যেমন- وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ নিশ্চয় ইহা নিশ্চিত সত্য।
৩৬. عَزِيزٌ যেমন- وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ নিশ্চয় ইহা মহিমান্বিত কুরআন।
৩৭. كَرِيمٌ যেমন- إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ নিশ্চয় ইহা সম্মানিত কুরআন।
৩৮. الْعَظِيم যেমন- وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ আমি আপনাকে سبع المثانى ও কুরআনে আযীম দান করেছি।
৩৯. مُبَارَكٌ যেমন- كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ এ কিতাব আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি বরকতময় করে।[৬]

الم প্রথম মুবতাদা ذالك দ্বিতীয় মুবতাদা আর الكتاب হচ্ছে খবর। এর পরের বাক্য প্রথম বাক্যের খবর অথবা محذوف الم مبتدا এর খবর। যা আসলে এরকম الم هذه আর ذالك কিতাবের بدل হয়ে خبر ثاني অথবা الم একটি বাক্য এবং الكتاب অপর আরো একটি বাক্য, আর এর মধ্যখানে কোনো অব্যয় বা حرف ব্যবহার করা হয়নি, যার কারণ এ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বাক্য প্রথম বাক্যের বয়ান। الريب মাসদার, এটি এসেছে رابني থেকে। অর্থ قلق النفس যা অধিকাংশ ক্ষেত্রে মন্দভাবে সন্দেহ করা অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ কুরআন যে আল্লাহ তাআলার নিকট হতে অবতীর্ণ হয়েছে, এ ব্যাপারে সন্দেহ করা কারো জন্য বাঞ্চনীয় নয়। হ্যাঁ, কেউ যদি সন্দেহ করেও থাকে, তার জন্য বলা হয়েছে, وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ এ কুরআন আল্লাহ তাআলার নিকট হতে অবতীর্ণ হয়েছে। এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকলে এ ধরনের একটি সূরা প্রণয়ন করো দেখি। কাজেই এখানে সন্দেহ করার কোনো অবকাশ নেই, যদিও কেউ কেউ সন্দেহ করে থাকে।

هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

هُدًى শব্দটি মাসদার, অর্থ হিদায়াত যা গোমরাহীর বিপরীত এবং মুত্তাকী শব্দটি اسم فاعل وقاه فاتقي থেকে এর সীগাহ। وقايت এমন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন অবস্থার নাম, যাতে খুবই কঠোরভাবে নিজেকে সংরক্ষণ করা হয়। المتقي বলা শরীআতের দৃষ্টিতে যা হারাম তা থেকে পরহেযকারীকে। تقوى শব্দের প্রকৃত অর্থ হলো ভীতি আবার কখনো তাকওয়া শব্দ দ্বারা ঈমান বুঝানো হয়। যেমন- أَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ اي التوحيد অর্থাৎ একত্ববাদের উপর বিশ্বাস করা অবশ্যই তোমাদের জন্য জরুরী। আবার কখনো تقوي দ্বারা 'তাওবা' বুঝায়। যেমন- وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ

الْقُرٰى آمَنُوا وَاتَّقَوْا اى تابوا অর্থাৎ যদি গ্রামবাসীরা ঈমান আনত আর তাকওয়া ধারণ করত অর্থাৎ তাওবা করত। আবার কখনো গোনাহ ছেড়ে দেওয়াকে বোঝায়। যেমন-وَأْتُوْا الْبُيُوْتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ۚ وَاتَّقُوْا اللهَ অর্থাৎ তোমরা ঘরের দরজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করো এবং আল্লাহকে ভয় করো। আবার কখনো ইখলাস (অর্থাৎ বিশুদ্ধতা যেখানে রিয়ার কোনো অবকাশ থাকে না) অর্থ হয়। যেমন অন্যত্র এসেছে فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ اى من اخلاصها আর تقوٰى হচ্ছে মর্যাদাবান হওয়ার শ্রেষ্ঠতম পন্থা। এজন্য আল্লাহ তাআলা বলেন, إِنَّ اللهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوا -আল্লাহ তাআলা মুত্তাকীদের সাথেই রয়েছেন।

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ আল্লাহ তাআলার কাছে মুত্তাকী লোকই সবচেয়ে বেশি সম্মানী।

وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ তোমার পাথেয় সংগ্রহ করো; তাকওয়া হচ্ছে সর্বোত্তম পাথেয়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি মানুষের মধ্যে বেশি সম্মানী হতে চায়, সে যেন আল্লাহকে ভয় করে। আর যে ব্যক্তি মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী হতে চায়, সে যেন আল্লাহর উপর ভরসা করে, আর যে ব্যক্তি মানুষদের মধ্যে সব থেকে বেশি ধনী হতে চায় সে যেন তার কাছে যা আছে, এর চেয়ে আল্লাহ তাআলার কাছে যা আছে তাকে অধিক মজবুত মনে করে।[৭]

আর হযরত আলী (রা.) বলেন, তাকওয়া হলো ترك الاصرار على المعصية وترك الاغترار بالطاعة বারবার গোনাহ করার অভ্যাস ছেড়ে দেওয়া। আর প্রতারণা ছেড়ে দিয়ে আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করা।[৮]

হযরত ইবরাহীম বিন আদহাম (রা.) বলেন, تقوٰى হলো, (নিজে এমন হওয়া যে) সৃষ্টিজগত তোমার কথার মধ্যে কোনো দোষ পাবে না। আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত ফিরিশতারা তোমার কাজের মধ্যে কোনো দোষ পাবে না, আরশ বহনকারী ফিরিশতারা তোমার অন্তরের মধ্যে কোনো ত্রুটি খোঁজে পাবে না। হযরত ওয়াকিদী (রা.) বলেন, অন্তরকে সত্য গ্রহণ করার জন্য সজ্জিত করে রাখার নাম হচ্ছে তাকওয়া।[৯]

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা রামাদান মাসে কুরআন অবতীর্ণ করেছেন মানুষের হিদায়াতের জন্য। এ আয়াত থেকে বুঝা যাচ্ছে ناس (মানুষ) মুত্তাকীর মধ্যে সীমাবদ্ধ আর মুত্তাকী ছাড়া অন্য যত সব মানুষ আছে তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন, أُولٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ -তারা চতুষ্পদ জন্তুর মতো, বরং তাদের চেয়েও নিকৃষ্টতর। এখন কথা হচ্ছে, যে ব্যক্তি মুত্তাকী, সে তো হিদায়াতপ্রাপ্ত। তাকে দ্বিতীয়বার কীভাবে হিদায়াত করা যাবে? এর জবাব হচ্ছে মুত্তাকীগণ হিদায়াতের দ্বারা উপকৃত হতে থাকবেন। এজন্য মুত্তাকীন শব্দটি বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়া এ শব্দটি مجاز (রূপক) নয়, এর আভ্যন্তরীণ অর্থ নিতে হবে। বালাগাতের নিয়ম অনুসারে কোনো জিনিসের নাম উল্লেখ করে তার আসল অর্থ না নিয়ে তা যাকে ইঙ্গিত করে, তা নেওয়ার প্রথা রয়েছে। যেমন- من قتل قتيلا فله سلبه অর্থাৎ যেই যাকে হত্যা করবে তার জন্যই নিহতের পরিত্যক্ত সম্পত্তি।

১। তাফসীরে বাগাভী, সূরা বাকারা, ১/৫৮, ২। সূরা বাকারা, আয়াত-১৭, ৩। আত তাফসীরুল কাবীর, ইমাম রাযী, সূরা বাকারা, ৪। প্রাগুক্ত, ৫। সূরা আয যুখরুফ, আয়াত-০৪, ৬। মাফাতিহুল গায়ব, ইমাম রাযী, ২/২৬০-২৬৫, ৭। হিলয়াতুল আউলিয়া, ৩/২৫৩, ৮। তাফসীরে মাফাতিহুল গায়ব, ইমাম রাযী, সূরা বাকারা, ২/২০, ৯। প্রাগুক্ত

বাংলা জাতীয় মাসিক
পরওয়ানা

- ধর্ম-দর্শন, মাসআলা-মাসাইল, ফাদ্বাইল ও আমালিয়াত বিষয়ে লিখুন
- ইতিহাস-ঐতিহ্য, সমাজ-সংস্কৃতি, সমসাময়িক, দেশজ ও আন্তর্জাতিক বিষয়ে তথ্য সমৃদ্ধ লেখা পাঠান
- মুসলিম মনীষী, আউলিয়াদের জীবন ও গৌরবময় অতীতের আলোকোজ্জ্বল কাহিনি তুলে আনুন আপনার লেখায়

প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে পরবর্তী সংখ্যার জন্য নিম্নোক্ত ই-মেইলে লেখা পাঠাতে হবে
E-mail: parwanabd@gmail.com

পরওয়ানা-এর গ্রাহক হওয়ার জন্য ভাবছেন?

পরওয়ানার অনুকূলে আপনার নাম ও পূর্ণ ঠিকানা লিখে পাঠান

বার্ষিক চাঁদার হার

বাংলাদেশ	ঃ ৩০০ টাকা
ভারত	ঃ ১৫০০ টাকা
মধ্যপ্রাচ্যের সকল দেশ	ঃ ২০০০ টাকা
যুক্তরাজ্য ও ইউরোপের সকল দেশ	ঃ ৪০ পাউন্ড/ইউরো
যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা	ঃ ৫০ মার্কিন ডলার

এজেন্সির নিয়মাবলি

- ফোন/ই-মেইল/হোয়াটসঅ্যাপ ও অফিসে যোগাযোগ করে চাহিদা জানালে এজেন্সি দেওয়া হয়
- ১০ কপির কমে এজেন্সি দেওয়া হয় না
- প্রত্যেক ৫ কপিতে ১টি সৌজন্য কপি দেওয়া হয়
- সরাসরি এজেন্টের কাছে পত্রিকা পৌঁছানো হবে
- আশেপাশের এজেন্টের ক্ষতি হবে না, এমন নিশ্চয়তা থাকতে হবে।
- যেকোনো সময় কর্তৃপক্ষ যে কারো এজেন্টশিপ বাতিল/পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখে। সেক্ষেত্রে গ্রাহকদের বিকল্প মাধ্যমে পত্রিকা পৌঁছিয়ে দেওয়া হবে

যোগাযোগ
সার্কুলেশন ম্যানেজার
মাসিক পরওয়ানা
বি.এন টাওয়ার, ২৮/১ বি, দৈনিক বাংলা মোড়, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
সিলেট অফিস: পরওয়ানা ভবন ৭৪, শাহজালাল লতিফিয়া আ/এ সোবহানীঘাট, সিলেট-৩১০০
মোবাইল: ০১৭৯৯৬২৯০৯০ (বিকাশ)

রামাদান ও অন্যান্য মাসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রাত্রিকালীন ইবাদাত

মোহাম্মদ নজমুল হুদা খান

হাদীসের মূলভাষ্য

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ فَقَالَتْ مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْئَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْئَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي –

অনুবাদ

হযরত আবূ সালামা ইবনু আবদির রাহমান (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত আয়িশা (রা.) কে প্রশ্ন করেছিলেন, রামাদান মাসে রাসূলে পাক ﷺ এর নামায কেমন ছিল? আয়িশা (রা.) উত্তরে বলেন, রাসূল ﷺ রামাদান ও অন্য মাসে এগার রাকাআতের বেশি পড়তেন না। তিনি চার রাকাআত নামায পড়তেন। তুমি এর দীর্ঘতা ও সৌন্দর্য সম্পর্কে প্রশ্ন করো না অতঃপর তিনি আরো চার রাকাআত নামায পড়তেন। তুমি এরও দীর্ঘতা ও সৌন্দর্য সম্পর্কে প্রশ্ন করো না। এরপর তিনি তিন রাকাআত নামায (বিতর) পড়তেন। আয়িশা (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি বিতর পড়ার আগে ঘুমান? উত্তরে তিনি বললেন, হে আয়িশা! আমার দুই চোখ ঘুমায় কিন্তু অন্তর ঘুমায় না। (সহীহ বুখারী, কিতাবুত তাহাজ্জুদ, بَاب قِيَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ فِي رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ)

হাদীসের ব্যাখ্যা

এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর রাতের নামায সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। হযরত আবূ সালামা (রা.) জানতে চেয়েছিলেন রামাদান মাসে রাসূলুল্লাহ ﷺ কীরূপ নামায পড়তেন। আয়িশা (রা.) বলেছেন, রাসূল ﷺ রামাদান ও অন্য মাসে এগার রাকাআতের বেশি পড়তেন না। এ জবাব থেকে বুঝা যায় যে, হযরত আবূ সালামা (রা.) রামাদান মাসে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর তাহাজ্জুদ নামায সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলেন।

রামাদান ও রামাদান ছাড়া অন্যান্য মাসে রাতের বেলা যে নামায পড়া হয় সেটি হলো তাহাজ্জুদ। আর রামাদান মাসে রাতের বেলা বিশেষভাবে যে নামায পড়া হয় তা হলো তারাবীহ। রাসূলুল্লাহ ﷺ রামাদান মাসে রাতের বেলা যেমন বিতরসহ এগারো রাকাআত নামায অর্থাৎ তাহাজ্জুদ আট রাকাআত ও বিতর তিন রাকাআত পড়তেন, তেমনি রামাদান ছাড়া অন্যান্য মাসেও রাতের বেলা অনুরূপ এগারো রাকাআত নামায পড়তেন। এটি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাধারণ অভ্যাস ছিল। বেশিরভাগ তিনি এভাবে এগার রাকাআতই পড়তেন। তবে কখনো এর চেয়ে কমবেশি করতেন না এমন নয়। বরং অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর রাতের নামায ছিল তের রাকাআত। (সহীহ বুখারী, কিতাবুত তাহাজ্জুদ,بَاب كَيْفَ كَانَ صَلَاةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ)

অপর হাদীসে আছে, হযরত মাসরুক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত আয়িশা (রা.)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর রাতের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, ফজরের দু রাকাআত সুন্নত বাদ দিয়ে সাত বা নয় কিংবা এগারো রাকাআত। (সহীহ বুখারী, কিতাবুত তাহাজ্জুদ, বাব-প্রাগুক্ত)

এ হাদীস আট রাকাআত তারাবীহ'র দলীল নয়

কেউ কেউ এ হাদীস আট রাকাআত তারাবীহ'র দলীল হিসেবে পেশ করতে চান। এটি সঠিক নয়। কেননা তারাবীহ রামাদান মাসের বিশেষ (খাস) নামায। আর রাসূল ﷺ যে এগার রাকাআত নামায পড়তেন তা রামাদানের খাস নামায ছিল না বরং এই এগারো রাকাআত তিনি রামাদান ছাড়া অন্যান্য মাসেও পড়তেন, যা হাদীস থেকে সুস্পষ্ট।

ইমাম বুখারী (র.) এ হাদীস দ্বারা কী উদ্দেশ্য নিয়েছেন

জমহুর মুহাদ্দিসীন এ হাদীসকে তাহাজ্জুদ নামাযের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন; তারাবীহ'র ক্ষেত্রে নয়। ইমাম বুখারী (র.)ও এটি তাহাজ্জুদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন। তিনি এখানে হাদীসের বাবের যে শিরোনাম দিয়েছেন তা থেকেই বিষয়টি সুস্পষ্ট। শিরোনামটি হলো- بَاب قِيَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ فِي رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ-রামাদান ও অন্যান্য মাসে প্রিয়নবী ﷺ এর রাত্রিকালীন ইবাদাত সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ।

যেহেতু এতে রামাদান মাসের নামাযের কথাও আছে সেহেতু 'বাবু ফাদলি কিয়ামি রামাদান' এর মধ্যেও তিনি এ হাদীস এনেছেন। আবার রাসূল ﷺ এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য 'তার চোখ ঘুমায় কিন্তু অন্তর ঘুমায় না' এ অংশের বিবেচনায় কিতাবুল মানাকিব-এ باب كان النبي صلى الله عليه و سلم تنام عيناه ولا ينام قلبه শীর্ষক পরিচ্ছেদে এ হাদীস এনেছেন।

হাদীসে বর্ণিত নামাযের পদ্ধতি

এ হাদীসে প্রিয়নবী ﷺ এর রাতের নামাযের যে বর্ণনা পাওয়া যায় তা হলো- তিনি প্রথমে চার রাকাআত নামায পড়তেন। তা ছিল অত্যন্ত দীর্ঘ এবং অত্যন্ত সুন্দর, যা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তাই আয়িশা (রা.) বলেছেন, তুমি এর দৈর্ঘ্য ও সৌন্দর্য সম্পর্কে প্রশ্ন করো না। এরপর তিনি অনুরূপ আরো চার রাকাআত নামায পড়তেন। এরপর তিনি তিন রাকাআত বিতর নামায পড়তেন।

হাদীসের পরবর্তী ভাষ্য থেকে বুঝা যায়, আট রাকাআত নামায পড়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘুমিয়ে পড়তেন। এরপর উঠে বিতর পড়তেন। কেননা, বর্ণনাকারী প্রশ্ন করেছেন, তিনি বিতর পড়ার আগে কি ঘুমান? আয়িশা (রা.) জবাবে বলেছেন, তার চোখ ঘুমায় কিন্তু অন্তর ঘুমায় না।

অর্থাৎ তিনি ঘুমিয়ে যেতেন কিন্তু তাঁর অন্তর ঘুমাতো না। এটি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নামাযের দীর্ঘতা সম্পর্কে ইমাম তাবারানী'র 'আল আওসাত' গ্রন্থে এসেছে, হযরত আনাস (রা.) বলতেন,

كان رسول الله يحيى الليل بثمان ركعات ركوعهن كقراءتهن وسجودهن كقراءتهن ويسلم بين كل ركعتين

-রাসূলুল্লাহ ﷺ আট রাকাআত নামাযের মাধ্যমে রাত অতিবাহিত করতেন। এ নামাযের কিরাত যতটুকু দীর্ঘ হতো রুকূও হতো ততটুকু দীর্ঘ এবং সিজদাও হতো কিরাতের মতো দীর্ঘ। আর প্রত্যেক দু রাকাআত পরপর তিনি সালাম ফিরাতেন।

সহীহ বুখারীর বর্ণনায় চার রাকাআত করে নামায পড়ার বর্ণনা এসেছে আবার তাবারানীর বর্ণনায় দু রাকআত করে নামায পড়ার বর্ণনা এসেছে। তাবারানীর এ বর্ণনা 'রাতের নামায দু রাকাআত দু রাকাআত করে' এ হাদীসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আর চার রাকাআত করেও তাহাজ্জুদ বা নফল নামায পড়া যায়। হতে পারে দুই বর্ণনা দুই পৃথক সময়ের।

এ হাদীসে দেখা যায় রাসূলুল্লাহ ﷺ বিতর নামায তিন রাকাআত পড়েছেন। সুতরাং হাদীসটি তিন রাকাআত বিতর নামাযেরও দলীল।

লা-মাযহাবীদের দলীল ও আমলের ভিন্নতা

আহলে হাদীস নামধারী লা-মাযহাবীগণ এ হাদীসকে আট রাকাআত তারাবীহ'র দলীল হিসেবে গ্রহণ করেন অথচ এ হাদীস ও তাদের আমলের মধ্যে অনেক ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। যেমন-

১. যদি লা-মাযহাবীরা এ হাদীসকে আট রাকাআত তারাবীহ'র দলীল হিসেবে গ্রহণ করেন, তবে রামাদান ছাড়া বাকি এগারো মাসও এটি পড়তে হবে। কিন্তু তারা এরূপ পড়েন না।

২. এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়, রাসূল ﷺ চার রাকাআত করে নামায পড়তেন অথচ গায়র মুকাল্লিদ তথা লা-মাযহাবীগণ দু'রাকআত করে পড়েন।

৩. এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়, রাসূল ﷺ একা একা নামায পড়তেন। কিন্তু গায়র মুকাল্লিদগণ পুরো রামাদান মাস জামাআতের সাথে তারাবীহ পড়েন।

৪. উক্ত হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়, রাসূল ﷺ এ নামায ঘরে পড়তেন। অথচ গায়র মুকাল্লিদগণ সারা রামাদান মাস ঘরের বদলে মসজিদে এ নামায পড়ে থাকেন।

৫. এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়, রাসূল ﷺ নামায পড়ে ঘুমিয়ে যেতেন। ঘুম থেকে উঠে বিতর পড়তেন। অথচ গায়র মুকাল্লিদগণ তারাবীহর সাথে সাথে ঘুমানোর পূর্বেই বিতর আদায় করে নেন।

৬. এ হাদীস থেকে আরো প্রমাণিত হয় যে, রাসূল ﷺ একা একা বিতর আদায় করতেন, অথচ গায়র মুকাল্লিদগণ জামাআতের সাথে বিতর আদায় করেন।

৭. এ হাদীস থেকে এটিও প্রমাণিত হয় যে, রাসূল ﷺ সারা বছর (রামাদান ও রামাদান ছাড়া) বিতর নামায এক সালামে তিন রাকাআত পড়তেন, কিন্তু গায়র মুকাল্লিদগণ বেশির ভাগ সময়ে এক রাকআত বিতর পড়েন। কখনো তিন রাকাআত পড়লে তা দু সালামে পড়েন।

মুফতী মাওলানা মো. গিয়াস উদ্দিন চৌধুরী ফুলতলী তদীয় 'তাকলীদ-এর সুদৃঢ় রজ্জু'-এর মধ্যে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। পাঠকবৃন্দ চাইলে তা দেখে নিতে পারেন।

তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ এক নামায নয়

প্রকাশ থাকে যে, লা-মাযহাবীগণ বলে থাকেন, তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ নামায এক। তাদের এ বক্তব্যও সঠিক নয়। কেননা রাসূলে পাক ﷺ ও সাহাবায়ে কিরামের যুগে তারাবীহ প্রথম রাতে ও তাহাজ্জুদ শেষ রাতে পড়া হতো। যেমন তিরমিযী শরীফে হযরত আবূ যর (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে রাসূল ﷺ রাতের প্রথমভাগে তারাবীহ পড়েছেন। এ হাদীসে রামাদানের ২৩, ২৫ ও ২৭ তম রাতে দীর্ঘ সময় নিয়ে তারাবীহ পড়ার বর্ণনা এসেছে। ২৩তম রাতে তারাবীহ'র নামাযে রাতের এক তৃতীয়াংশ ও ২৫তম রাতে রাতের অর্ধাংশ অতিবাহিত হয়। আর ২৭ তম রাতে এমন দীর্ঘ সময় নিয়ে রাসূল ﷺ তারাবীহর নামায পড়লেন যাতে সাহাবায়ে কিরাম সাহরীর সময় চলে যাওয়ার আশঙ্কা করেছিলেন। এ তিন রাতের সমন্বিত বর্ণনা প্রমাণ করে যে, তারাবীহর নামায রাতের প্রথমভাগের নামায। আর তাহাজ্জুদ যে শেষ রাতের নামায তা সর্বজন স্বীকৃত। ইমাম তাবারানীর আল মু'জামুল কাবীর, আল মু'জামুল আওসাত, ইমাম নূরুদ্দীন আল হায়সামী'র 'মাজমাউয যাওয়াইদ' সহ বিভিন্ন গ্রন্থে আছে, সাহাবী হযরত হাজ্জাজ ইবনু আমর থেকে বর্ণিত বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন,

بِحَسْبِ أَحَدِكُمْ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يُصَلِّي حَتَّى يُصْبِحَ أَنَّهُ قَدْ تَهَجَّدَ، إِنَّمَا التَّهَجُّدُ: الْمَرْءُ يُصَلِّي الصَّلاَةَ بَعْدَ رَقْدَةٍ، ثُمَّ الصَّلاَةَ بَعْدَ رَقْدَةٍ، وَتِلْكَ كَانَتْ صَلاَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

-তোমাদের কোনো ব্যক্তি রাতের বেলা সুবহে সাদিক পর্যন্ত যে নামায পড়ে তা তার তাহাজ্জুদ হিসেবে যথেষ্ট হবে। প্রকৃতপক্ষে তাহাজ্জুদ হলো, কোনো ব্যক্তি ঘুম থেকে উঠে যে নামায পড়ে, এরপর আবার ঘুম থেকে উঠে যে নামায পড়ে। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নামায এরূপ ছিলো।

এ হাদীস থেকে বুঝা যায়, ঘুম থেকে উঠে শেষ রাতে যে নামায পড়া হয় মূলত তাই তাহাজ্জুদ।

শেষ কথা

সাহাবায়ে কিরাম (রা.) রাসূল ﷺ এর আমল সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত ছিলেন। হাদীস শরীফের অর্থ ও মর্ম তারাই বেশি জানতেন ও বুঝতেন। তারা উপরোক্ত আয়িশা (রা.)-এর হাদীসকে তাহাজ্জুদের বিবরণ হিসেবে গ্রহণ করেছেন, তারাবীহ'র বিবরণ হিসেবে নয়। যদি এ হাদীস তারাবীহ প্রসঙ্গে হতো তাহলে সাহাবায়ে কিরাম তারাবীহ আট রাকাআতই পড়তেন, বিশ রাকাআত পড়তেন না। এ হাদীস থেকে এ বিষয়টিও স্পষ্ট হয় যে, তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ হলো ভিন্ন নামায। যার ফলে আট রাকাআত তাহাজ্জুদের হাদীস বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও সাহাবায়ে কিরাম তারাবীহ নামায বিশ রাকাআত পড়তেন। সুতরাং এ হাদীসকে আট রাকাআত তারাবীহ'র দলীল হিসেবে পেশ করা যথার্থ নয়।

সাহাবা

আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী (রা.)

মাওলানা মো. নজমুদ্দীন চৌধুরী

(পূর্ব প্রকাশের পর)

বিভিন্ন যুদ্ধ ও অভিযানে হযরত আলী (রা.)

হযরত আলী (রা.) উমরাতুল কাযায় রাসূল ﷺ এর সঙ্গে ছিলেন। ৬ষ্ঠ হিজরী সনে হুদায়বিয়ার সন্ধি হয়। এ সন্ধির একটি শর্ত ছিল যে, মুসলমানগণ এ বছর ফিরে যাবেন এবং পরবর্তী বছর মক্কায় আসবেন তিন দিন অবস্থান করবেন। এ সময় প্রত্যেকে তরবারি খাপে বন্ধ রাখতে হবে। সে মুতাবিক পরবর্তী বছর ৭ম হিজরীর যুলকাআদা মাসে রাসূল ﷺ উমরার নিয়তে মক্কায় আগমন করেন এবং উমরা আদায় করেন। এটাকে উমরাতুল কাযা বলা হয়। এ উমরার পর রাসূল ﷺ যখন মক্কা থেকে বের হলেন তখন হযরত হামযা (রা.) এর মেয়ে (যার বয়স তখন কম ছিল) তাঁর পিছু নিলেন এবং 'ইয়া আম্মি' 'ইয়া আম্মি' বলে চিৎকার করতে লাগলেন। হযরত আলী (রা.) তাঁকে সঙ্গে নিয়ে হযরত ফাতিমা (রা.)-এর কাছে আসলেন। ফাতিমা তাঁকে নিজ বাহনে উঠিয়ে নিলেন। তারপর এ মেয়ের অভিভাবকত্ব নিয়ে হযরত আলী (রা.), জাফর (রা.) এবং যায়দ বিন হারিসার মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিল। হযরত আলী (রা.) বললেন, এ মেয়ে আমার চাচাতো বোন এবং আমিই তাঁকে প্রথমে এনেছি। হযরত জাফর বললেন, আমার চাচাতো বোন এবং এর খালা আমার কাছে আছেন। হযরত যায়দ (রা.) বললেন, আমার ভাইয়ের মেয়ে। হযরত যায়দ (রা.) ভাইয়ের মেয়ে বলার কারণ হিজরতের পূর্বে রাসূল ﷺ মক্কায় সাহাবায়ে কিরামকে একে অন্যের সাথে ভাই করে দিয়েছিলেন। তখন হযরত হামযা (রা.) এর ভাই হয়েছেন হযরত যায়দ (রা.)। শেষ পর্যন্ত হযরত হামযা (রা.) এর মেয়েকে তাঁর খালা হযরত আসমা বিনতে উমাইসের কাছে দিয়ে দিলেন এবং বললেন, খালা মায়ের সমতুল্য। এদিন রাসূল ﷺ হযরত আলী (রা.) কে বলেছিলেন, انت منى وانا منك -তুমি আমার এবং আমি তোমার (আপনজন)। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা ২৬৭)

হযরত আলী মক্কা বিজয়, হুনায়ন ও তায়েফের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন এবং অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করেছেন। উমরা জি'রানায় হযরত আলী (রা.) রাসূল ﷺ এর সঙ্গে ছিলেন। (প্রাগুক্ত, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা ২২৫)

পবিত্র মক্কা থেকে এক মানযিল দূরে অবস্থিত একটি স্থান জি'রানা। ইহা হিল্ল এ অবস্থিত। তায়েফের দিক থেকে আগত লোকেরা এখানে ইহরাম করেন। হাওয়াজিনের যুদ্ধের পর গনীমতের মালসমূহ জি'রানায় আনা হয়। রাসূল ﷺ হাওয়াজিনের গনীমত এখানে বণ্টন করেছেন। রাসূল ﷺ জি'রানা থেকে ইহরাম করে মক্কায় আগমন করেন। এক বর্ণনা মতে ইশার নামায জি'রানায় পড়েন এবং ফজরের নামায মক্কায় পড়েছিলেন। এই উমরাকে উমরায়ে জি'রানা বলা হয়। হযরত আলী (রা.) এ উমরায় রাসূল ﷺ এর সঙ্গে ছিলেন। (প্রাগুক্ত, খণ্ড ৭, আসাহহুস সিয়ার)

হুযূর ﷺ তাবুক থেকে ফিরে আসার পর বাকী রামাদান, শাওয়াল, যুলকাআদা মদীনায় অবস্থান করলেন। তারপর হযরত আবূ বকর (রা.) কে আমীর করে হজ্জের জন্য পাঠান, যাতে তিনি মুসলমানদের হজ্জ করান। মদীনা থেকে হযরত আবূ বকর (রা.) এর সঙ্গে ৩০০ জন লোক রওয়ানা হন। রাসূল ﷺ ১০টি উট কুরবানীর জন্য হযরত আবূ বকর (রা.) এর সাথে দিয়েছিলেন। হযরত আবূ বকর নিজের পক্ষ থেকে পাঁচটি উট কুরবানীর জন্য নিয়েছিলেন।

ইবনে ইসহাকের বর্ণনা অনুযায়ী এরপর সূরা বারাআতের সন্ধি ভঙ্গ সম্পর্কিত আয়াত নাযিল হয়। তখন রাসূল ﷺ হযরত আলীকে নিজের উটনী (আদবা) সঙ্গে দিয়ে প্রেরণ করলেন, যাতে হযরত আলী (রা.) সূরা বারাআত কাফিরদের সামনে পড়ে শুনান।

ইবনে সা'দের বর্ণনা অনুযায়ী হযরত আবূ বকর (রা.) 'আরজ' নামক স্থানে যখন পৌঁছলেন তখন হযরত আলী (রা.) রাসূল ﷺ এর উটনীতে সাওয়ার হয়ে পৌঁছলেন। হযরত আবূ বকর (রা.) হযরত আলী (রা.) কে দেখে বললেন, আপনি আমীর হিসেবে এসেছেন না মা'মুর (অধীন) হিসেবে। হযরত আলী উত্তর দিলেন মা'মুর (অধীন) হিসেবে এসেছি। ইবনে সা'দ বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আবূ বকর (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, রাসূল ﷺ আপনাকে মানাসিকে হজ্জ আদায় করানোর জন্য পাঠিয়েছেন? হযরত আলী (রা.) উত্তর দিলেন, না। আমি শুধু সূরা বারাআতের ঘোষণা করব। হজ্জ আপনি করাবেন। সে সময় কাফিরগণ কোনো সন্ধিকে তখন ভঙ্গ হিসেবে গণ্য করত যখন সন্ধিকর্তা নিজে অথবা তাঁর পরিবারের কেউ সন্ধি ভঙ্গের ঘোষণা দিতেন। এজন্য রাসূল ﷺ হযরত আলীকে সন্ধি ভঙ্গের ঘোষণার জন্য পাঠিয়েছিলেন।

চলবে

হযরত আল্লামা ফুলতলী
ছাহেব কিবলাহ (র.)
লিখিত
তাফসীর গ্রন্থ
আত্‌তানভীর
থেকে
সুরা ফাতিহার
তাফসীরের বঙ্গানুবাদ
শীঘ্রই
প্রকাশ হচ্ছে

তাসাওউফের দলীল

মাওলানা গিয়াস উদ্দিন চৌধুরী

عَنْ عُمَرَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: "بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ، إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ، لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ. حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. قَالَ: صَدَقْتَ. فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ! قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ. قَالَ: أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. قَالَ: صَدَقْتَ. قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ. قَالَ: أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ. قَالَ: مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ. قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا؟ قَالَ: أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا، وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ. ثُمَّ انْطَلَقَ، فَلَبِثْنَا مَلِيًّا، ثُمَّ قَالَ: يَا عُمَرُ أَتَدْرِي مَنِ السَّائِلُ؟. قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ".

-হযরত উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট বসা ছিলাম। এমন সময় ধবধবে সাদা পোশাক ও ঘনকালো চুল বিশিষ্ট একজন লোক আমাদের নিকট উপস্থিত হলেন। তার মধ্যে সফরের কোনো চিহ্ন পরিলক্ষিত হচ্ছিল না, আর আমাদের কেউও তাকে পরিচয় করতে পারছিলাম না। এমনকি তিনি নবী করীম ﷺ এর নিকটে বসলেন এবং তার দুই হাঁটুকে নবী করীম ﷺ এর দুই হাঁটুর সাথে মিলালেন এবং নিজের দুই হাত তাঁর উরুর উপর রাখলেন আর বললেন: হে মুহাম্মদ ﷺ, আমাকে ইসলাম সম্পর্কে অবগত করুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ইসলাম হলো, তুমি একথার সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল, নামায কায়েম করবে, যাকাত দিবে, রামাদানের রোযা রাখবে এবং বায়তুল্লাহর হজ্জ করবে, যদি তুমি সেখানে পৌঁছতে সমর্থ হও। (উত্তর শুনে) তিনি (প্রশ্নকারী) বললেন, আপনি ঠিক বলেছেন। তার আচরণে আমরা আশ্চার্যান্বিত হয়ে গেলাম যে তিনি প্রশ্ন করছেন আবার সত্যায়নও করছেন।

অতঃপর তিনি বললেন, আমাকে ঈমান সম্পর্কে অবগত করুন (অর্থাৎ ঈমান কি?)। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি বিশ্বাস করবে আল্লাহ, তাঁর ফিরিশতাগণ, আসমানী কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ ও আখিরাতের দিনের প্রতি এবং বিশ্বাস করবে তাকদীরের ভালো-মন্দের প্রতি। (উত্তর শুনে) তিনি বললেন, আপনি ঠিক বলেছেন।

অতঃপর তিনি বললেন, আমাকে ইহসান সম্পর্কে অবগত করুন (অর্থাৎ ইহসান কি?)। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে যেন তুমি তাঁকে দেখছ। আর যদি তুমি তাঁকে দেখতে না পাও তাহলে (মনে করবে যে) তিনি তোমাকে দেখছেন।

এরপর তিনি বললেন, আমাকে কিয়ামত সম্পর্কে অবগত করুন (অর্থাৎ কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে?)। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এ বিষয়ে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি প্রশ্নকারীর চেয়ে অধিক জানেন না। তখন তিনি (প্রশ্নকারী) বললেন, তাহলে এর নিদর্শনসমূহ সম্পর্কে আমাকে অবগত করুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, দাসী তার মনিবকে জন্ম দিবে এবং নগ্নপদ, উলঙ্গ শরীর, দরিদ্র, মেষ রাখালদের উঁচু দালান নিয়ে গর্ব করতে দেখবে।

অতঃপর ঐ ব্যক্তি (প্রশ্নকারী) চলে গেলে আমি (উমর) কিছুক্ষণ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট অবস্থান করলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে উমর, তুমি কি জানো এই প্রশ্নকারী কে? আমি জবাব দিলাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক জানেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তিনি হলেন জিবরীল (আ.)। তোমাদেরকে তোমাদের দীন শিক্ষাদানের জন্য তিনি এসেছিলেন। (বুখারী ও মুসলিম, মুসলিমের ভাষ্য, বাবু বায়ানিল ঈমান, ইসলাম ওয়াল ইহসান...)

হাদীসের উদ্দিষ্ট অংশ

উপরোক্ত হাদীসে আমাদের উদ্দিষ্ট অংশ হলো, 'ইহসান' সম্পর্কিত প্রশ্ন ও তার জবাব। তা হলো-

فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ. قَالَ: أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ.

-(হযরত জিবরাঈল (আ.) রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলেন) আপনি আমাকে 'ইহসান' সম্পর্কে বলুন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি এমনভাবে আল্লাহ তাআলার ইবাদত করো যেন (ইবাদত করা অবস্থায়) তাঁকে দেখতে পাচ্ছ। আর যদি তাঁকে দেখতে না পাও তাহলে (মনে নাও) তিনি তোমাকে দেখতে পাচ্ছেন। (মুসলিম)

হাদীসে বর্ণিত ইহসান'ই তাসাওউফ

'ইহসান' এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে সুন্দর করা। অর্থাৎ ইবাদতকে এমনভাবে সম্পাদন করা, যা সব ধরনের অমনোযোগিতা বা লোক দেখানো থেকে মুক্ত।

রাসূলুল্লাহ ﷺ 'ইহসানে'র সংজ্ঞায় বললেন, তুমি এমনভাবে আল্লাহ তাআলার ইবাদত করো যেন তাঁকে তুমি দেখতে পাচ্ছ অর্থাৎ যদি তুমি আল্লাহ তাআলাকে দেখা অবস্থায় তাঁর সামনে ইবাদত করতে, তাহলে যেরূপ ইবাদত করতে ঠিক অনুরূপ ইবাদত করো। আর তখন ইবাদতে কোনো ধরনের অমনোযোগিতা বা লোক দেখানো বিষয় থাকবে না বরং ইবাদতে মনোযোগ বা একনিষ্ঠতা আবশ্যকীয়ভাবে পরিলক্ষিত হবে। আর যদি তাঁকে তুমি দেখতে নাও পাও তাহলে মনে রাখবে, তিনি তোমাকে দেখছেন।

'ইহসান' সম্পর্কিত প্রশ্নটি জিবরাঈল (আ.) 'ঈমান' ও 'ইসলাম' সম্পর্কিত প্রশ্নের পরে করেছিলেন। এর দ্বারা বুঝা যায় আকীদা-বিশ্বাস বা প্রকাশ্য আমলের পর আরো একটি জরুরী বিষয় অর্জন করা আবশ্যক, যাকে হাদীসের পরিভাষায় 'ইহসান'

বলা হয়েছে। আর এ বিষয়টিই তরীকতপন্থীগণ সুচারুরূপে সম্পাদন করেন। সারকথা হলো এর নামই তাসাওউফ। সুতরাং হাদীসের মাধ্যমেই তরীকত তথা ইলমে তাসাওউফের বিষয়টি সাব্যস্ত হলো।

বর্ণিত হাদীসের ব্যাখ্যায় শাহ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) ইমাম মালিক (র.) এর বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন-

قال الامام مالك رحمه الله من تصوف و لم يتفقه فقد تزندق و من تفقه ولم يتصوف فقد تفسق ومن جمع بينهما فقد تحقق (مرقاة المفاتيح)

-যে ব্যক্তি তাসাওউফের জ্ঞান অর্জন করল, ফিকহর জ্ঞান অর্জন করল না সে যিনদীক্; আর যে কেবল ফিকহর জ্ঞান অর্জন করল তাসাওউফের জ্ঞান অর্জন করল না সে ফাসিক। আর যে এর উভয়টিই শিখল সে মুহাক্কিক বা সত্যানুসন্ধানী হলো। (মিরকাত)

এ প্রসঙ্গে শাহ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) اشعة اللمعات গ্রন্থে উল্লেখ করেন,

بدانکہ بنائے دین وکمال آن بر فقہ و کلام وتصوف است و این حدیث شریف بیان این ہر سہ مقام کردہ اسلام اشارت بہ فقہ است کہ متضمن بیان اعمال واحکام شرعیہ است وایمان اشارت باعتقادات کہ مسائل اصول کلام اند واحسان اشارت بہ اصل تصوف است کہ عبادت از صدق توجہ الی اللہ است وجمیع معانی تصوف کہ مشائخ طریقت بآن اشارت کردہ اند راجع بھمین معنی است وتصوف وکلام لازم یکدیگراند کہ ہیچ یکے بے دیگر تمام نیست پزیرد چرا کہ کلام بے تصوف و تصوف بے فقہ نہ بلند زیرا کہ حکم الٰہی بے فقہ شناختہ نہ شود و فقہ بے تصرف تمام نشود وزیرا کہ عمل بے صدق توجہ تمام نہ پزیرد وہر دو بے ایمان صحیح نہ گردد بر مثال روح وجسد ہیچ کدام بے دیگر وجود نگیرد و کمال نہ پزیرد (اشعة اللمعات :۱۴-۲۴)

-জেনে রেখো যে, ধর্মের ভিত্তি ও পূর্ণতা হচ্ছে ইলমে ফিকহ, ইলমে কালাম ও ইলমে তাসাওউফ। এই হাদীসে উল্লিখিত তিনটি বিষয় বর্ণিত হয়েছে। 'ইসলাম' শব্দ দ্বারা ইলমে ফিকহ উদ্দেশ্য; কেননা এতে আমল এবং আহকামে শরীআত অন্তর্ভুক্ত। 'ঈমান' শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে আকীদা-বিশ্বাস যা কালাম শাস্ত্রের বিষয়বস্তু। আর 'ইহসান' শব্দের দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে তাসাওউফ। যার অর্থ খাঁটি মনে আল্লাহ তাআলার দিকে তাওয়াজ্জুহ বা মনোনিবেশ করা। তরীকতের শাইখগণ যে সকল বক্তব্য পেশ করেছেন তার সারকথা হলো এই 'ইহসান'। তাসাওউফ ও কালাম শাস্ত্র একে অপরের সাথে জড়িত। একটি ছাড়া অপরটি পরিপূর্ণ হয় না। এর কারণ হলো কালাম শাস্ত্র ছাড়া তাসাওউফ এবং তাসাওউফ ছাড়া কালাম শাস্ত্র অর্থহীন। কেননা খোদায়ী বিধিবিধান ফিকহ ব্যতীত জানা যায় না; আর তাসাওউফ ব্যতীত ইলমে ফিকহ পরিপূর্ণ হয় না। আবার কোন আমলই একনিষ্ট তাওয়াজ্জুহ বা খাঁটি নিয়ত ছাড়া পরিপূর্ণ হয় না। আর উভয়ের মধ্যে কোনোটিই ঈমান ব্যতীত বিশুদ্ধ হয় না। (আশিয়্যাতুল লুমআত)

তাসাওউফ দ্বীনের অংশ

তাসাওউফ দ্বীনের অংশ। অংশকে বাদ দিলে পূর্ণ বস্তুর অনুপস্থিতি অপরিহার্য হয়ে যায়। সুতরাং তাসাওউফকে অস্বীকার করলে দ্বীনকে অস্বীকার করা অপরিহার্য হবে।

হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) বলেন, তিনটি উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাআলা নবীগণকে পাঠিয়েছেন; তা হলো ১. আকীদা শুদ্ধকরণ, ২. আমল শুদ্ধকরণ ও ৩. ইখলাস তথা আন্তরিকতা শুদ্ধকরণ-

وقد تكفل بفن الاول اهل الوصول من علماء الامة و قد تكفل بفن الثاني فقهاء الامة فهدي الله بهما اكثرين و قد تكفل بفن الثالث الصوفية رضوان الله عليهم (التفهيمات الالهية)

-বিশ্বাস বা আকীদা সংশোধনের দায়িত্ব নিয়েছেন উলামায়ে উসূল বা নীতিশাস্ত্রবিদ আলিমগণ, আমল সংশোধনের দায়িত্ব ফকীহগণের এবং ইখলাস তথা আন্তরিকতা সংশোধনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন সূফী বুযুর্গগণ।

তাসাওউফ দেহে আত্মার মতো

শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (র.) আরো বলেন, 'ইসলামে তাসাওউফ দেহে আত্মার ন্যায়'। তিনি বলেন,

والذي نفسي بيده هذا الثالث ادق المقاصد الشرعية مأخذا و اعمقها مهتدا و هو بالسنة الي سائر الشرائع بمنزلة الروح من الجسد و بمنزلة المعني من اللفظ- (التفهيمات الالهية)

-সেই সত্তার কসম, যার কব্জায় আমার প্রাণ, এই তৃতীয় শাস্ত্রটি শরীআতের উদ্দেশ্যের উৎস হিসেবে খুবই সূক্ষ্ম এবং হিদায়াত হিসেবে খুবই গভীর। তাই সকল শরীআতের জন্য এই শাস্ত্রের মর্যাদা দেহের আত্মা এবং শব্দের জন্য অর্থ স্বরূপ। (তাফহীমাত)

ইখলাস ও ইহসান নামে অভিহিত তৃতীয় এই শাস্ত্রটি সমগ্র শরীআতের প্রাণ ও আত্মা। আত্মা ছাড়া যেমন দেহ অর্থহীন অনুরূপ ইখলাস ব্যতীত আকাঈদ ও আমল অর্থহীন। আর এরই অপর নাম তাসাওউফ। তাসাওউফ ব্যতীত না শরীআত জীবিত থাকতে পারে, না দ্বীন নিরাপদ থাকতে পারে। শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (র.) বিষয়টি পরিষ্কার করে দিয়েছেন।

তাসাওউফ শারঈ ইলমের স্বতন্ত্র শাখা

عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم العلم علمان فعلم في القلب فذلك العلم النافع وعلم علي اللسان فذلك حجة علي الله علي ابن ادم – رواه الدارمي والمنذري

وفي رواية العلم علمان فعلم ثابت في القلب وعلم في اللسان فذلك حجة علي عباده (رواه الديلمي والبيهقي)

-হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইলম দুই প্রকার। এক প্রকার ইলম অন্তরে প্রতিষ্ঠিত থাকে যা উপকারী ইলম। অপর প্রকার ইলম জিহ্বায় যা আদম সন্তানের দলীল। (হাদীসখানা দারিমী ও মুনযিরী বর্ণনা করেছেন)

বর্ণিত হাদীসের ব্যাখ্যায় মুল্লা আলী কারী (র.) বলেন,

قد يحمل الاول علي علم الباطن والثاني علي علم الظاهر (مرقاة المفاتيح)

-প্রথম প্রকার ইলম হচ্ছে ইলমে বাতিন আর দ্বিতীয় প্রকার ইলম হচ্ছে ইলমে যাহির।

প্রকৃতপক্ষে ইলমে বাতিনই হচ্ছে ইলমে তাসাওউফ।

তাসাওউফের আবশ্যকতা ও উপকারিতা

হযরত কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) সূরা তাওবার **وما كان المؤمنون لينفروا كافة** আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে তাফসীরে মাযহারীতে তাসাওউফের গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরেন এভাবে-

واما العلم اللدني الذي يسمون اهلها بالصوفية الكرام فهو فرض عين لان ثمراتها تصفية القلب عن اشتغال بغير الله تعالي واتصافه بدوام الحضور وتزكية النفس عن رذائل الأخلاق من العجب والكبر والحسد وحب الدنيا والكسل في الطاعات وإيثار الشهوات والرياء والسمعة وغير ذلك وتجليتها بكرام الاخلاق من التوبة والرضا بالقضا والشكر علي النعماء والصبر علي البلاء وغير

ذلك- ولا شك ان هذه الامور محرمات وفرائض علي كل بشر اشد تحريما من معاصي الجوارح واهم افتراضا من فرائضها فالصلوة والصوم وشيء من العبادات لايعبأ بشيء منها ما لم تقترن بالاخلاص والنية- (التفسير المظهري)

-ইলমে লাদুন্নী অর্জনকারী ব্যক্তিদেরকে সূফী বলা হয়ে থাকে। আর ইলমে লাদুন্নী অর্জন করা ফরযে আইন। এই শাস্ত্রের ফল হচ্ছে গায়রুল্লাহর যিকর থেকে অন্তরকে পরিশুদ্ধ রাখা, অন্তরকে সার্বক্ষণিক উপস্থিত রাখা, মন্দ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তথা অহংকার, অহমিকা, হিংসা, দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা, জাঁকজমক প্রীতি, আল্লাহর আনুগত্যে অলসতা, কামনা-বাসনা, রিয়া ও খ্যাতি ইত্যাদি বিষয় থেকে অন্তরকে রক্ষা করা। এর আরো উপকারিতা হচ্ছে, উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অর্জন করা, তৎসঙ্গে গুনাহ থেকে তাওবাহ করা, আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকা, তাঁর নিআমতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং বালা-মুসীবতে ধৈর্য ধারণ করা ইত্যাদি। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, উপরে বর্ণিত বিষয়গুলো হারাম এবং মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গুনাহের চাইতেও অধিকতর হারাম। পাশাপাশি নামায, রোযা ও অন্যান্য ইবাদত অপেক্ষাও অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ফরয। কেননা যেকোনো ইবাদত ইখলাস ও বিশুদ্ধ নিয়ত ব্যতীত নিষ্ফল। (মাযহারী)

আর নিয়ত বিশুদ্ধ হওয়ার নামই হলো তাসাওউফ।

ইমাম গাযালী (র.) বলেন, وكذلك يفترض عليه علم احوال القلب من التوكل والخشية والرضا (تعليم المتكلمين)

(অন্য সকল শাস্ত্রের ন্যায়) ইলমে তাসাওউফ বা অন্তরের অবস্থাবলি তথা তাওয়াক্কুল বা আল্লাহর উপর ভরসা, খাশিয়্যাত বা খোদাভীতি এবং রেদা বিল কাযা বা আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকার জ্ঞান অর্জন করাও ফরয। ইমাম গাযালী (র.) এর সুচিন্তিত মতামত হচ্ছে তাসাওউফের জ্ঞান অর্জন করা ফরযে আইন।

মাওলানা আশরাফ আলী থানভী সাহেব তার التكشف عن مهمات التصوف কিতাবে তাসাওউফ শিক্ষা করাকে ফরযে আইন সাব্যস্ত করেছেন।

আল্লামা ইবনু আবেদীন আশ-শামী (র.) অন্তরের অবস্থাসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করে ফল বের করেছেন যে,

فيلزمه ان يتعلم منها ما يري نفسه محتاجا اليه وازالتها فرض عين (رد المحتار)

-অন্তরের কুস্বভাব দূর করার জন্য তাসাওউফ এতটুকু অর্জন করবে, যতটুকু নিজের জন্য প্রয়োজনীয় মনে করবে। আর অন্তরের কুস্বভাব দূর করা ফরযে আইন। (রদ্দুল মুহতার)

তাফসীরে জুমালে উল্লেখ করা হয়েছে- والدين الذي لا يقبل التغير هو التوحيد والاخلاص والايمان بما جائت جميع الرسل عليهم السلام

-যে দ্বীন পরিবর্তন কবূল করে না, তা হচ্ছে তাওহীদ, ইখলাস ও নবী-রাসূলগণ আনীত বিষয়াদির প্রতি ঈমান আনা।

এর দ্বারা প্রমাণিত হয় তাসাওউফ তথা ইখলাস ও ইহসান দ্বীনের মৌলিক বিষয়াদির অন্যতম। ইখলাস ছাড়া তাওহীদ যেমন গ্রহণীয় নয় অনুরূপ ঈমান আমলও গ্রহণীয় নয়।

হযরত শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) বলেন, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে শরীআত ও তরীকত। তারা এ দুটি বিষয়কেই বুযুর্গীর মূল বিষয় মনে করেন। (তুহফায়ে ইসনা আশারিয়্যাহ)

এ থেকে বুঝা গেল যারা তাসাওউফকে অস্বীকার করে তারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের দলভুক্ত নয়। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অনুসারী সূফীগণ তাসাওউফ ও তাসাওউফের আকীদা কুরআন ও সুন্নাহ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছেন। এটা সূফীগণের সর্বসম্মত চলার পথ। হ্যাঁ, মাঝে মাঝে এতে যেসব ত্রুটি বিচ্যুতি দেখা দিয়েছে অনুসন্ধানকারীগণ তা সংশোধন করে দিয়েছেন।

তাসাওউফ ও সুলূক তাওয়াতুর পদ্ধতিতে প্রমাণিত

তাসাওউফ ও সুলূক তাওয়াতুর পদ্ধতিতে প্রমাণিত। সর্বযুগেই অগণিত অসংখ্য ব্যক্তি তাসাওউফ চর্চায় নিমজ্জিত ছিলেন, বর্তমানেও রয়েছেন। আর তা এমন বিপুল সংখ্যক লোকের পরম্পরাগত বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত যারা জ্ঞানে, আমলে, সংসার অনাসক্তিতে ও তাকওয়া- পরহেযগারীতে নযীরবিহীন। কাজেই এমন গুণসম্পন্ন অগণিত লোকের মিথ্যার উপর একমত হওয়া অসম্ভব।

বাংলা জাতীয় মাসিক
পরওয়ানা
বিজ্ঞাপনের হার

শেষ প্রচ্ছদ (চার রং)	৪০,০০০/-
২য় ও ৩য় প্রচ্ছদ (চার রং)	৩০,০০০/-
ভিতরের পূর্ণ পৃষ্ঠা (সাদা কালো)	১৮,০০০/-
ভিতরের অর্ধ পৃষ্ঠা (সাদা কালো)	১০,০০০/-
ভিতরের সিকি পৃষ্ঠা (সাদা কালো)	৬,০০০/-
ভিতরের পূর্ণ পৃষ্ঠা (চার রং)	২৫,০০০/-
ভিতরের অর্ধ পৃষ্ঠা (চার রং)	১২,০০০/-
ভিতরের এক কলাম ৩" ইঞ্চি (সাদা কালো)	৩,০০০/-

বি. দ্র: একসাথে তিন মাসের জন্য ২৫%, ছয় মাসের জন্য ৩৫% ও এক বছরের জন্য ৫০% ডিসকাউন্ট দেওয়া হবে।

যোগাযোগ

বিজ্ঞাপন ম্যানেজার
মাসিক পরওয়ানা
মোবাইল: ০১৭৯৯৬২৯০৯০

ভিজিট করুন
তাসনীম تسنيم
www.tasneembd.org
▼ কুরআন ▼ হাদীস ▼ আকীদা
▼ ইবাদত ▼ প্রবন্ধ ▼ জীবনী
▼ জিজ্ঞাসা ▼ বই

প্রবন্ধ

ইতিকাফ: সংক্ষিপ্ত আলোকপাত

আহমদ হাসান চৌধুরী

মাহে রামাদান ঈমানদারদের জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে বিশেষ উপহার। এ মাসে বান্দাহ আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের মহান সুযোগ লাভে ধন্য হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে, যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরয করা হয়েছিল, যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পারো। (সূরা বাকারা, আয়াত-১৮৩)

এ মাসে মানুষ যাতে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে সক্ষম হয় এজন্য কুদরতী ব্যবস্থাপনা কাজ করে। যেমন হাদীসে এসেছে দুষ্ট শয়তানকে এ মাসে বন্দি করে রাখা হয়। (সুনানু ইবনি মাজাহ, বাবু মা জাআ ফী ফাদলি রামাদান)

মানুষের জন্য আল্লাহ পাবার পথে যে বাধাগুলো রয়েছে তার মধ্যে আরেকটি হচ্ছে 'নফস' বা কুপ্রবৃত্তি। রামাদান মাসে সিয়াম সাধনার মাধ্যমে 'নফস'ও নিয়ন্ত্রিত থাকে। ফলে মানুষ আল্লাহর রঙে রঙিন হওয়ার সুযোগ লাভ করে। তাছাড়া তারাবীহ, তাহাজ্জুদ, দান-সাদকা, তিলাওয়াত, যিকর-আযকার ইত্যাদি তো আছেই। এরকম একটি মহান সুযোগ হচ্ছে ইতিকাফ। প্রিয়নবী ﷺ এর অনুসরণে ইতিকাফ পালনের মাধ্যমে মুমিনগণ তাদের প্রতিপালকের সাথে একান্ত নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনের সুযোগ লাভ করে। এ পর্যায়ে আমরা ইতিকাফের ফযীলত, উপকারিতা, হিকমত, করণীয় ও কিছু বিধি-বিধান নিয়ে আলোচনা করব।

ইতিকাফ এর পরিচয়

ইতিকাফ শব্দের অর্থ কোনো কিছুকে আঁকড়ে ধরা এবং মনকে এতে বেঁধে রাখা, অবস্থান করা। তাছাড়া কোনো কিছুতে আটকে থাকা, বাধা প্রদান করা ইত্যাদি অর্থেও এ শব্দ ব্যবহৃত হয়। শরীআতের পরিভাষায়- 'নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে কোনো ব্যক্তির মসজিদে অবস্থান করাই ইতিকাফ।' (মিরকাত)

কুরআন-হাদীসে ইতিকাফ

পবিত্র কুরআন কারীমে ইতিকাফের উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন কুরআন শরীফে এসেছে-

وَلَا تُبَٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَٰكِفُونَ فِي ٱلْمَسَٰجِدِ

-তোমরা মসজিদগুলোতে ইতিকাফরত অবস্থায় স্ত্রীদের সাথে মেলামেশা করো না। (সূরা বাকারা, আয়াত-১৮৭)

হাদীসে এসেছে নবী করীম ﷺ রামাদানের শেষ দশকে ইন্তিকাল পর্যন্ত ইতিকাফ করেছেন। তারপর তার স্ত্রীগণ ইতিকাফ করেছেন। (বুখারী, কিতাবুল ইতিকাফ ও মুসলিম, বাবু ইতিকাফিল আশরিল আওয়াখিরি মিন রামাদান)

এ হাদীস থেকে বোঝা যায়, প্রিয়নবী ﷺ ইতিকাফকে খুব গুরুত্ব দিতেন। সবসময় নবীজি ﷺ করেছেন এজন্য এটা ওয়াজিব হওয়ার দাবি রাখে। কিন্তু যেহেতু পরবর্তীতে সাহাবায়ে কিরাম নিয়মিত করেননি, তাই এটি সুন্নাতে মুআক্কাদা কিফায়া। (মিরকাত)

অন্য হাদীসে এসেছে, আয়িশা (রা.) বলেন, রাসূল ﷺ যখন ইতিকাফ করতেন, তখন আমার দিকে তাঁর মাথা মুবারক এগিয়ে দিতেন, আমি তা বিন্যস্ত করে দিতাম। মানবীয় প্রয়োজন (প্রশ্রাব-পায়খানা) ছাড়া তিনি ঘরে প্রবেশ করতেন না। (বুখারী, বাবু লা ইয়াদখুলুল বাইতা ইল্লা লি হাজাতিন ও মুসলিম, বাবু জাওয়াযি গাসলিল হাঈদি রা'সা যাওজিহা ওয়া তারজিলিহি...)

এ হাদীস থেকে ফকীহগণ দলীল দিয়েছেন, শরীরের কিছু অংশ মসজিদ থেকে বের হলে ইতিকাফ ভঙ্গ হবে না। তাছাড়া চুল-দাড়ি আঁচড়ানো মু'তাকিফের জন্য জায়িয। মসজিদে কোনো পাত্রের মধ্যে মাথা ধৌত করলে কোনো অসুবিধা হবে না, তবে এক্ষেত্রে মসজিদ নোংরা করা যাবে না। খাত্তাবী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এ হাদীস প্রমাণ করে প্রশ্রাব-পায়খানা ছাড়া ইতিকাফকারী মসজিদের বাইরে যেতে পারবে না।

হযরত ইবনে উমর (রা.) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন, নবীজি ﷺ যখন ইতিকাফ করতেন, তার জন্য বিছানা পাতা হতো অথবা তাওবার খুঁটির পিছনে তার খাট রাখা হতো। (ইবনু মাজাহ, বাবু ফীল মুতাকিফি ইয়ালযিমু মাকানান মিনাল মাসজিদ)

ইতিকাফ পালন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদত। এটিকে অবহেলা করার সুযোগ নেই। যেমনটা আমাদের সমাজে অনেক জায়গায় শোনা যায় যে, মহল্লায় কোনো ব্যক্তি ইতিকাফে ইচ্ছুক না থাকায় একজনকে বিনিময় প্রদানের মাধ্যমে ইতিকাফে বসানো হয়। এটা একেবারেই গর্হিত কাজ। ইমাম যুহরী (র.) বলেন, নবী করীম ﷺ জীবনে অনেক আমল করেছেন, আবার ছেড়েছেনও। কিন্তু তিনি ইতিকাফ ইন্তিকাল পর্যন্ত ছাড়েননি। (উমদাতুল কারী, ১১/২০০)

ইতিকাফ তিন প্রকার

উলামায়ে কিরাম ইতিকাফকে তিনভাগে ভাগ করেছেন-

১। ওয়াজিব: মানতের ইতিকাফ

২। সুন্নাতে মুআক্কাদাহ: রামাদানের শেষ দশকের ইতিকাফ। এ ইতিকাফ সুন্নাতে মুআক্কাদা কিফায়া। তাই মহল্লাবাসীর পক্ষ থেকে কোনো একজন রামাদানের শেষ দশদিন ইতিকাফ করলে মহল্লার সকলের পক্ষ থেকে সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে।

৩। মুস্তাহাব: যেকোনো সময় মসজিদে ইতিকাফের নিয়তে অবস্থান করা। এরকম অবস্থান কিছু সময়ের জন্য হতে পারে, বা একদিনের জন্য হতে পারে, অথবা কয়েক দিনের জন্যও হতে পারে।

কিছু বিধিবিধান

উপরে বর্ণিত হাদীসগুলোর সাথে কিছু বিধান আলোচিত হয়েছে। নিচে আরো কিছু জরুরি বিধি-বিধান তুলে ধরা হলো-

- এমন মসজিদে ইতিকাফ করতে হবে যে মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জামাত অনুষ্ঠিত হয়। তবে মহিলাদের ক্ষেত্রে এই শর্ত প্রযোজ্য নয়। তারা নিজেদের ঘরে নির্দিষ্ট স্থানে ইতিকাফ করবেন।
- ইতিকাফের জন্য নিয়ত করতে হবে।
- ইতিকাফের জন্য মাগরিবের পূর্বে মসজিদে প্রবেশ করতে হয় এবং যেদিন ইতিকাফ শেষ হবে, সেদিন মাগরিব পর মসজিদ থেকে বের হতে হয়।
- স্ত্রী সহবাস করলে ইতিকাফ ভঙ্গ হয়। চুম্বন ইত্যাদি কারণে বীর্যপাত না হলে ইতিকাফ বাতিল হয় না, তবে ইতিকাফ অবস্থায় তা হারাম। এতে বীর্যপাত হলে ইতিকাফ বাতিল হয়ে যাবে।
- রামাদানের শেষ দশ দিনের ইতিকাফে মানবীয় (যেমন প্রশ্রাব-পায়খানার জন্য) ও শারঈ প্রয়োজন (যেমন জুমুআর নামায) ছাড়া বাইরে গেলে ইতিকাফ ভেঙ্গে যাবে।

• ঘুম ও খাবার-দাবার মসজিদে করতে হবে।

• ইতিকাফকারী নিজের ও পরিবারের একান্ত প্রয়োজনীয় বেচাকেনা মসজিদেই করবে। তবে বেচাকেনার পণ্য মসজিদে আনা মাকরূহে তাহরীমী।

• চুপ থাকাকে ইবাদত মনে করে চুপ থাকা মাকরূহ।

• অযথা কথাবার্তা, গালগল্প মাকরূহ।

• বিনা প্রয়োজনে মসজিদ থেকে এক মুহূর্তের জন্য বের হলে ইতিকাফ নষ্ট হয়ে যাবে।

• ফরয গোসল ব্যতীত অন্যান্য গোসলের কথা কিতাবগুলোতে পাওয়া যায় না। তবে আমাদের উপমহাদেশের কোনো কোনো আলিম বলেন, কেউ বেশি অসুবিধা বোধ করলে মসজিদের বারান্দায় পানি আনিয়ে গোসল করা নিতে পারবে। অথবা উযূর জন্য যখন মসজিদ থেকে বের হবেন, তখন গোসলের জন্য আলাদা সময় ব্যয় না করে শুধু একটি ডুব দিয়ে আসা যেতে পারে।

• মহিলাদের হায়িয অথবা নিফাস শুরু হলে ইতিকাফ ভেঙ্গে যাবে।

• মসজিদের ফ্যান-লাইট ইত্যাদি অতিরিক্ত সময় ব্যবহার করার জন্য সতর্কতামূলক কিছু টাকা মসজিদের তহবিলে দিয়ে দেওয়া উচিত হবে।

ইতিকাফের আরো অনেক বিধি-বিধান আছে। যেগুলো বিস্তারিত জানার জন্য ফাতওয়ার কিতাবগুলো বা অভিজ্ঞ আলিম-উলামার শরণাপন্ন হওয়া যেতে পারে।

ইতিকাফের হিকমত

ইতিকাফের হিকমত হচ্ছে আল্লাহর ইবাদত ও নৈকট্য অর্জনের লক্ষ্যে নিজেকে সর্বোতভাবে সমর্পণ করা। আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে বাধাদানকারী দুনিয়াবি কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখা। ইতিকাফের মাধ্যমে বান্দাহ সারাক্ষণ নামাযের অবস্থায় থাকার প্রতিদান লাভ করে। কারণ ইতিকাফের বিধানের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে জামাআতে নামায আদায়ের অপেক্ষায় থাকা। আর এক ওয়াক্তের নামায জামাআতে আদায়ের পর আরেক ওয়াক্তের জামাআতের জন্য অপেক্ষার সময় নামাযের মধ্যেই গণ্য করা হয় বলে হাদীসে এসেছে।

তাছাড়া ইতিকাফের মাধ্যমে ফিরিশতাদের সাথে বান্দার সাদৃশ্য অর্জিত হয়। কেননা ফিরিশতাদের সম্পর্কে পবিত্র কুরআন শরীফে বলা হয়েছে-

لَّا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ -

-তারা আল্লাহর নির্দেশের অবাধ্য হয় না এবং আল্লাহ যা নির্দেশ দেন, তাই করে।" (সূরা আত-তাহরীম, আয়াত-৬)

অন্য আয়াতে এসেছে, يُسَبِّحُونَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ -তারা দিন-রাত আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে, তারা ক্লান্ত হয় না। (সূরা আম্বিয়া, আয়াত-২০)

ইতিকাফের মাধ্যমে বান্দাহ ফিরিশতাদের এসকল বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে সক্ষম হয়।

ইতিকাফের উপকারিতা

ইতিকাফের সবচেয়ে বড় উপকারিতা হচ্ছে এর মাধ্যমে প্রিয়নবী ﷺ এর সুন্নাতের অনুসরণ করা হয়। হাদীসে এসেছে, হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ রামাদানের শেষ দশকে ইতিকাফ করতেন। এক বছর ইতিকাফ করেননি, পরবর্তী বছরে তিনি বিশ দিন ইতিকাফ করেছেন। (তিরমিযী, বাবু মা জাআ ফীল ইতিকাফি ইযা খারাজা মিনহু) তাছাড়াও ইতিকাফের উপকারিতার মধ্যে রয়েছে-

ক. গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা।

খ. আত্মা পরিশুদ্ধ হয়।

গ. অহেতুক কথাবার্তা ও কাজকর্ম থেকে বাঁচা যায়।

ঘ. হাজার বছরের চেয়েও শ্রেষ্ঠ রজনী 'শবে কদর' নিশ্চিতভাবে লাভ করা সম্ভব হয়। কেননা রাসূল ﷺ বলেছেন, "তোমরা এটাকে (শবে কদরকে) শেষ দশকের বিজোড় রাতে তালাশ করো।" (বুখারী, বাবু তাহাররী লাইলাতিল কাদরি ফিল উইতরি মিনাল আশরিল আওয়াখির)

ঙ. বান্দাহ আল্লাহর ঘরে তার মেহমান হিসেবে অবস্থান করার সুযোগ পায়। মেহমানকে কদর করা হবে এটাই স্বাভাবিক। কেননা হাদীসে এসেছে-

من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله. وحق المزور أن يكرم الزائر.

-যে তার ঘরে সুন্দরভাবে উযূ করে মসজিদে আসে সে আল্লাহর মেহমান। আর মেজবানের দায়িত্ব হচ্ছে মেহমানের কদর করা। (আল মুজামুল কাবীর লিত-তাবরানী, মাজমাউয যাওয়াইদ, বাবুল মাশই ইলাল মাসাজিদ)

চ. অধিক পরিমাণে নামায, কুরআন তিলাওয়াত, যিকর-আযকার ও দরূদ পাঠের সময় পাওয়া যায়।

ছ. প্রথমত রোযা, দ্বিতীয়ত আল্লাহর ঘরে অবস্থানের ফলে কুপ্রবৃত্তি অবদমিত থাকে।

জ. মসজিদে আটকে থাকার কারণে সকল প্রকার নেকীর কাজের সাওয়াব লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেন। রাসূল ﷺ ইতিকাফ কারী সম্পর্কে বলেছেন,

هو يعكف الذنوب ويجرى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها. (رواه ابن ماجة)

-সে পাপ কাজ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে, আর সব ধরনের ভালো কাজের আমলকারী ব্যক্তির ন্যায় ভালো কাজের প্রতিদান লাভ করে। (ইবনে মাজাহ, বাবু ফী সাওয়াবিল ইতিকাফ)

ঝ. সবসময় আল্লাহর ঘরে অবস্থান করা, আল্লাহর ইবাদতে লিপ্ত থাকা এবং আল্লাহর সমীপে আশ্রয় লাভের সুযোগ হয়। হযরত আতা (র.) বলেন, ইতিকাফকারীর উদাহরণ ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে কোনো প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যে কোনো বড়লোকের দরজায় পড়ে থাকে। এমনিভাবে ইতিকাফকারীও যেন বলে, যতক্ষণ না আমাকে মাফ করা হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি এ দরজা থেকে যাবো না।

ইতিকাফ অবস্থায় করণীয়

যারা ইতিকাফ করেন তারা যদি মনোযোগী হন, তাহলে সময়কে কাজে লাগিয়ে তারা অনেক নফল ইবাদত করতে পারেন। যেমন-

• কুরআন তিলাওয়াত: এটি সর্বোত্তম যিকর, আর রামাদানের সাথে কুরআনের রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক। নবী করীম ﷺ জিবরীলের সাথে প্রতি বছর রামাদান মাসে কুরআন দাওর করতেন। তাই ইতিকাফকারীর উচিত বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াতে মশগুল থাকা। সম্ভব হলে তিন দিন, সাত দিন বা দশ দিনে কুরআন খতম করা।

• পাঁচ ওয়াক্তের সুন্নাতগুলোর পাশাপাশি তাহাজ্জুদের নামায নিয়মিত আদায় করা। এছাড়াও বাকী নফল নামাযসমূহ যেমন- সালাতুত তাসবীহ, ইশরাক, দ্বোহা বা চাশত, আওয়াবীন ইত্যাদির প্রতি যত্নশীল হওয়া বাঞ্ছনীয়।

• বেশি বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পাঠ করতে পারেন।

• ইসলামী বইপত্র পাঠ করতে পারেন।

• উমরী কাযা নামায আদায় করা।

• আলিম-উলামার সাথে ইতিকাফ করলে তাদের সুহবতে থেকে উপকৃত হওয়ার চেষ্টা করা। বিশেষত জরুরি মাসআলা-মাসাইল জানা ও মশকের মাধ্যমে কিরাত শুদ্ধ করে নেওয়ার চেষ্টা করা।

• প্রতিবার উযূ করার পর তাহিয়্যাতুল উযূর নামায পড়া।

এক কথায় এ সময়কে গুরুত্ব সহকারে নানাবিধ ইবাদত বন্দেগিতে কাটাতে সচেষ্ট হওয়া চাই।

ঈদুল ফিতর- এর দিনের আমল

মুহাম্মদ হবিবুর রহমান

আরবী عيد শব্দটি عود শব্দ থেকে এসেছে। যার অর্থ ফিরে আসা। যেহেতু এ দিনগুলো আনন্দের বার্তা নিয়ে ফিরে আসে এ কারণে এ দিনগুলোকে ঈদের দিন বলা হয়। মুসলিম বিশ্বের জন্য মহা খুশির দিন হচ্ছে ঈদের দিন। আল্লাহ পাক মুসলমানদের খুশি প্রকাশের জন্য দুটি দিনকে বেছে নিয়েছেন। যদিও রূপক অর্থে যেকোনো খুশির দিনকে ঈদের দিন বলা হয়।

'কুল্লিয়াত' গ্রন্থে ঈদ সম্পর্কে বলা হয়েছে-

الْعِيد : كل يَوْم مَسَرَّة فَهُوَ عيد وَلذَا قيل عيد وَعِيد وَعِيد صرن مجتمعة ... وَجه الحبيب وَيَوْم الْعِيد وَالْجُمُعَة

-ঈদ হচ্ছে প্রত্যেক খুশির দিন। এ কারণেই বলা হয়ে থাকে- ঈদ, ঈদ এবং ঈদ, (৩টি ঈদ) একত্রিত হয়েছে। তা হচ্ছে হাবীবের চেহারা, ঈদের দিন এবং জুমুআর দিন। (কিতাবুল কুল্লিয়াত)

এখানে দেখা যাচ্ছে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন কারণে একটি দিনকে ঈদের দিন বলা হচ্ছে।

এমনিভাবে হানাফী মাযহাবের বিখ্যাত ও গ্রহণযোগ্য ফাতওয়ার কিতাব 'শামী'তে বলা হয়েছে-

باب العيدين سمي به لأن لله فيه عوائد الإحسان ولعوده بالسرور غالبا : أو تفاؤلا، ويستعمل في كل يوم مسرة

-এ দিনগুলোকে ঈদের দিন বলে নামকরণ করা হয়েছে এজন্য যে, এ দিনে আল্লাহ পাকের অসংখ্য ইহসান ফিরে আসে এবং এ দিনগুলো ফিরে আসে মূলত আনন্দ আর খুশি নিয়ে। এ কারণেই প্রতিটি আনন্দের দিনের ক্ষেত্রে ঈদ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। (রদ্দুল মুহতার)।

وقال ابنُ الأَعرابِيّ :"سُمِّيَ العِيدُ عِيداً لأَنَّه يَعُودُ كلَّ سَنَةٍ بِفَرَحٍ مُجَدَّدٍ"

ইবনুল আরাবী বলেন, ঈদকে ঈদ বলা হয় এজন্য যে, তা প্রতি বছর নতুন আনন্দের বার্তা নিয়ে ফিরে আসে। (লিসানুল আরব)

যাই হোক, মুসলমানদের জন্য আনন্দ প্রকাশের দুটি দিনের একটি হচ্ছে ঈদুল ফিতর। পূর্ণ একটি মাস সিয়াম পালনের পর আল্লাহ পাকের অশেষ রহমত নিয়ে আসে ঈদুল ফিতর। এ যেন রামাদান শরীফের রোযা পালনের তাওফীক প্রদান করায় আল্লাহ পাকের শুকরিয়া আদায় করা এবং আনন্দ প্রকাশ করা।

ঈদুল ফিতর এর প্রেক্ষাপট

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, **إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا** অর্থাৎ প্রত্যেক জাতির জন্য ঈদের দিন রয়েছে আর আমাদের জন্য এটি (ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আদহা) ঈদের দিন। এখানে লক্ষণীয় যে, রাসূল ﷺ অন্যান্য জাতির আনন্দ-উৎসব থেকে মুসলিম জাতির ঈদকে আলাদা করেছেন। তার মানে তাদের আনন্দ প্রকাশ কিংবা উৎসবের দিনকে মুসলমানগণ উৎসব হিসেবে পালন করতে পারবেন না। আর এ বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে আবূ দাউদ শরীফে বর্ণিত হযরত আনাস (রা.) এর নিম্নোক্ত হাদীস থেকে।

عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا فَقَالَ مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ قَالُوا كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمَ الأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ .

-হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ যখন মদীনায় তাশরীফ নিলেন তখন দেখলেন সেখানকার লোকদের জন্য দুটি দিন নির্ধারিত আছে। এ দিনগুলোতে তারা খেল-তামাশা করে। রাসূল ﷺ তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, এ দুটো দিন কী? তারা জবাবে বলল, আমরা জাহিলিয়াতের যুগ থেকে এ দুদিনে খেল-তামাশা করে আসছি। রাসূল ﷺ ইরশাদ করলেন, আল্লাহ তোমাদের জন্য এ দুটি দিনের উৎসবকে আরো উত্তম দুটি দিনের দ্বারা পরিবর্তন করে দিয়েছেন। এর একটি হচ্ছে 'ঈদুল ফিতর' আর অপরটি হচ্ছে 'ঈদুল আদহা'। (আবু দাউদ)

এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে, ইসলামে বিনোদন নিষিদ্ধ নয় তবে তা হতে হবে শরীআতের গণ্ডির ভেতরে থেকে। কোনো অবস্থায়ই শরীআত সমর্থন করে না এমন বিনোদনের সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়া যাবে না।

ঈদুল ফিতরের ফযীলত

কোন লোক যখন তার মালিকের কাজ করে, তখন কাজ শেষ করে তার পারিশ্রমিক লাভ করে। সারা মাস কাজ করে এক সাথে পুরো মাসের পারিশ্রমিক লাভ করলে কি পরিমাণ আনন্দিত হতে পারে আমরা তা সহজেই কল্পনা করতে পারি। ঠিক তেমনিভাবে আল্লাহ পাকের বিশেষ নির্দেশে পুরো এক মাস রোযা রাখার মাধ্যমে বান্দাহ আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করেন। এর পর আসে তাঁর প্রতিফল লাভের কাঙ্ক্ষিত সে দিন। সে দিনটিই হচ্ছে ঈদের দিন। এ কারণেই এ দিনটির মর্যাদা এতো বেশি এবং এর আনন্দও সর্বাধিক।

-হযরত সাঈদ বিন আউস আনসারী (রা.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, ঈদুল ফিতরের দিন ফিরিশতাগণ রাস্তার প্রবেশদ্বারসমূহে অবস্থান করেন এবং বলেন, হে মুসলিম সমাজ! আপনারা মেহেরবান রবের দিকে বের হোন। তিনি আপনাদেরকে কল্যাণ প্রদানের মাধ্যমে ইহসান করেছেন। এরপর তিনি আপনাদেরকে এর প্রতিফল দান করবেন। আপনাদেরকে রাত জেগে ইবাদত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, আপনারা তা করেছেন। আপনাদেরকে দিনে রোযা রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, আপনারা রোযা রেখেছেন। আপনারা আপনাদের রবের আনুগত্য করেছেন, সুতরাং এখন তার প্রতিদান গ্রহণ করুন। এরপর যখন তারা নামায আদায় করেন, তখন একজন আহ্বানকারী আহ্বান করেন, "জেনে রেখো! তোমাদের রব তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। সুতরাং তোমরা ভাগ্যবান হয়ে তোমাদের ঘরসমূহে ফিরে যাও।" এ দিনটি হচ্ছে প্রতিফল প্রদানের দিন। আকাশে এ দিনটির নামকরণ করা হয়েছে 'يوم الجائزة' বা পারিশ্রমিক প্রাপ্তির দিন। (লাতাঈফুল মাআরিফ)

ঈদের দিনের করণীয় কাজসমূহ

ঈদুল ফিতরের দিনের প্রধান ও মূল আমল হলো ঈদের নামায আদায় করা। এ ছাড়াও এ মহান আনন্দের দিনকে আরো আনন্দময় করে তোলার জন্য রাসূল ﷺ এ দিনে উম্মতের জন্য

কিছু আমলের নির্দেশ প্রদান করেছেন যে আমলগুলোর অপরিসীম ফযীলত রয়েছে। এগুলোর মধ্যে কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

(১) তাকবীর পাঠ করা

ঈদের রাত অর্থাৎ রামাদান শরীফের শেষ দিবাগত রাত থেকে ঈদগাহে যাওয়া পর্যন্ত বেশি বেশি করে তাকবীর পাঠ করা সুন্নাত। তবে ঈদুল ফিতরের তাকবীর আস্তে আস্তে পড়তে হয়। আর ঈদুল আদহার তাকবীর উচ্চস্বরে পড়তে হয়।

হাদীস শরীফে আছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: زَيِّنُوا أَعْيَادَكُمْ بِالتَّكْبِيرِ

-হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমরা তোমাদের ঈদসমূহকে তাকবীর-এর মাধ্যমে সৌন্দর্যমণ্ডিত কর। (মু'জামুস সগীর লিত-তাবরানী)

(২) ঈদুল ফিতরের রাতে বেশি বেশি নফল নামায আদায় করা

عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى ليلة الفطر والاضحى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب

-হযরত উবাদা বিন সামিত (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আদহার রাতে সালাত আদায় করবে তার অন্তর মরবে না, যখন অন্তরসমূহ মৃত্যুবরণ করবে। (মু'জামুল আওসাত লিত-তাবরানী)

(৩) ঈদগাহে বের হওয়ার পূর্বে কোন কিছু আহার করা

এ ব্যাপারে অনেক হাদীস রয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ বিন বুরাইদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع فيأكل من أضحيته.

-রাসূল ﷺ ঈদুল ফিতরের দিন কোন কিছু না খেয়ে ঈদগাহে বের হতেন না, তবে ঈদুল আদহার দিন ঈদগাহ থেকে ফিরে আসার আগে কোন কিছু খেতেন না। ঈদুল আদহার দিন কুরবানীর গোশত থেকে প্রথম আহার গ্রহণ করতেন। (মুসনাদে ইমাম আহমদ)

বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'ফাতহুল কাদীর' গ্রন্থকার এ খাবার মিষ্টিদ্রব্য হওয়ার মত প্রকাশ করেন। কারণ এক বর্ণনায় এসেছে-

كان عليه الصلاة والسلام لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا

-রাসূল ﷺ ঈদুল ফিতরের দিন বেজোড় সংখ্যক খেজুর না খেয়ে ঈদগাহে যেতেন না।

(৪) ঈদের দিন ভোরে গোসল করা

ইমাম তাবরানী (র.) বর্ণনা করেন,

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وغدا بغسل إلى المصلى وختمه بصدقة رجع مغفورا له

-হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি রামাদান শরীফের রোযা রাখবে এবং (ঈদের দিন) ভোরে গোসল করে ঈদগাহে যাবে, আর সাদকার মাধ্যমে শেষ করবে সে ঈদগাহ থেকে গুনাহমুক্ত হয়ে ফিরবে। (মু'জামুল আওসাত লিত-তাবরানী)

(৫) ঈদের নামায শেষে অন্য রাস্তা দিয়ে ফিরে আসা

ঈদের নামায আদায় করে সম্ভব হলে অন্য রাস্তা দিয়ে ফিরে আসা সুন্নাতে মুস্তাহাব্বাহ। বুখারী শরীফের এক বর্ণনায় আছে-

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ

-হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ ঈদের দিন ভিন্ন রাস্তা দিয়ে ফিরে আসতেন।

তাছাড়া মুসনাদে ইমাম বাযযার-এ বর্ণিত আছে-

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اغْتَسَلَ لِلْعِيدَيْنِ، وَجَاءَ إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًا، وَرَجَعَ فِي غَيْرِ الطَّرِيقِ الَّذِي خَرَجَ فِيهِ.

-হযরত মুহাম্মদ বিন উবায়দুল্লাহ তাঁর পিতা থেকে, তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ দুই ঈদের দিন গোসল করতেন, পায়ে হেঁটে ঈদগাহে যেতেন এবং যে রাস্তা দিয়ে যেতেন অন্য রাস্তা দিয়ে ফিরতেন।

এ ছাড়াও সুগন্ধি ব্যবহার, উত্তম কাপড় পরিধান করা সুন্নাত।

সর্বোপরি ঈদের দিনের মূল কাজ হলো ঈদের নামায। ঈদের নামায ওয়াজিব এবং তা খোলা মাঠে আদায় করা সুন্নাত। তবে কোন কারণে মসজিদে আদায় করলে তা আদায় হয়ে যাবে।

ঈদের নামাযের নিয়ম

ঈদের নামাযের জন্য জামাআত শর্ত। সুতরাং কেউ একাকী নামায আদায় করলে তা আদায় হবে না। (শামী)

ঈদের নামাযের প্রতি রাকাআতে অতিরিক্ত তিন তাকবীর বলতে হয়। হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ রয়েছে,

روي عن إبن مسعود رضي الله عنه أنه كبر أربعاً ثم قرأ ثم كبر فركع، ثم يقوم في الثانية ثم يُكبر أربعاً

-হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ ঈদের নামাযে চার তাকবীর দিতেন, অতপর কিরাত পরতেন (সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরা), এর পর তাকবীর বলে রুকুতে যেতেন। দ্বিতীয় রাকাআতে দাঁড়িয়ে (সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরা পড়ার পর আরও চার তাকবীর বলতেন। (মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক)

উপরোক্ত হাদীসে চার তাকবীর বলে প্রথম রাকাআতে তাকবীরে তাহরীমাসহ চার তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাকাআতে রুকুর তাকবীরসহ চার তাকবীরের কথা বলা হয়েছে। সুতরাং অতিরিক্ত তিন তাকবীরই বলতে হবে।

দুররুল মুখতার গ্রন্থকার বলেন- অতিরিক্ত তাকবীর হচ্ছে প্রতি রাকাআতে তিনটি তাকবীর। এর ব্যাখ্যায় শামী গ্রন্থকার সাহাবায়ে কিরামের বিভিন্ন মতামত উল্লেখ করে বলেন-

هذا مذهب ابن مسعود وكثير من الصحابة ، ورواية عن ابن عباس وبه أخذ أئمتنا الثلاثة

-আর এটিই (অতিরিক্ত তিন তাকবীর বলা) হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) ও অনেক সাহাবীর মাযহাব। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এর একটি মতামতও অনুরূপ। আর ইহাই আমাদের তিন ইমাম তথা ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর মাযহাব।

সবশেষে ঈদের দিনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো সাদকায়ে ফিতর আদায় করা। যদিও তা ঈদের দিনের পূর্বেই আদায় করা উত্তম, তবুও মালিকে নিসাবের কেউ যদি তা পূর্বে আদায় করে নিতে না পারেন তবে ঈদের নামাযে ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বেই আদায় করে নিতে হবে।

ঐতিহাসিক বদর যুদ্ধের তাৎপর্য ও শিক্ষা

মোহাম্মদ মঈনুল ইসলাম পারভেজ

মাহে রামাদানের মহিমান্বিত ১৭তম দিন ঐতিহাসিক 'বদর দিবস'। প্রতিবছর দিনটি আমাদের মাঝে আসে ঈমানী চেতনা জাগিয়ে তুলতে। বদর যুদ্ধ ইসলামের ইতিহাসে প্রথম সশস্ত্র যুদ্ধ, যা মুসলমান ও কাফিরদের মধ্যে দ্বিতীয় হিজরী সনের ১৭ রামাদান তথা ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ মার্চ বদর নামক স্থানে সংগঠিত হয়। এটা মদীনা হতে প্রায় ৮০ মাইল দূরে অবস্থিত।

ইসলামের ইতিহাসে ঐতিহাসিক বদর যুদ্ধের তাৎপর্য অত্যধিক। এ যুদ্ধ ছিল আত্মরক্ষার, সত্যের পক্ষে, অন্যায়-যুলম ও অবৈধ আধিপত্যের বিরুদ্ধে। সর্বোপরি মানবকল্যাণের নিমিত্তে। এ যুদ্ধে মুসলমানরা সংখ্যায় অনেক কম হয়েও মক্কার কাফির পরাশক্তিকে পরাজিত করে ইসলামের স্বর্ণোজ্জ্বল ইতিহাসের সূচনা করে। এর মাধ্যমে সত্য মিথ্যার পার্থক্য সূচিত হয়। এজন্য এ যুদ্ধকে সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী বলা হয়। মহাগ্রন্থ আল কুরআনে এই দিনকে 'ইয়াওমুল ফুরকান' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ পবিত্র ভূমি মক্কা থেকে মদীনা মুনাওয়ারায় হিজরত করার পর সেখানে একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ছিলেন এর অধিপতি। তিনি সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় শান্তি এবং নিরাপত্তার লক্ষ্যে মদীনার অন্যান্য জাতি গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে মদীনা সনদের মাধ্যমে একটি শান্তি ও সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ হন। মদীনায় রাসূল ﷺ তাঁর সুদক্ষ নেতৃত্বে অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে শতধা বিভক্ত জাতিকে একটি সুশৃঙ্খল জাতিতে পরিণত করেন। একটি নতুন ধর্ম ও রাষ্ট্রের উত্থান এবং রাসূল ﷺ ও মুসলমানদের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি মক্কা-মদীনার ইসলাম বিরোধী শক্তিগুলোর জন্য প্রবল আতঙ্ক ও গাত্রদাহের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাছাড়া ইসলাম নামক একটি নতুন ধর্মের উন্মেষে নিজেদের প্রাধান্যও খর্ব হয় এবং স্বতন্ত্র মদীনা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে মক্কা থেকে সিরিয়া পর্যন্ত কুরাইশদের যে অবাধ বাণিজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল তাতে বিঘ্ন ঘটে। মক্কার কুরাইশরা মদীনায় নব প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছিল। এমনকি মদীনা আক্রমণ করে তারা রাসূল ﷺ তথা ইসলামকে ভূপৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন করার পরিকল্পনা করেছিল। এরই অংশ হিসেবে তারা কুরাইশ নেতা আবূ সুফিয়ানের নেতৃত্বে একটি বাণিজ্যিক কাফেলা সিরিয়ায় পাঠিয়েছিল অস্ত্রশস্ত্র ও খাদ্য-রসদ নিয়ে আসার জন্য। মক্কার আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা বাদ পড়েনি যারা এ বাণিজ্যে কিছু পুঁজি বিনিয়োগ করেনি। শুধু বাণিজ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে নয় বরং পূণ্যের কাজ এবং সামাজিক কর্তব্য মনে করে সবাই এতে অংশগ্রহণ করেছিল। রাসূল ﷺ যখন সংবাদ পেলেন আবূ সুফিয়ান সিরিয়া থেকে অস্ত্রশস্ত্র ও খাদ্য-রসদের বিশাল সম্ভার নিয়ে মক্কায় ফিরছেন। তখন তিনি বদর গিরিপথে আবূ সুফিয়ানকে বাধা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। কারণ মক্কায় এই অস্ত্র ও খাদ্য-রসদ ভাণ্ডার পৌঁছলে কুরাইশরা তা নিয়ে মদীনায় হামলা চালাবে। এ উদ্দেশ্যে রাসূল ﷺ দ্বিতীয় হিজরীর ১২ রামাদান ৩১৩ জন সাহাবীর একটি ক্ষুদ্র বাহিনী নিয়ে মদীনা থেকে ৮০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে বদর গিরিপথের দিকে রওয়ানা হন। আবূ সুফিয়ান তার বাণিজ্যিক কাফেলার উপর মুসলমানদের আক্রমণের সম্ভাবনা বুঝতে পেরে দমদম আল গিফারীর মাধ্যমে মক্কায় সংবাদ পৌঁছে দিলেন যে, মাল-সামানাসহ বাণিজ্যিক কাফেলাকে মুসলমানদের কবল থেকে রক্ষা করার জন্য অতিসত্বর তারা যেন এগিয়ে আসে। এদিকে কুরাইশরা আবূ জাহলের নেতৃত্বে আবূ সুফিয়ানকে সাহায্য করার জন্য অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত ১০০০ সৈন্যের বিশাল এক বাহিনী নিয়ে রওয়ানা করে। আবূ লাহাব ব্যতীত কুরাইশদের প্রায় সকল গোত্রের দলপতিই উক্ত বাহিনীতে অংশগ্রহণ করে। এ বাহিনী যথাস্থানে পৌঁছে সংবাদ পেল যে, আবূ সুফিয়ান বাণিজ্যিক কাফেলা নিয়ে নিরাপদে মক্কায় চলে গেছেন। সে সময় আবূ জাহল তার দলকে বলল, 'মুসলমানগণ যেন এত বড় দুঃসাহস আর কোনো দিন না করে তাই তাদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করা আবশ্যক। চলো, বদর প্রান্তরে উৎসব করে যাই।' রাসূল ﷺ সাফরা নামক স্থানে পৌঁছার পর আবূ জাহল এর নেতৃত্বে আসা মক্কা বাহিনীর বিশাল রণপ্রস্তুতির কথা অবহিত হলে তাদের শক্তি ও প্রাচুর্যের কথা সাহাবায়ে কিরামকে জানিয়ে দিলেন এবং তাদের সঙ্গে পরামর্শ সভায় বসলেন। সভায় মুহাজির আনসার সকলেই কুরাইশ বাহিনীর মুখোমুখি হওয়ার ব্যাপারে মত দেন। বিশেষ করে হযরত মিকদাদ বিন আসওয়াদ (রা.) ও সাদ বিন মাআয (রা.) এর বক্তব্যে রাসূল ﷺ এর হাস্যোজ্জ্বল চেহারা ফুটে উঠে। অতঃপর রাসূল ﷺ সাহাবায়ে কিরামকে নিয়ে বদর প্রান্তরে উপনীত হন। যুদ্ধের আগাম ফলাফল ঘোষণা করে মহান আল্লাহ বলেন, 'আর স্মরণ করো, আল্লাহ তোমাদের প্রতিশ্রুতি দেন যে দুই দলের একদল তোমাদের আয়ত্তে আসবে। অথচ তোমরা চেয়েছিলে যে নিরস্ত্র দলটি তোমাদের আয়ত্তে আসুক আর আল্লাহ চেয়েছিলেন সত্যকে তার বাণী দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে এবং অবিশ্বাসীদেরকে নির্মূল করতে। (সূরা আনফাল, আয়াত-০৭)

অবশেষে ১৭ রামাদান শুক্রবার বদর প্রান্তরে যুদ্ধের দামামা বেঝে উঠল। সে যুগের প্রথা অনুযায়ী দ্বৈতযুদ্ধে হযরত হামযা (রা.) তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী উতবা বিন রাবিআকে, হযরত আলী (রা.) তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ওলিদ বিন উতবাকে প্রথম আঘাতেই খতম করে ফেলেন। এদিকে বয়োবৃদ্ধ হযরত উবাইদা বিন হারিস (রা.) তাঁর প্রতিপক্ষ শায়বা বিন রাবীআর সঙ্গে যুদ্ধে আহত হলেন। হযরত আলী (রা.) ও হযরত হামযা (রা.) হযরত উবাইদা (রা.) এর সাহায্যে এগিয়ে এসে তাঁকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেন। এরই ফাঁকে হযরত আলী (রা.) শায়বাকে হত্যা করেন। প্রথম আঘাতেই সেরা তিনজন বীরযোদ্ধা ও গোত্র নেতাকে হারিয়ে কুরাইশ পক্ষ মরিয়া হয়ে মুসলমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। রাসূল ﷺ এর নির্দেশে মুসলমানরা ঈমানী শক্তিতে বলিয়ান হয়ে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যান। তুমুল যুদ্ধে আনসারদের বনু সালামা গোত্রের কিশোর দুই ভাই হযরত মুআয ও হযরত মুআওয়িয ইবনু আফরা (রা.) আবূ জাহলকে হত্যা করেন।

হযরত বিলাল (রা.) এর হাতে তাঁর সাবেক মনিব উমাইয়া ইবনে খালফ নিহত হন। উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) তাঁর মামা আস ইবনে

হিশাম ইবনে মুগিরাকে হত্যা করেন। বিকেলের মধ্যে যুদ্ধ শেষ হয়ে যায়। ভীষণ এ যুদ্ধে কুরাইশ বাহিনী শোচনীয় পরাজয় বরণ করে। মুসলমানদের ভাগ্যে বিজয়ের গৌরব অর্জিত হলো। হক ও বাতিলের মধ্যে চূড়ান্ত ফয়সালা হলো। পবিত্র কুরআনের বর্ণানানুযায়ী এ যুদ্ধে আল্লাহ তাআলা ফিরিশতা প্রেরণ করে মুসলমানদের সাহায্য করেন। এ যুদ্ধে মুসলমানদের মধ্যে ছয়জন মুহাজির ও আটজন আনসার শহীদ হন। কাফিরদের পক্ষে ৭০ জন নিহত ও ৭০ জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বন্দি হয়। তাদের বড় বড় ২৪ জন নিহত নেতাকে বদরের একটি পরিত্যক্ত দুর্গন্ধময় কূপে নিক্ষেপ করা হয়। মুসলমানগণ প্রচুর গনীমতের মালের অধিকারী হন। যুদ্ধ শেষে আরবের রীতি অনুযায়ী রাসূল ﷺ মুসলিম বাহিনীসহ বদর ময়দানে তিনদিন অবস্থান করার পর মদীনায় ফিরে আসেন।

বদর যুদ্ধের পর রাসূল ﷺ এর অবস্থান ছিল পরাজিত যুদ্ধ বন্দিদের হত্যা না করা ও কষ্ট না দেওয়া। আরবের তৎকালীন প্রথানুযায়ী যুদ্ধ বন্দিদেরকে হত্যা করা, চির দাস বানানো অথবা মুক্তিপণ নিয়ে তাদেরকে মুক্তি দেওয়া হতো।

সাহাবায়ে কিরামের সাথে পরামর্শক্রমে রাসূল ﷺ বন্দীদের হত্যা না করে মুক্তিদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সিদ্ধান্ত ঘোষিত হলো, মুক্তিপণ দেওয়ার মতো যাদের সামর্থ আছে তারা মুক্তিপণ দিয়ে মুক্তি লাভ করবে। আর যাদের সামর্থ নেই তাদের মুক্তিপণ নির্ধারিত হলো আনসার সাহাবীদের ছেলে মেয়েদের লেখাপড়া শিক্ষা দেওয়া। বদরের বন্দিদের প্রতি রাসূল ﷺ যে আদর্শ ও উদার ব্যবহার দেখালেন, জগতের ইতিহাসে তার তুলনা হয় না। তাঁর আদেশে মদীনার আনসার ও মুহাজিররা সাধ্যানুযায়ী বন্দিদেরকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়ে আপন আপন গৃহে স্থান দিলেন এবং আত্মীয়-স্বজনের মতোই তাদের সঙ্গে সৌহার্দপূর্ণ ব্যবহার করেন। বন্দিদের স্বগতোক্তি ছিল "মদীনাবাসীদের উপর আল্লাহর রহমত নাযিল হোক। তাঁরা আমাদের উটে চড়তে দিয়ে নিজেরা পায়ে হেঁটে গেছে, নিজেরা শুষ্ক খেজুর খেয়ে আমাদের রুটি খেতে দিয়েছে।"

রাসূল ﷺ ও সাহাবায়ে কিরামের এই সুন্দর ও উদার ব্যবহার দেখে বন্দিদের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে। ফলে পরবর্তীতে অনেকেই ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য এক ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা বদর যুদ্ধ। এ যুদ্ধ থেকে আমরা কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শিক্ষা লাভ করতে পারি তা হলো-

ক. দুআয় শিথিলতা প্রদর্শন না করা: হাদীসের ভাষ্য মতে দুআ হচ্ছে ইবাদত। কঠিন বিপদ-আপদ এমনকি জীবনে চরম মুহূর্তে দুআর ব্যাপারে শিথিলতা প্রদর্শন না করতে বদর যুদ্ধ আমাদেরকে শিক্ষা দেয়। কেননা বদর যুদ্ধের পূর্ব মুহূর্তে আল্লাহর সাহায্য কামনায় রাসূল ﷺ আল্লাহর দরবারে মিনতি সহকারে বলেছিলেন, 'হে আল্লাহ! তুমি আমার সাথে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছ তা পূর্ণ করো। হে আল্লাহ, আমি তোমার নিকট তোমার ওয়াদাকৃত সাহায্যের নিবেদন করছি। হে আল্লাহ, আজ যদি আপনি এ দলকে ধ্বংস করেন তাহলে আপনার ইবাদত করার জন্য পৃথিবীতে কেউ থাকবে না।' (সহীহ মুসলিম, কিতাবুল জিহাদ ওয়া সিয়ার)

আল্লাহ তাআলা বলেন, 'স্মরণ করো, যখন তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেছিলে তখন তিনি তোমাদেরকে জবাব দিলেন, আমি তোমাদেরকে এক হাজার ফিরিশতা দিয়ে সাহায্য করব যারা পরপর আসবে।' (সূরা আনফাল, আয়াত-৯৯)

রাসূল ﷺ এর সে দিনকার দুআ শুধু কবূলই হয়নি, বরং সে দুআর বদৌলতে আজ আমরা ইসলাম পেয়েছি।

খ. সব কাজে আল্লাহর উপর অগাধ বিশ্বাস ও ভরসা রাখা: দুনিয়া-আখিরাতের সকল কাজে, সকল মাকসুদ হাসিল করার জন্য এবং সকল বালা-মুসীবত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য একমাত্র আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা রাখা হচ্ছে ইসলাম ও ঈমানের শিক্ষা।

মহান আল্লাহ বলেন, 'আর আল্লাহর উপরই মুমিনদের ভরসা করা উচিত।' (সূরা ইবরাহীম, আয়াত-১১)

অন্যত্র আল্লাহ বলেন, 'আর যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে, তিনিই তার জন্য যথেষ্ট।' (সূরা তালাক, আয়াত-০৩)

বদর যুদ্ধ প্রমাণ করে সংখ্যা ও সরঞ্জামের কম-বেশি হওয়া বিজয়ের মাপকাটি নয়। বরং মহান আল্লাহর উপর দৃঢ় ঈমান ও নির্ভরতা হলো বিজয়ের মূল হাতিয়ার। এ যুদ্ধ মুসলমানদের শিখিয়েছে জাগতিক সব প্রস্তুতির পরেও সাফল্যের জন্য নির্ভর করতে হবে একমাত্র মহান আল্লাহর ওপর। তবেই মহান আল্লাহর সাহায্য আসবে এবং বিজয় সম্ভব হবে।

গ. সংখ্যা সর্বদা মুখ্য ভূমিকা পালন করে না: আল্লাহর উপর ভরসা করে সততা ও ইখলাস সহকারে তাঁর দ্বীনের পতাকাকে উড্ডীন করার লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়ার কারণে সংখ্যায় কম হওয়া সত্ত্বেও তিনি বদর প্রান্তরে মুসলমানদের বিজয় ও সফলতা দিয়েছেন। আমরা জানি এ যুদ্ধে মাত্র ৩১৩ জনের ক্ষুদ্র মুসলিম দল ১০০০ জনের পরিপূর্ণ অস্ত্রে সজ্জিত কাফিরদের বিরুদ্ধে বিজয় ছিনিয়ে এনেছিলেন।

মহান আল্লাহ বলেন, 'এবং আল্লাহ তোমাদের হীন অবস্থায় বদর যুদ্ধক্ষেত্রে তোমাদের সাহায্য করেছেন, সুতরাং আল্লাহকে ভয় করো। যেন তোমরা শুকরগোজার হতে পার। (সূরা আলে ইমরান, আয়াত-১২৩)

ঘ. ঐক্যের শিক্ষা: ঐক্য হচ্ছে সফলতা ও বিজয়ের অন্যতম ভিত্তি। আমরা লক্ষ্য করি বদর যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয়ের অন্যতম কারণ ছিল তাঁদের দৃঢ়পদ অবস্থান, একতা ও অবিচলতা। অন্যদিকে শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণকারী কাফিরদের অবস্থা ছিল ভঙ্গুর ফলে তারা সহজেই পরাজিত হয়েছিল। আজও ইসলাম বিদ্বেষীদের যুলম-নির্যাতন, শিরক, কুফর, অসত্য ও অন্যায়ের মুকাবিলায় মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন বিজয় ছিনিয়ে আনতে অবশ্যই সক্ষম।

তাছাড়া অন্যায়কারী অন্যায় অপরাধ সংঘটিত করেও পার না পাওয়া, সব অপরাধীকে শাস্তির আওতায় নিয়ে আসা, দেশ ও সমাজে ইনসাফ ও মানবতার রাজত্ব প্রতিষ্ঠা এবং কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়াই বদর যুদ্ধের সুমহান শিক্ষা।

বদর যুদ্ধ শুধু ইসলামের ইতিহাসে নয়, বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাসেও অনন্য অবস্থান দখল করে আছে। বদরের যুদ্ধ সুদূরপ্রসারী প্রভাব সৃষ্টি করেছে। বদরের বিজয় ইসলামকে শাশ্বত চিরন্তন, বিজয়ী ও সার্বজনীন ধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। তাছাড়া এ বিজয় রাসূল ﷺ এর নবুওয়াতের সত্যতা এবং তাঁকে মদীনায় প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের একচ্ছত্র অধিপতি হিসেবেও প্রতিষ্ঠিত করে। মুসলমানদের এ বিজয় পরবর্তীকালে ইসলামী সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের সূচনা করে এবং মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে বদর যুদ্ধের উদ্দেশ্য পূর্ণতা লাভ করে। বদর যুদ্ধের সুমহান শিক্ষা সর্বযুগে মুসলিম জাতিকে প্রেরণা যুগিয়েছে এবং ভবিষ্যতেও প্রতিটি বিষয়ে প্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করবে।

শাওয়ালের রোযার গুরুত্ব

ইব্রাহিম আহমদ আরিফ

শাওয়াল মাসে মুমিনদের কিছু বিশেষ করণীয় রয়েছে। এই মাসে প্রথম যে রাত আমাদের নিকটে আসে তা ঈদুল ফিতরের রাত। দীর্ঘ এক মাস সংযমের পর আমরা এ রাতটি আনন্দ ফূর্তিতে কাটিয়ে দেই অনেকে। কিন্তু এই রাতটি অনেক ফযীলতপূর্ণ একটি রাত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "مَنْ قَامَ لَيْلَتَيِ الْعِيدَيْنِ مُحْتَسِبًا لِلَّهِ لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ."

-যে ব্যক্তি দুই ঈদের রাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ইবাদাত করবে তার অন্তর ঐ দিন মরবে না, যে দিন অন্তরসমূহ মরে যাবে। (সুনানে ইবনে মাজাহ)

তাই ঈদের রাতে আনন্দ ফূর্তিতে কাটিয়ে না দিয়ে আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকা আমাদের উচিত।

অতঃপর এই মাসে আমাদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ করণীয় হচ্ছে; এই মাসে ছয়টি রোযা রাখা। সহীহ মুসলিম, তিরমিযীসহ নানা কিতাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর একটি হাদীস বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ فَذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ"

-যে ব্যক্তি রামাদান মাসে রোযা পালন করল, তারপর শাওয়াল মাসের ছয় দিন রোযা পালন করল, সে লোক যেন সম্পূর্ণ বছরই রোযা পালন করল। (তিরমিযী)

এই হাদীসের ব্যাখ্যায় দুটি বিষয়ে আলোকপাত করতে চাই।

১. শাওয়ালের ছয়টি রোযার হুকুম প্রসঙ্গে ইমাম নববী (র.) বলেন,

فيه دلالة صريحة لمذهب الشافعي وأحمد وداود وموافقيهم في استحباب صوم هذه الستة.

- ইমাম শাফিঈ, আহমদ ও দাউদ জাহেরী (র.) এর মতে এই ছয়টি রোযা রাখা মুস্তাহাব। (শরহু সহীহ মুসলিম লিন নববী, ১১৬৪ নং হাদীসের ব্যাখ্যা)

শরহু সহীহ মুসলিম লিন নববী এবং তুহফাতুল আহওয়াযী গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মালিক ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) এর নিকট এ ছয়টি রোযা মাকরূহ। বস্তুত তা সঠিক নয়।

ইমাম কাসিম ইবনে কুতলুবুগা (র.) তাঁর تحرير الأقوال في صوم الست من شوال কিতাবের মধ্যে প্রমাণ করেছেন যে, ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) এর মাযহাবও ইমাম শাফিঈ ও আহমদের মতো। তাদের নিকটেও এ রোযাগুলো রাখা মুস্তাহাব। ইলম পিপাসু বন্ধুগণ কাসিম ইবনে কুতলুবুগা (র.) এর কিতাবখানা দেখতে পারেন।

২. ছয়টি রোযা কি রামাদানের সাথে মিলিয়ে রাখতে হবে? নাকি শাওয়ালের যেকোনো দিন রাখলেই চলবে?

ইমাম মুহিউস সুন্নাহ (র.) বলেন, একদল আলিম শাওয়ালের যেকোনো দিন এই ছয়টি রোযা রাখা মুস্তাহাব মনে করেন। কিন্তু পছন্দনীয় মত হচ্ছে রামাদানের সাথে মিলিয়ে শাওয়ালের প্রথম দিকে রাখা। তবে মাঝে ঈদের দিন ব্যতীত। (মিরকাতুল মাফাতিহ ৪/১৪১৬)

ইমাম নববী (র.) বলেন, আমাদের মনীষীদের মতে, উত্তম হচ্ছে ঈদুল ফিতরের পরের ছয় দিন পরপর রোযাগুলো রাখা। তবে যদি বিরতি দিয়ে দিয়ে রাখে বা মাসের শেষে রাখে তাহলেও 'রামাদানের পরে' রোযা রাখার ফযীলত পাওয়া যাবে। কারণ সব অবস্থায়ই বলা যায়, রামাদানের পরে শাওয়ালের ছয় রোযা রেখেছে। (শরহুল মুসলিম লিন-নববী)

ফকীহুল আহনাফ মুল্লা আলী কারী (র.) রামাদানের সাথে না মিলিয়ে বিক্ষিপ্তভাবে রাখাকে মুস্তাহাব বলেছেন। এমনই ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)ও বিচ্ছিন্নভাবে রাখাকে প্রাধান্য দেন। (মাআরিফুস সুনান)

সুতরাং বুঝা গেল শাওয়ালের যেকোনো দিন এই ছয়টি রোযা রাখলে তা মুস্তাহাব হবে। সে রামাদানের সাথে মিলিয়ে রাখুক বা বিক্ষিপ্তভাবে রাখুক। কিন্তু অধিকাংশ আহনাফের মতে, বিক্ষিপ্তভাবে রাখা উত্তম।

রামাদানের সাথে এই ছয়টি রোযা রাখলে সম্পূর্ণ বছর রোযা রাখার সাওয়াব কীভাবে পাওয়া যায়? এর ব্যাখ্যা ইমাম মুল্লা আলী কারী (র.), ইমাম নববী (র.)সহ অনেক ইমামই তাদের কিতাবে উল্লেখ করেছেন। তারা বলেন প্রতিটি আমলের জন্য উম্মতে মুহাম্মদীকে ১০ গুণ সাওয়াব দেওয়া হয়। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন, مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا -যে একটি সৎকর্ম করবে, সে তার দশগুণ পাবে। (সূরা আনআম, আয়াত-১৬০)

রামাদানের ৩০টি রোযার সাথে শাওয়ালের ছয়টি যোগ করলে হয় ৩৬টি। এখন ৩৬টি রোযাকে ১০ গুণ সাওয়াব দ্বারা গুণ দিলে হবে ৩৬০। সুতরাং এই ৩৬টি রোযা রাখলে চন্দ্র মাস অনুযায়ী সারা বছরের সাওয়াব পাওয়া যাবে।

এছাড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ও হাদীসের মধ্যে এর একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "صِيَامُ شَهْرٍ بِعَشَرَةِ أَشْهُرٍ، وَسِتَّةِ أَيَّامٍ بَعْدَهُنَّ بِشَهْرَيْنِ، فَذَلِكَ تَمَامُ سَنَةٍ."

-রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, রামাদানের এক মাসের রোযা দশ মাসের রোযার সমান। এবং পরের (শাওয়ালের) ছয়টি রোযা দুই মাসের রোযার সমান। সুতরাং এই হলো পূর্ণ এক বছরের রোযা। (সুনানে দারামী)

সুতরাং রামাদানের সাথে শাওয়ালের ছয়টি রোযা রাখলে সম্পূর্ণ বছর রোযা রাখার সাওয়াব পাওয়া যাবে।

শাওয়াল মাসের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ করণীয় হচ্ছে, যাদের রামাদানে রোযা কাযা হয়েছে; বিশেষত মহিলাদের হায়িযের কারণে যেসব রোযা কাযা হয়েছে তাদের সেসব রোযা শাওয়াল মাসেই আদায় করে নেওয়া। কেননা ফরয রোযা যা কাযা হয়েছে তা ঝুলিয়ে রাখা উচিত নয়। যদি আপনি তা আদায় করতে দেরি করেন আর মৃত্যু চলে আসে তবে অবশ্যই আপনি সেই সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন। তবে চাইলে পরবর্তী রামাদান আসার পূর্ব পর্যন্ত আপনি কাযা আদায় করতে পারবেন। তবে তা শাওয়ালে আদায় করে নেওয়াই উত্তম। আল্লাহ তাআলা বলেন, فَمَنْ كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ -তোমাদের মধ্যে যদি কেউ অসুস্থ হয় কিংবা সফরে থাকে (এবং এ কারণে তাকে নির্ধারিত দিনের রোযা ছাড়তে হয়) তাহলে সে অন্য (সময়ের) দিনগুলোতে রোযা রেখে (রোযার) সংখ্যা পূরণ করবে। (সূরা বাকারা)

আল্লাহ আমাদের সবাইকে শাওয়াল মাসের যাবতীয় করণীয় পালন করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

সাদাকাতুল ফিতর ও সংশ্লিষ্ট মাসাঈল

মো. কুতবুল আলম

সাদাকাতুল ফিতর একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত, এটি যাকাতেরই একটি প্রকার। রাসূলে আকরাম ﷺ গুরুত্ব সহকারে তা আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। সাদাকাহ শব্দের অর্থ দান এবং আল-ফিতর শব্দের অর্থ ভঙ্গ করা বা রোযা ভেঙে পানাহারের বৈধতা লাভ করা। সাদাকাতুল ফিতর অর্থাৎ পানাহারের বৈধতার সুযোগ প্রাপ্তিতে কিছু দান করা। 'ঈদুল ফিতর' মানে পানাহারের বৈধতা দানের আনন্দে খুশি। শাওয়াল মাসের প্রথম তারিখ ঈদুল ফিতর, কেননা একাধারে রামাদান মাস রোযা রাখার পর এ তারিখে রোযা ভঙ্গ করা হয়। ঈদুল ফিতরের দিন সুবহে সাদিকের সময় যে 'দান' ওয়াজিব হয় তাকে সাদাকাতুল ফিতর বলা হয়। ইসলামী শরীআতের পরিভাষায় ঈদুল ফিতরের দিন সুবহে সাদিকের সময় নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক তার নিজের ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান-সন্ততির পক্ষ হতে শরীআত কর্তৃক নির্ধারিত যে সাদকাহ আদায় করেন তাকে সাদাকাতুল ফিতর বলা হয়। একে যাকাতুল ফিতরও বলা হয়। আমাদের দেশে এটি 'ফিতরা' নামে পরিচিত।

ফিতরার উপকারিতা

অনেক উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সাদাকাতুল ফিতর এর বিধান ইসলামী শরীআয় বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। রামাদান মাসে রোযা পালনের তাওফীক দানের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা বান্দার প্রতি যে অফুরন্ত নিআমত দান করেছেন, সেজন্য মহান রাব্বুল আলামীনের গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের বহিঃপ্রকাশ হলো এই ফিতরা আদায়। কেননা মহান আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে দীর্ঘ এক মাস রোযা রাখার তাওফীক দান করেছেন। রোযা পালনকালে ইচ্ছা-অনিচ্ছায় ছোট ছোট ত্রুটি হয়ে গেছে তা থেকে ক্ষমা লাভ করে রোযার পরিপূর্ণ কল্যাণ ফিতরার মাধ্যমে অর্জিত হয়।

আল্লাহ তাআলার শোকর প্রকাশ ছাড়াও ফিতরা আদায়ে রয়েছে অনেক উপকারিতা। রোযা পালনরত অবস্থায় রোযাদার অনিচ্ছাকৃত যেসব ভুল করে থাকে, তার ক্ষতিপূরণস্বরূপ এবং রোযাদারের দ্বারা ঘটে যাওয়া সব অবাঞ্ছনীয় কাজ তথা ফাহিশা কাজ থেকে রোযাকে পবিত্র করার অন্যতম মাধ্যম হলো 'ফিতরা'। কেননা মহান আল্লাহ নিজেই বলেছেন, إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ -নিশ্চয়ই ভালো কাজ পাপকে ধ্বংস করে দেয়। (সূরা হুদ, আয়াত ১১৪)

রোযা পালনের ত্রুটি বিচ্যুতির ক্ষতিপূরণ বিবেচনায় এবং ধনী-গরীব সকলে সমানভাবে যেন ঈদুল ফিতরের দিন আনন্দ উপভোগ করতে পারে। ঈদের দিন গরীব ও মিসকীনদের আনন্দ ও উত্তম খাবারের আয়োজনে ফিতরা সহায়ক হয়ে থাকে। ফিতরা থেকে প্রাপ্ত অর্থে তারাও ধনীদের সঙ্গে ঈদের আনন্দ উপভোগ করতে পারে সেজন্য এই সাদাকাতুল ফিতর ওয়াজিব করা হয়েছে। ফিতরা মূলত রোযার যাকাত। যাকাত যেমন সম্পদকে পবিত্র করে, ঠিক তেমনি ফিতরাও রোযাকে পবিত্র করে। এ প্রসঙ্গে হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে,

عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين" (أبو داود وابن ماجه)

-হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রাসূল ﷺ যাকাতুল ফিতর নির্ধারণ করেছেন রোযাদারের অনর্থক, অশালীন কথা ও কাজের দ্বারা রোযার যে ক্ষতি হয়েছে তা পূরণের জন্য এবং গরীব-মিসকীনদের খাদ্যের যোগানোর জন্য। (সুনানু আবি দাউদ, বাবু যাকাতিল ফিতরি ও সুনানু ইবনি মাজাহ, বাবু সাদাকাতিল ফিতরি)

সাদাকাতুল ফিতর রোযাদারের ঐসকল ত্রুটি-বিচ্যুতির ক্ষতিপূরণ করবে যা তার রোযাকে ত্রুটিপূর্ণ করেছে এবং এটি ঈদের দিন দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদেরকে অন্যের কাছে সাহায্য চাওয়া থেকে বিরত রাখবে অন্তত তাদের এ খুশির দিনের প্রয়োজন পূরণ করবে, তারা উত্তম পোশাক ও উন্নতমানের খাবার খেতে পারবে, তাদের খাদ্য বৃদ্ধি করবে যাতে করে সমাজের ধনী-গরীব সকলের জন্য ঈদের দিনটি হয় অত্যন্ত আনন্দময়।

ওয়াকি ইবনুল জাররাহ (র.) বলেন, "زكاة الفطرة لشهر رمضان كسجدة السهو للصلاة، تجبر نقصان الصوم، كما يجبر السجود نقصان الصلاة" -রামাদান মাসের জন্য যাকাতুল ফিতর নামাযের সিজদায়ে সাহুর সমতুল্য। যেমন, নামাযে ত্রুটি-বিচ্যুতি হলে সিজদায়ে সাহু দ্বারা এটা পূর্ণ হয়ে যায় তদ্রুপ রোযার মধ্যে ত্রুটি-বিচ্যুতি হলে সাদাকাতুল ফিতর দ্বারা এর প্রতিকার হয়। (আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু ৩/৩৭৬ ও ফিকহুয যাকাত ২/৩৯০)

ফিতরা যাদের উপর ওয়াজিব

জীবিকা নির্বাহের আবশ্যকীয় উপকরণ যেমন- বসবাসের ঘর, পরিধেয় বস্ত্র, খাদ্য দ্রব্য এবং ঘরের সরঞ্জামাদি ব্যতীত ঋণ আদায়ের পর কোনো স্বাধীন, জ্ঞানবান, প্রাপ্তবয়স্ক মুসলমান যদি সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা (প্রায় ৬১৩ গ্রাম) অথবা সাড়ে সাত তোলা সোনা (প্রায় ৮৮ গ্রাম) কিংবা এর যে কোনো একটির সমমূল্যের নগদ টাকা বা ব্যবসায়িক মাল বা অন্যান্য সম্পদের মালিক হয় তবে এ মালকে শরীআতের পরিভাষায় 'যাকাতের নিসাব' বলা হয়। এক্ষেত্রে বর্তমান হিসাবে যেহেতু স্বর্ণের মূল্য থেকে রৌপ্যের মূল্য অনেক কম সেহেতু রৌপ্যের মূল্যই ধর্তব্য হবে। যদি কারো নিকট কিছু পরিমাণ ব্যবসার মাল, নগদ টাকা, স্বর্ণ ও রৌপ্য থাকে এবং কোনোটাই পৃথকভাবে নিসাব পরিমাণ না হয় তবে এগুলোর সম্মিলিত মূল্য যদি সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্যের মূল্যের সমপরিমাণ হয় (বর্তমান বাজারমূল্যে এটি ৫০ হাজার টাকা প্রায়) তবে এতে নিসাব পূর্ণ হবে। যে ব্যক্তি উল্লিখিত পরিমাণ মালের মালিক তাকে মালিকে নিসাব বা সাহিবে-নিসাব বলা হয়। অবশ্য এ মাল ঋণমুক্ত এবং তার মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত হতে হবে। যে ব্যক্তি ঈদুল ফিতরের দিন সুবহে সাদিকের সময় এ পরিমাণ মালের মালিক থাকবে তার উপর তার নিজের পক্ষ হতে এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান-সন্ততির পক্ষ থেকে সাদাকাতুল ফিতর আদায় করা আবশ্যক হবে। পরিবারস্থ স্ত্রী, কন্যা ও

রোজগারবিহীন সাবালক সন্তানের পক্ষ থেকেও সাদাকাতুল ফিতর প্রদান করা উত্তম। তবে ওয়াজিব নয়। সাদাকাতুল ফিতর ওয়াজিব হওয়ার জন্য 'মালে নামী' তথা বর্ধনশীল মাল হওয়া শর্ত নয়। মালে নামী বলতে যে মাল শরীআতের দৃষ্টিতে বাড়তে থাকে, সেগুলো সর্বমোট চার প্রকার, সোনা, রূপা, ব্যবসার মাল ও গবাদি পশু। এগুলোকে যেহেতু শরীআত বাড়ন্ত মাল বলে আখ্যা দিয়েছে, সুতরাং এগুলো বাড়ন্ত মাল। বাস্তবে এগুলো বাড়ুক বা নাই বাড়ুক। মালে গায়রে নামী বলতে যে মাল শরীআতের দৃষ্টিতে বাড়ে না। উপরোক্ত মালে নামী ব্যতীত সবগুলোই অবাড়ন্ত। যেমন- স্থাবর সম্পত্তি এবং নিজ প্রয়োজনে খরিদকৃত গাড়ি, আসবাবপত্র ইত্যাদি। সাদাকাতুল ফিতর ওয়াজিব হওয়ার জন্য যাকাতের অনুরূপ পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হওয়াও শর্ত নয় বরং কেবল ঈদুল ফিতরের দিন সুবহে সাদিকের সময় উপরোক্ত পরিমাণ মালের মালিক থাকলেই সাদাকাতুল ফিতর ওয়াজিব হবে।

ফিতরার পরিমাণ

সাদাকাতুল ফিতর এর পরিমাণ হচ্ছে, যব, খেজুর, পনির ও কিসমিস দ্বারা আদায় করলে এক 'সা' এবং গম দ্বারা আদায় করলে অর্ধ 'সা'। বর্তমান হিসাব মতে এক 'সা' ৩ কেজি ৩০০ গ্রাম এর একটু কম এবং আধা 'সা' ১ কেজি ৬৫০ গ্রাম এর একটু কম।

হযরত আমর ইবনে শুআইব হতে বর্ণিত, তিনি তার পিতা থেকে, তার পিতা তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন,

أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا ينادي في فجاج مكة : ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم، ذكر أو أنثى، حر أو عبد، صغير أو كبير، مدان من قمح، أو سواه صاع من طعام-

-রাসূলুল্লাহ ﷺ একজন ঘোষক প্রেরণ করলেন সে যেন মক্কার পথে পথে এ ঘোষণা করে যে, জেনে রেখো! প্রত্যেক মুসলিম নর-নারী, গোলাম-স্বাধীন, ছোট-বড় প্রত্যেকের উপর সাদকায়ে ফিতর অপরিহার্য। দুই 'মুদ' (আধা সা) গম কিংবা এক 'সা' অন্য খাদ্যবস্তু। (সুনানু তিরমিযী, বাবু মা জাআ ফি সাদাকাতিল ফিতরি)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি রামাদানের শেষ দিকে বসরার মিম্বারের উপর খুতবা প্রদানকালে বলেন,

فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصدقة صاعا من تمر أو شعير، أو نصف صاع من قمح على كل حر أو مملوك، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير-

-রাসূলুল্লাহ ﷺ সাদাকাতুল ফিতর অপরিহার্য করেছেন এক 'সা' খেজুর বা যব কিংবা আধা 'সা' গম; গোলাম-স্বাধীন, নারী-পুরুষ ও ছোট-বড় প্রত্যেকের উপর। (সুনানু আবি দাউদ, বাবু মান রাওয়া নিসফা সায়িন মিন কামহিন)

উপরোক্ত খাদ্যবস্তুর পরিবর্তে সেগুলোর মূল্য আদায় করারও অবকাশ রয়েছে। সেক্ষেত্রে উল্লিখিত খাদ্যবস্তুগুলোর মধ্য থেকে যেকোনো একটির নির্ধারিত পরিমাণের বাজারমূল্য আদায়ের মাধ্যমে সাদাকাতুল ফিতর আদায় করা যাবে। মূল্যের দিক থেকে ঐ খাদ্যবস্তুগুলোর মধ্যে তফাৎ রয়েছে, কোনোটির দাম বেশি, আবার কোনোটির দাম কম। বর্তমান বাজার দর হিসাবে যেহেতু গমের দামই সবচেয়ে কম এবং নির্ধারিত পরিমাণও অন্যান্য খাদ্যবস্তুগুলোর অর্ধেক। যব, খেজুর, পনির ও কিসমিস দ্বারা আদায় করলে এক 'সা' আর গম দ্বারা আদায় করলে অর্ধ 'সা' দিতে হয়। বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে প্রতি বছর অর্ধ 'সা' গমের বাজারমূল্য হিসাবে ফিতরার সর্বনিম্ন পরিমাণ ঘোষণা করা হয়। যেহেতু সহীহ হাদীসে গমকেও ফিতরা প্রদানের খাদ্যবস্তু হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং এর পরিমাণও নির্ধারণ করা হয়েছে অর্ধ 'সা' তাই অর্ধ 'সা' গম বা তার মূল্য আদায় করলে সাদাকাতুল ফিতর আদায় হয়ে যাবে। অর্থাৎ সবচেয়ে কম দামের বস্তুর দ্বারা যদি কেউ সাদাকাতুল ফিতর আদায় করে তাহলেও আদায় হয়ে যাবে। তবে উত্তম হলো, নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী বেশি মূল্যের খাদ্যবস্তু দ্বারা সাদাকাতুল ফিতর আদায় করা। খেজুর, কিসমিস, পনির এবং যবের ক্ষেত্রে যেকোনো একটির এক 'সা' (৩ কেজি ৩০০ গ্রাম) অথবা তার বাজার মূল্য এবং গমের ক্ষেত্রে আধা 'সা' (১ কেজি ৬৫০ গ্রাম) বা তার বাজার মূল্য যেকোনো একটি আদায় করলে ফিতরা আদায় হয়ে যাবে। অবশ্য যিনি সামর্থ অনুযায়ী যত বেশি আদায় করবেন তিনি তত বেশি সাওয়াবের অধিকারী হবেন।

ইমাম আযম (র.) এর মতে, অধিক মূল্যের দ্রব্য দ্বারা ফিতরা আদায় করা উত্তম; অর্থাৎ যা দ্বারা আদায় করলে গরীবদের বেশি উপকার হয়, সেটাই উত্তম ফিতরা। ইমাম মালিক (র.) এর মতে, খেজুর দ্বারা ফিতরা আদায় করা উত্তম এবং খেজুরের মধ্যে সবচেয়ে উন্নত 'আজওয়া' খেজুর দ্বারাই আদায় করা উত্তম। ইমাম শাফিঈ (র.) এর মতে, হাদীসে উল্লিখিত বস্তুসমূহের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বোচ্চ মূল্যের দ্রব্য দ্বারা সদকা আদায় করা শ্রেয়। অন্য সব ইমামের মতও অনুরূপ। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র.) এর মতে, সাহাবায়ে কিরাম (রা.) এর অনুসরণ হিসেবে খেজুর দ্বারা ফিতরা আদায় করা উত্তম। এছাড়া সাদকার ক্ষেত্রে সব ফকীহ এর ঐকমত্য হলো, 'যা গরীবদের জন্য বেশি উপকারী।' (আল মুগনী ও আওযাযুল মাসালিক)

হাদীস শরীফে গম বা আটা, যব, কিসমিস, খেজুর ও পনির- এ পাঁচটি দ্রব্যের যেকোনো একটি দ্বারা বা তার মূল্য দ্বারা সাদকায়ে ফিতর আদায়ের সুযোগ দেওয়া হয়েছে যেন প্রত্যেকে নিজ নিজ সামর্থ্যানুযায়ী আদায় করতে পারে। তবে সবার জন্য সবচেয়ে কম দামের দ্রব্য দিয়ে ফিতরা আদায় করা অনুচিত; বরং সামর্থ্যানুসারে সবার উচিত উৎকৃষ্ট জিনিস দ্বারা আদায় করা। রাসূল ﷺ এর সময়ে সামর্থ্যানুযায়ী সবাই উত্তম পণ্য দিয়ে ফিতরা আদায় করতেন। সর্বোত্তম দাস তথা কিরূপ দাসকে মুক্ত করা সবচেয়ে উত্তম এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, **أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها**- দাতার কাছে যা সর্বোৎকৃষ্ট এবং যার মূল্যমান সবচেয়ে বেশি। (বুখারী, বাবু আইয়্যুর রিকাবি আফদালু)

ফিতরা আদায়ের ক্ষেত্রে আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক সাধারণত সর্বনিম্ন পরিমাণ অর্ধ 'সা' গম এর মূল্য হিসেবে জনপ্রতি ৭০ টাকা হারে ফিতরা আদায় করতে চান। উচ্চবৃত্ত হতে নিম্নবৃত্ত সবাই সর্বনিম্ন হার ৭০ টাকা দিয়েই দায়মুক্ত হতে চান। সবচেয়ে কম মূল্যের ফিতরা আদায় করার প্রবণতা খুব বেশি। বিষয়টি রাসূল ﷺ এর শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। বরং এটা তো নিম্ন আয়ের লোকদের জন্য মানানসই, কিন্তু আল্লাহ তাআলা যাদেরকে তাওফীক দিয়েছেন, তাদের সামর্থ্যানুযায়ী পনির, কিসমিস বা খেজুর এরূপ মূল্যবান দ্রব্য বা দ্রব্যের মূল্য দিয়ে সর্বোচ্চ মূল্যবান ফিতরা আদায় করা উচিত। সাদাকাতুল ফিতর আদায়ের ক্ষেত্রে আদায়কারীর সামর্থ্যকে বিবেচনায় রাখা বাঞ্ছনীয়। যেমন ধনীদের জন্য যে বস্তুর মূল্য সর্বোচ্চ, মধ্যবিত্তদের ক্ষেত্রে যে বস্তুর মূল্য মাঝামাঝি এবং নিম্ন মধ্যবিত্তদের ক্ষেত্রে যে বস্তুর মূল্য সর্বনিম্ন এর মূল্য দ্বারা ফিতরা আদায় করাই শ্রেয়।

চলতি বছরে ফিতরার সম্ভাব্য মূল্য

চলতি বছর ১৪৪২ হিজরী, ২০২১ সালের সাদাকাতুল ফিতর এর হার বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন ইতোমধ্যে ঘোষণা করেছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক ঘোষিত সাদাকাতুল ফিতর এর পরিমাণ নিম্নরূপ-

সর্বোৎকৃষ্ট গম বা আটা দ্বারা আদায় করলে প্রতি কেজির মূল্য ৪২ টাকা দরে ১ কেজি ৬৫০ গ্রাম এর মূল্য ৭০ টাকা।

যব দ্বারা আদায় করলে প্রতি কেজির মূল্য ৮৪ টাকা দরে ৩ কেজি ৩০০ গ্রাম এর মূল্য ২৮০ টাকা।

কিসমিস দ্বারা আদায় করলে প্রতি কেজির মূল্য ৪০০ টাকা দরে ৩ কেজি ৩০০ গ্রাম এর মূল্য ১৩২০ টাকা।

মরিয়ম খেজুর দ্বারা আদায় করলে প্রতি কেজির মূল্য ৫০০ টাকা দরে ৩ কেজি ৩০০ গ্রাম এর মূল্য ১৬৫০ টাকা।

পনির দ্বারা আদায় করলে প্রতি কেজির মূল্য ৭০০ টাকা দরে ৩ কেজি ৩০০ গ্রাম এর মূল্য ২৩১০ টাকা।

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বাজার যাচাই করলে উপরোক্ত হারের একটু তারতম্য হবে। যেমন সিলেট শহরের স্থানীয় বাজার যাচাইপূর্বক নির্ধারিত পণ্যের বাজার মূল্য বিবেচনা করে কতিপয় তারতম্য নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

সর্বোৎকৃষ্ট আজওয়া খেজুর দ্বারা আদায় করলে প্রতি কেজির মূল্য ১২০০ টাকা দরে ৩ কেজি ৩০০ গ্রাম এর মূল্য ৩৯৬০ টাকা।

পনির দ্বারা আদায় করলে প্রতি কেজির মূল্য ১০০০ টাকা দরে ৩ কেজি ৩০০ গ্রাম এর মূল্য ৩৩০০ টাকা।

মরিয়ম খেজুর দ্বারা আদায় করলে প্রতি কেজির মূল্য ৭০০ টাকা দরে ৩ কেজি ৩০০ গ্রাম এর মূল্য ২৩১০ টাকা।

সাধারণ খেজুর দ্বারা আদায় করলে প্রতি কেজির মূল্য ১৮০ টাকা দরে ৩ কেজি ৩০০ গ্রাম এর মূল্য ৬০০ টাকা।

সাদাকাতুল ফিতরের সংশ্লিষ্ট মাসাঈল

একজনের ফিতরা একজনকে বা কয়েক জনকে এবং কয়েকজনের ফিতরা একজনকে দেওয়াও জায়িয। রোযা ও ফিতরা দুটি পৃথক ইবাদাত, তাই কেউ যদি বার্ধক্য, অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণে রোযা রাখতে না পারে তবে তার থেকে সাদকাতুল ফিতর রহিত হবে না। বরং তাদের উপর ফিতরা আদায় করা ওয়াজিব। কোনো ব্যক্তি যদি ঈদের নামাযের আগে রামাদানের মধ্যে সাদকাতুল ফিতর আদায় করে দেয় তবে তা জায়িয আছে। ঈদের দিন তা পুনরায় আদায় করতে হবে না। অবশ্য ঈদের দিন সুবহে সাদিকের পর ঈদের নামায আদায়ের পূর্বে সাদকাতুল ফিতর আদায় করা মুস্তাহাব। আর যদি ঈদের নামাযের আগে আদায় করতে না পারে তবে তার সাদাকাতুল ফিতর মাফ হবে না। পরে তা আদায় করা ওয়াজিব। তবে ঈদের ২-৩ দিন পূর্বে আদায় করা উত্তম, যাতে ফিতরা গ্রহণকারীগণ এর টাকা দিয়ে কেনাকাটা করে ঈদের আনন্দে শরীক হতে পারে।

সাদাকাতুল ফিতর ওয়াজিব হওয়ার সময় হল ঈদুল ফিত্‌রের দিন সুবহে সাদিক হওয়ার পর। সুতরাং সুবহে সাদিকের পূর্বে কেউ মারা গেলে তার ফিতরা আদায় করা ওয়াজিব হবে না। সুবহে সাদিকের পূর্বে কোনো বিত্তবান লোকের সন্তান ভূমিষ্ট হলে তার ফিতরা আদায় করতে হবে। কোনো অমুসলিম ব্যক্তি সুবহে সাদিকের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করলে তবে তার উপর ফিতরা আদায় করা ওয়াজিব হবে। আর সুবহে সাদিকের পর কোনো সন্তান জন্মগ্রহণ করলে কিংবা কেউ মুসলমান হলে তার উপর ফিতরা ওয়াজিব নয়। যদি কোনো ফকীর সুবহে সাদিকের পূর্বে নিসাবের মালিক হয়ে যায় তবে তার উপরও ফিতরা আদায় করা ওয়াজিব হবে। আর যদি কোনো ধনী ব্যক্তি সুবহে সাদিকের পূর্বে গরীব হয়ে যায় তবে তার উপর সাদকাতুল ফিতর আদায় করা ওয়াজিব হবে না।

একে অন্যের ফিতরা আদায় করতে পারবেন। নিজ পরিবারভুক্ত নয় এমন লোকের পক্ষ থেকে তার অনুমতি ছাড়া ফিতরা দিলে আদায় হবে না। যে সকল সম্পদশালী ব্যক্তি তাদের খাদিম বা চাকর বাকরের পৃষ্ঠপোষকতা ও ভরণ-পোষণ করেন তারা তাদের পক্ষ থেকে ফিতরা দিতে পারবেন। স্ত্রীলোক যদি সচ্ছল হয় তবে শুধু নিজের সাদকায়ে ফিতর তার উপর ওয়াজিব। তার স্বামী, সন্তান বা মা-বাবার পক্ষ থেকে দেওয়া তার উপর ওয়াজিব নয়।

গরীব-মিসকীন যার নিকট নিসাব পরিমাণ সম্পদ নেই এমন ব্যক্তিকে সাদকায়ে ফিতর প্রদান করতে হবে। যাদের যাকাত দেওয়া যায়, তাঁদের ফিতরাও দেওয়া যায়। পিতা, মাতা ও ঊর্ধ্বতন এবং ছেলে, মেয়ে ও অধঃস্তন এবং যার ভরণপোষণের দায়িত্ব রয়েছে (যেমন স্ত্রী), তাদেরকে ওয়াজিব ফিতরা ও যাকাত প্রদান করা যায় না। শরীআতের পক্ষ থেকে ধার্যকৃত ফরয, ওয়াজিব ইত্যাদি আর্থিক ইবাদতগুলো, যেমন- যাকাত, ফিতরা ইত্যাদি বাধ্যতামূলক দানগুলো কেবল মুসলিম ফকীর, মিসকীন, ঋণী ও অসহায়দের প্রদান করা যায়; অমুসলিম কাউকে দেওয়া যায় না।

সাদকাতুল ফিতর উত্তম হলো ঈদের নামাযের আগে আদায় করে দেওয়া। কেননা রাসূল ﷺ ঈদগাহে যাওয়ার আগেই সাদাকাতুল ফিতর আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি ঈদের সালাতের আগে এটা আদায় করবে, তা সাদকাতুল ফিতর হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে। আর যে ঈদের সালাতের পর আদায় করবে তা অপরাপর (নফল) সাদকা হিসেবে গৃহীত হবে। (সুনানু আবি দাউদ, বাবু যাকাতিল ফিতরি ও সুনানু ইবনি মাজাহ, বাবু সাদাকাতিল ফিতরি)

কোনো ব্যক্তি যদি তার অপ্রাপ্ত বয়স্ক মেয়েকে অন্যত্র বিয়ে দিয়ে স্বামীর ঘরে তুলে দেয় তবে পিতার উপর তার ফিতরা আদায় করা ওয়াজিব নয়। অনুরূপভাবে কোনো ব্যক্তির উপর তার দাদা-দাদী, নানা-নানী, মাতা-পিতা, প্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে-মেয়ে ও স্ত্রীর পক্ষ থেকে ফিতরা আদায় করা ওয়াজিব নয়।

বিত্তহীন অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানের সাদকাতুল ফিতর আদায় করা ওয়ালীর উপর ওয়াজিব। এমনিভাবে প্রাপ্তবয়স্ক মতিভ্রম ও পাগল সন্তানের ফিতরা আদায় করাও ওয়ালীর উপর ওয়াজিব। প্রাপ্তবয়স্ক সন্তান এবং স্ত্রী ও পিতা-মাতার সাদকাতুল ফিতর আদায় করা ওয়ালীর উপর ওয়াজিব নয়। তবে আদায় করলে আদায় হয়ে যাবে। এক ভাইয়ের সাদকাতুল ফিতর আদায় করা অন্য ভাইয়ের উপর ওয়াজিব নয়। অনুরূপভাবে কোনো নিকট আত্মীয়ের ফিতরা আদায় করা অন্য আত্মীয়ের উপর ওয়াজিব নয়।

যার উপর সাদাকাতুল ফিতর আদায় করা ওয়াজিব ছিল সে যদি তা আদায় করার পূর্বেই মারা যায় তবে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে ফিতরা আদায় করা ওয়াজিব নয়। কিন্তু তার উত্তরসূরিরা যদি ফিতরা আদায় করে দেয় তবে আদায় হয়ে যাবে। উত্তরসূরিরা নিষেধ করলে জোরপূর্বক তাদের থেকে ফিতরা আদায় করা জায়িয হবে না। অবশ্য মৃত ব্যক্তি যদি এ ব্যাপারে ওয়ারিসদের ওসীয়ত করে গিয়ে থাকেন তবে তার মালের এক তৃতীয়াংশ হতে সাদাকাতুল ফিতর আদায় করা ওয়াজিব হবে।

ইজমা-কিয়াস ও ইজতিহাদ

মোস্তফা মনজুর

বর্তমান সময়ে কিছু লোক ইজমা ও কিয়াসকে অস্বীকার করেন। বলেন যে, কুরআন-হাদীস থাকতে এগুলোর দরকার কি? এরকম কথা শুনলে শরীআতের ন্যূনতম জ্ঞান আছে এমন লোকের রাগ হওয়ার কথা, কিন্তু আমার হাসি পায়। এদের মতো নির্বোধ সম্ভবত আর কেউ নেই। এটা আমার কথা নয়, ইবনে তাইমিয়া (র.) এর কথা। দ্বীনের উসূল ও তারিখ সম্পর্কে ন্যূনতম জ্ঞান থাকলে এমন কথা বলা যায় না।

এটা অনেকেরই বক্তব্য এতে কোনো সন্দেহ নেই। বিশেষ করে, ইসলামের দিকে নতুন করে আকৃষ্ট হওয়া বিরাট একদল তরুণের বক্তব্য এটা। আমি এতে তাদের দোষ দিচ্ছি না। বরং দোষ তো তাঁদের যারা এই ব্যাখ্যা সেসব তরুণদের কাছে উপস্থাপন করেছেন। অতএব, আজকের লেখার উদ্দেশ্য কেবল সেসব লা-মাযহাবী যারা ইজমা-কিয়াস, ইজতিহাদ অস্বীকার করেন। যারা স্বীকার করেন তাঁরা নন।

ক. আপনারা অনেকেই কুরআনিয়্যুন বা কুরআনবাদী সম্প্রদায়ের নাম শুনেছেন। (হয়তো আহলে কুরআন নামে তাদের চেনেন, আমি এ নামে তাদের অভিহিত করি না, কারণ আহলুল কুরআন আমাদের সালাফ ও খালাফ উলামাদের কুরআন ও তাফসীর গবেষক সম্প্রদায়ের অভিধা)। এরা শুধু কুরআনকেই মানতে চায়, হাদীসকে নয়। সোজা কথায় এরা হাদীসকে অস্বীকার করে। নির্দ্বিধায় এদেরকে গোমরাহ বলা যেতে পারে, এমনকি লা-মাযহাবীগণও বলেন।

অথচ প্রায় একই ধরনের কাজ লা-মাযহাবীগণও করে যাচ্ছেন। তারা ইজমা, কিয়াস ও ইজতিহাদকে অস্বীকার করছেন। অথচ নিজেরা তা প্রয়োগও করছেন। ইজতিহাদ, ইজমা-কিয়াস তো কুরআন-সুন্নাহর ন্যায় টেক্সট নয়। এগুলো হচ্ছে একটা প্রসেস। যার মাধ্যমে কুরআন-সুন্নাহকে ব্যাখ্যা করা হয়, তারপর বিভিন্ন বিধানে তা প্রয়োগ করা হয়।

খ. ইজমা অস্বীকার করার প্রসিদ্ধ দলীল হচ্ছে ২০ রাকাআত তারাবীর জামাআতকে অস্বীকার করা। সাহাবাগণের যে মুবারক জামাআত তা চালু করেছিলেন, সেটা শরঈ দলীল ইজমা হিসেবে। অথচ লা-মাযহাবীগণ কেবল হাদীসের ভিত্তিতে এটা অস্বীকার করেন। অথচ সাহাবাগণ হাদীসের উপলক্ষ্য ছিলেন, হাদীস তাঁরাই ভালো জানতেন, হাদীসের প্রয়োগে তাঁরাই ছিলেন অগ্রগামী। তাঁদের প্রদত্ত হাদীসের বিকল্প ব্যাখ্যাও আছে, প্রয়োগ ক্ষেত্রের ভিন্নতাও প্রমাণিত।

এমনকি হযরত আয়িশা (রা.) এর যে হাদীস নিয়ে তারা ৮ রাকাআতের জন্য লড়াই শুরু করেছেন, সে-ই হযরত আয়িশা (রা.) এর জীবিতাবস্থাতেই ২০ রাকাআতের জামাআত চালু হয়। অথচ তিনি কোনো প্রতিবাদ করেননি। হযরত আয়িশা (রা.) কি হাত, কথা আর অন্তর দিয়ে ঘৃণা করার হাদীস জানতেন না? কোনো সাহাবীই কি জানতেন না? তাই কি? বিদআত (তাঁদের ভাষায়) চালু হয়ে গেল, অথচ তারা নির্বিকার! এমন হওয়াও কি সম্ভব?

কতই না আশ্চর্যের বিষয়! হাদীসকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে হাদীসের শিক্ষারই বিপরীত করা সম্ভবত লা-মাযহাবীদের দ্বারাই সম্ভব। তাদের একটা মাসআলার ব্যাপারে বলি। ইমাম যখন জোরে সূরা ফাতিহা পড়েন তখন তারা কোন সময় কিরাত পড়েন এ মাসআলার সমাধান কি? ইমামের সাথে সাথে, নাকি দু'কিরাতের মধ্যে? হাদীসে কিছু কি আছে? নাকি কুরআনে আছে? প্রিয় পাঠক কোথাও নেই।

এবার তারা নিজেদের বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করে সূরা ফাতিহা পড়ে নেন। এতেও তাঁদের দ্বিমত আছে। কেন এই দ্বিমত? কারণ ইজতিহাদের পার্থক্য। তারা নিজেরা প্রয়োগ করছেন অথচ ইজতিহাদই অস্বীকার করছেন। ব্যাপারটা কেমন হয়ে গেল না?

গ. হয়তো অনেকে বলবেন, আমরা ইজতিহাদ অস্বীকার করছি না। তাহলে প্রশ্ন, আপনারা ইজতিহাদ করে কি করবেন? নতুন করে কুরআন-হাদীস বানাবেন? (নাউযুবিল্লাহ) বরং ইজতিহাদ করে তো কুরআন-সুন্নাহ ব্যাখ্যাই করবেন। তাহলে তো সেই ইজমা আর কিয়াসই হলো। ইস্তিহসান, ইস্তিদলাল, মাকাসিদ এসবের দিকে আর নাই-বা গেলাম।

ধরে নিন, রক্তদানের মাসআলার কথা। এর সমাধান কি কুরআন-হাদীসে আছে? লা-মাযহাবীগণ বড়জোর বলবেন, আছে তবে তা স্পষ্ট নয়। বরং কুরআন-সুন্নাহর মূলনীতি অনুসারে আমরা এর ফায়সালা করব। তো এ মাসআলায় কোন মূলনীতির প্রয়োগ হবে এটাই বলে দেয় ইজতিহাদ ও কিয়াস।

যেমন, এ মাসআলায় ফাতওয়া হচ্ছে, জায়িয তবে তা বিক্রি করা যাবে না। এটা বের করা হয়েছে মায়ের দুধের উপর কিয়াস করে। এখন কোনো লা-মাযহাবী ভাই কি কিয়াস বাদ দিয়ে এর কোনো সমাধান দিতে পারেন? আমি অপেক্ষায় রইলাম।

ঘ. হয়তো বলবেন, ইজমা-কিয়াস, ইজতিহাদ অস্বীকার করলে কী হলো? এটা খুব বড় কোনো ব্যাপার নয়? এমন ভেবে থাকলে আপনার উচিত শয়তানের হাত থেকে, সেক্যুলার চিন্তা-চেতনা থেকে নিজের চিকিৎসা করা। কেননা ইজমা-কিয়াস, ইজতিহাদ সবই কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত। এতে কোনো সন্দেহ নেই। আর এগুলো দ্বীনের গ্রহণযোগ্যতা ও সাবলীলতা যেমন বাড়ায়, তেমনই নানা মাসআলার দ্বীনী সমাধানের পথ খুলে দেয়। সর্বোপরি শরীআত প্রণেতার উদ্দেশ্যের আলোকে কুরআন-সুন্নাহ বুঝার ব্যাপারে এগুলোই সবচেয়ে কার্যকর মাধ্যম।

মনে রাখবেন, ইজমা-কিয়াস অস্বীকার করে আপনি ইসলামকে টিকিয়ে রাখতে পারবেন না। লা-মাযহাবীগণ তো কেবল গুটিকতেক মাসআলা নিয়েই ব্যস্ত। দুনিয়ার আর কোনো কিছুতেই তাদের মাথাব্যথা নেই। সেক্যুলার, সন্দেহবাদী, অন্য ধর্মের আগ্রাসন কিছুই নয়। ইজমা-কিয়াস বাদ দিয়ে কত সময় আপনি ইসলামকে ব্যাখ্যা করতে পারবেন?

তাছাড়া ইজমা-কিয়াস, ইজতিহাদ অস্বীকার করে আপনি প্রকারান্তরে বহু হাদীসকেই অস্বীকার করছেন। যেসব হাদীসে সাহাবাদের অনুসরণ, তাঁদের ইজতিহাদের কথা এসেছে সেগুলোর কোনো জবাব কি দিতে পারবেন?

কিংবা কিয়ামত পর্যন্ত ইসলামী শরীআহ জারী থাকার যে দাবি আমরা-আপনারা করি তার কি কোনো হিসাব মিলাতে পারবেন? বর্তমান সময়ের যেসব মাসআলা আসছে সেগুলোর ফাতওয়া কি কুরআন-সুন্নাহ অনুসারে ইজমা-কিয়াস, ইজতিহাদ বাদ দিয়েই দিতে পারবেন? বড় কথা, তারা কি একজন

সালাফেরও উক্তি দেখাতে পারবেন যেখানে ইজমা-কিয়াস ও ইজতিহাদ অস্বীকার করার কথা বলা হয়েছে? নিশ্চিতভাবেই পারবেন না। জানি না তাঁদের নিকট ইসলামের সংজ্ঞা কী। আমার মনে হয়, ইসলামের সংজ্ঞায়নেই তাঁদের সাথে আমাদের পার্থক্য। ইসলাম কেবল গুটিকতেক মাসআলারই নাম, আর কিছু তাঁদের কল্পনাতেও সম্ভবত আসে না।

ঙ. একটা ভুল ধারণা আমাদের মধ্যে আছে। অনেকে বলেন, আমরা তো যারা ইজমা-কিয়াস অস্বীকার করে তাদের থেকে ফাতওয়া নিই না। এটাও নিতান্ত দুর্বল কথা। কেননা এখানে ব্যক্তি উদ্দেশ্য নয়। লা-মাযহাবীগণ যদি ইজমা-কিয়াস অস্বীকার করেন তাহলে ইসলামকে বিজয়ী করা তো দূরের কথা, দাঁড়ই করাতে পারবেন না। এমন ব্যক্তির দ্বীনের বুঝই তো অসম্পূর্ণ। তাঁর থেকে ফাতওয়া নেওয়া বা না নেওয়ায় কিছুই আসে যায় না। বরং তার নিকট থেকে কোনো কথাই নেওয়া উচিত নয়। কারণ সে ইসলামকেই বুঝতে পারেনি, সালাফদের ব্যাখ্যা অনুসরণ করেনি। বরং সে তো কেবল নিজের বুদ্ধিতে নিজের মতো করে ইসলামকে মানছে; যা ইসলামের পথ নয়।

বস্তুত এটাও এক প্রকারের আভিধানিক ইজতিহাদ; এতে ভুল হলে সাওয়াবের আশা নেই। বরং ঠিক হলেও গুনাহ হওয়ার সম্ভাবনা। কারণ ইজতিহাদের যোগ্যতা ব্যতিরেকে এমন করা নিষিদ্ধ। একটি হাদীস উল্লেখ করছি, "যে ব্যক্তি কুরআন সম্পর্কে জেনে বলল, সে যেন জাহান্নামে নিজের স্থানকে নির্দিষ্ট করে নেয়।" (তিরমিযী, বাবু মা জাআ ফিল্লাযি ইয়ুফাসসিরুল কুরআনা বিরাইহি)

এমন লা-মাযহাবীদের স্ববিরোধিতা আশ্চর্যজনক। ইজমা-কিয়াস অস্বীকার প্রকারান্তরে সাহাবাদের জ্ঞানের ও তাকওয়ার ব্যাপারেই প্রশ্ন তোলা। তাঁদের ব্যাখ্যার উপর নিজের ব্যাখ্যাকে প্রাধান্য দেওয়া। অথচ তারাই দাবি করেন যে, তারা কেবল সাহাবা নয়, সালাফদের পর্যন্ত অনুসরণ করেন। কি সুন্দর স্ববিরোধিতা!

কুরআনিয়্যুনগণ যেমন যে কারণে বিপজ্জনক, এমন (ইজমা-কিয়াস অস্বীকারকারী) লা-মাযহাবীগণও একই কারণে বিপজ্জনক। এদের নিকট থেকে পরহেয করা নিজেদের ঈমান-আমল বাঁচানোর জন্যই আবশ্যক। আল্লাহু আ'লাম।

মো. আনোয়ার হোসেন
প্রোপ্রাইটর

Al Arab Tailors

আল আরব টেইলার্স
পাঞ্জাবী স্পেশালিস্ট

১১৮, করিম উল্লাহ মার্কেট (নিচ তলা) 01734-346601
বন্দর বাজার, সিলেট

সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.)

উপমহাদেশের ইসলামী চেতনার বাতিঘর

মারজান আহমদ চৌধুরী

উপমহাদেশে ইসলাম

ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামের প্রথম আগমন ঘটেছিল ৮ম শতাব্দীর একেবারে শুরুর দিকে। উমাইয়া শাসনামলে সেনাপতি মুহাম্মদ ইবনে কাসিমের হাত ধরে ইসলামের বিজয় মশাল সাগরপাড়ের সিন্ধু ভূমিতে এক ঝলক আলো ফেলেছিল। কিন্তু প্রথম আগমনটি স্থায়ী হতে পারেনি। পাহাড়ি জলধারার মতো দ্রুতবেগে এসে, সেটি আবার মিলিয়ে গিয়েছিল সময়ের প্রতিকূল স্রোতে। তবে ক্ষণিকের এ আলোড়ন পরবর্তীদের স্থায়ী আগমনের পথকে সুগম করে দিয়েছিল। ইরান আফগানিস্তানের পাহাড় মাড়িয়ে, কখনো আবার ভারত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে উপমহাদেশের মাটিতে পা রেখেছিলেন মহান সব সূফী শায়খ ও মুসলিম ব্যবসায়ীগণ। তাদের দ্বীনদারী, একনিষ্ঠ পরিশ্রম ও উত্তম চরিত্র হিন্দুস্তানের পৌত্তলিক-গৌড়ে কালিমা তায়্যিবার ধ্বনিকে বজ্রকণ্ঠে

প্রতিধ্বনিত করেছিল। এ উপমহাদেশের মুসলমানদের মুসলিম সত্তার আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে প্রখ্যাত সব ওলী-আউলিয়ার নাম। সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী বলেছেন, "ভারতবর্ষে যত মানুষ ইসলাম গ্রহণ করবে ও ইসলামের ওপর চলবে, তার একটি সাওয়াব খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী (র.) এর আমলনামায় যাবে।"

ত্রয়োদশ শতাব্দীর সূচনালগ্নে সুলতান মুহাম্মদ ঘুরীর হাত ধরে উপমহাদেশের বুকে দ্বিতীয়বার ইসলামী শক্তির আগমন ঘটেছিল। সেবার আর পাহাড়ি জলধারা নয়; বহমান নদীর মতো স্থায়ীভাবে হিন্দুস্তানের মাটিতে পদচিহ্ন ফেলেছিল মুসলমানরা। তবে শক্তিশালী মামলুক, খিলজি, সায়্যিদ, মোঘল প্রমুখ মুসলিম রাজবংশ এ মাটিতে শাসন করলেও ইসলাম প্রচারে তাদের ভূমিকা খুবই নগণ্য। সে কাজটি তখনও সূফী শায়খরাই করে গেছেন।

তাজদীদের পথ পরিক্রমা

প্রথমদিকের মুত্তাকী সূফী শায়খরা দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার পর ধীরে ধীরে তাসাউফের নামে অনেক বাতিল আকীদা এসে উপমহাদেশের মুসলমানদের ভেতর প্রবেশ করেছিল। একইসাথে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে শুরু হয়েছিল দ্বীনকে ধ্বংস করার এক অভিনব ষড়যন্ত্র। 'দ্বীনে ইলাহি' নামক এক কুফরি আকীদা প্রচার করা হচ্ছিল খোদ মোঘল সম্রাট আকবর ও জাহাঙ্গীরের রাজদরবার থেকে। আল্লাহ তখন তার প্রিয় বান্দা ইমাম আহমদ সিরহিন্দী (র.) (১৫৬৪-১৬২৪) এর মাধ্যমে উভয় দিক থেকে সমাগত ষড়যন্ত্র থেকে তার দ্বীনের পবিত্রতাকে রক্ষা করেছিলেন। ইমাম সিরহিন্দী একদিকে তাসাওউফের নামে প্রবিষ্ট বাতিল আকীদাকে দফারফা করে তাসাওউফকে সুন্নাতের সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর ফিরিয়ে এনেছিলেন। অপরদিকে তার ইলমি ও তাজদীদি কর্মসূচি 'দ্বীনে ইলাহী' নামক কুফরি মতবাদকে দুনিয়া থেকে চিরতরে বিদায় করে দিয়েছিল।

আজ অবধি তিনি মুসলমানদের কাছে মুজাদ্দিদে আলফে সানী বা হিজরী দ্বিতীয় সহস্রাব্দের সংস্কারক হিসেবে অমর হয়ে আছেন।

ইমাম সিরহিন্দীর সমসাময়িক ছিলেন প্রখ্যাত মুহাদ্দিস শায়খ আবদুল হক দেহলভী (র.)। ইমাম সিরহিন্দী যখন কুফরের কালিমা ঝেড়ে ইসলামকে এবং বিদআত সরিয়ে সুন্নাতকে পুনর্জীবিত করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছিলেন, শায়খ আবদুল হক তখন উপমহাদেশের উর্বর মাটিতে হাদীসে নববী ﷺ এর বীজ বপন করছিলেন। ইমাম সিরহিন্দীর তাজদীদ (সংস্কার) ও শায়খ আবদুল হকের ইলমি খিদমাত পরবর্তী শতাব্দীতে এসে এক বিন্দুতে মিলিত হয়েছিল। সিন্ধুসদৃশ সেই বিন্দুর নাম ইমামুল হিন্দ শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (র.) (১৭০৩-১৭৬২)।

উপমহাদেশ তো বটেই, সেই যুগে পুরো মুসলিম দুনিয়ায় শাহ ওয়ালিউল্লাহ'র তুলনার বহুবিদ্যাজ্ঞ (Polymath) দ্বিতীয়জন ছিলেন না। খ্যাতিমান আলিমে দ্বীন ও দার্শনিক ড. ইসরার আহমদ বলেছেন, "ইমাম গাযালী (র.) ও ইমাম ইবনু তাইমিয়াকে একত্রিত করে যে ব্যক্তিত্ব তৈরি হতে পারে, আমার নিকট শাহ ওয়ালিউল্লাহ (র.) তার চেয়েও বড়। সাহাবায়ে কিরামের পর মুসলিম দুনিয়ায় এরকম বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী দ্বিতীয়জন আসেননি।" সামনে এগুনোর পূর্বে উপমহাদেশের এ সর্বশ্রেষ্ঠ মুজাদ্দিদকে সংক্ষিপ্তভাবে পরিচয় করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন মনে করছি।

শাহ ওয়ালিউল্লাহ (র.) এর প্রধান কৃতিত্ব ছিল, তিনি ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে আল্লাহর কিতাব ব্যাপকভাবে প্রচার ও প্রসার করেছিলেন। তিনি সর্বপ্রথম পবিত্র কুরআনের ফার্সি অনুবাদ করে কালামে ইলাহিকে জনসাধারণের উপলব্ধির দ্বারপ্রান্তে নিয়ে আসেন। পরবর্তীতে তার পুত্রদের দ্বারা কৃত উর্দু অনুবাদ উপমহাদেশের কোণায় কোণায় কুরআনের দাওয়াত ছড়িয়ে দিয়েছিল। একইসাথে তিনি শায়খ আবদুল হক দেহলভী (র.) এর হাতে প্রোথিত ইলমে হাদীসের বীজকে সযত্নে লালন করে সুবিশাল মহীরুহে পরিণত করেছিলেন। মুয়াত্তা ও মিশকাতের মতো বিশ্বখ্যাত হাদীসের কিতাবের ব্যাখ্যা রচনা করার মাধ্যমে উপমহাদেশে ইলমুল হাদীস অধ্যয়নকে তিনি স্থায়িত্ব এনে দিয়েছিলেন। শাহ ওয়ালিউল্লাহ (র.) তুলনামূলক ফিকহের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছিলেন। তিনি হানাফি ও শাফিঈ মাযহাবের মধ্যকার দূরত্বকে সুশৃঙ্খলভাবে নিরসনের প্রচেষ্টা চালিয়েছেন এবং মুজতাহিদ ইমামদের মতপার্থক্যের কারণসমূহ ব্যাখ্যা করেছেন। যুগের প্রয়োজনে ইমামদের উসূলের ওপর ভিত্তি করে ইজতিহাদের তথা গবেষণার রুদ্ধ দরজাকে তিনি পুনরায় উন্মুক্ত করেছেন।

শাহ ওয়ালিউল্লাহ (র.) বুঝতে পেরেছিলেন যে, ইসলাম প্রতিষ্ঠা ও বাতিলের মুকাবিলা করার জন্য জ্ঞানভিত্তিক প্রজ্ঞাপূর্ণ ঈমানের বিকল্প নেই। এজন্য তিনি তার লেখনিতে ঈমানের শাখা-প্রশাখা এবং ইসলামী শরীআতের হিকমত (Purpose And Objectives) খুলে খুলে বর্ণনা করেছেন। তার 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ' এমন এক অদ্বিতীয় রচনা, যার উদাহরণ পুরো ইসলামের ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাসাওউফের জগতেও শাহ ওয়ালিউল্লাহ এক বিস্ময়কর নাম। পিতার কাছেই তিনি তাসাউফের দীক্ষা পেয়েছিলেন। তাসাউফের তাত্ত্বিক জটিলতাকে তিনি সহজবোধ্য করেছেন, মুসলিম মননে আল্লাহর মারিফাতের নীর সিঞ্চন করেছেন, আত্মিক পরিশুদ্ধতাকে মুসলিম পরিচয় গঠনের পাথেয় বানিয়ে হাজির করেছেন। সর্বোপরি ইমাম গাযালী ও ইমাম আহমদ সিরহিন্দীর পথ ধরে কুরআন-সুন্নাহ'র আলোকে তাসাওউফকে দ্বীনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে উপস্থাপন করার সমুদয় কৃতিত্ব শাহ ওয়ালিউল্লাহ (র.) এর, অন্তত উপমহাদেশের বুকে। এছাড়াও

তিনি একটি তথা 'সমন্বিত মুসলিম মানস' (Comprehensive Muslim Mindset) গঠন করার লক্ষ্যে ইসলামের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক দিকসমূহ সূচারুরূপে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। কালের গহ্বরে হারিয়ে যাওয়া ইসলামী খিলাফতের স্বপ্নকে যুগের উপযোগী সংস্করণে পুনরায় হাজির করে শাহ ওয়ালিউল্লাহ (র.) পরবর্তীদের জন্য দ্বীনী খিদমতের পথকে সুগম করে গেছেন।

বালাকোট যুদ্ধের ভূমিকায় শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (র.) এর কৃতিত্ব

আলোচনা করার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, বালাকোট থেকে শুরু করে আজকের যুগ পর্যন্ত এ উপমহাদেশে প্রকৃতপক্ষে ইসলামের যত খিদমাত হয়েছে, সবই শাহ ওয়ালিউল্লাহ (র.) এর সাদাকাহ জারিয়াহ। বালাকোটের মহাবীর, ইসলামী আন্দোলনের সিপাহসালার, আমীরুল মুমিনীন সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরেলভী (র.) সরাসরি শাহ ওয়ালিউল্লাহ (র.) এর রূহানী সন্তান বললে অত্যুক্তি হবে না। সায়্যিদ আহমদ (র.) কখনও 'আমীরুল মুমিনীন' হতে পারতেন না, যদি তার পেছনে ইমামুল হিন্দ শাহ ওয়ালিউল্লাহ (র.) এর ইলমি ও তাজদীদি খিদমাতের ভর না থাকত।

নব উদ্যমের সূচনা

শাহ ওয়ালিউল্লাহ (র.) এর সন্তানরা একনিষ্ঠভাবে পিতার খিদমাত সামনে এগিয়ে নিয়ে চলছিলেন। একই সময় ভারতের বিভিন্ন কোণায় মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছিল ইসলাম-বিধ্বংসী সর্পকুল। সম্রাট জাহাঙ্গীরের অনুমতি নিয়ে বহু আগে থেকে উপমহাদেশের সমুদ্রতটে ব্যবসা করছিল ইংরেজ বেনিয়ারা। কিন্তু কেবল ব্যবসার নিয়ত কখনও তাদের ছিল না। তাদের চোখ ছিল ভারতের সিংহাসনে। সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর থেকে ক্ষয়িষ্ণু মোঘল রাজদরবার চলছিল এক প্রকার দান-দক্ষিণা নিয়ে। ইংরেজদের বাড়ন্ত শক্তিকে মুকাবিলা করার সামর্থ মোঘলদের ছিল না। ওদিকে মহারাষ্ট্রের কট্টরপন্থী হিন্দু রাজা ছত্রপতি শিবাজী মুসলমানদের হাত থেকে ভারতের ক্ষমতা দখল করার চেষ্টায় বহুবার ব্যর্থ হয়েছিল। তার বংশধররাও মোঘলদের ক্ষয়িষ্ণু শক্তিবলয়ে বারবার আঘাত হানছিল। এমনকি আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময়ে মারাঠা সেনাপতি সদাশিব রাও-এর বিশাল বাহিনী ক্ষণিকের জন্য দিল্লী দখল করে ফেলেছিল। ভারতের কোনো মুসলিম রাজা বা নবাবের শক্তি ছিল না মারাঠাদেরকে আটকানোর। তখন শাহ ওয়ালিউল্লাহ পত্র লিখে আফগান শাসক আহমদ শাহ আবদালিকে ভারত আক্রমণ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। ১৭৬১ সালে পানিপথের ৩য় যুদ্ধে আবদালির মুসলিম বাহিনীর হাতে মারাঠা বাহিনী পরাজিত না হলে তখনই ভারতের বুকে মুসলমানদের গণকবর রচিত হয়ে যেত। এছাড়াও উত্তর-পশ্চিম ভারতের পাঞ্জাব ছিল শিখদের হাতে, যারা ছিল কট্টর মুসলিম-বিদ্বেষী এবং মারাঠাদের সহায়ক। ত্রিমুখী শত্রুর সামনে দাঁড়িয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করাতো দুরের কথা; ভারতের মাটিতে মুসলমানদের অস্তিত্ব রক্ষা করাও বড় হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ঠিক এরকম একটি টালমাটাল সময়ে, ১৮০৬ সালে উত্তর প্রদেশের রায় বেরেলি থেকে দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে দিল্লীতে পা রাখেন এক সাহসী তরুণ। ২০ বছর বয়সী সে তরুণের নাম ছিল সায়্যিদ আহমদ (র.)। পিতার নাম সায়্যিদ ইরফান। রায় বেরেলিতে প্রাথমিক দ্বীনি শিক্ষা অর্জন করার পর ইলমে মারিফাত অর্জনের তৃষ্ণা মেটাতে সায়্যিদ আহমদ (র.) বেছে নিয়েছিলেন ইমামুল হিন্দ শাহ ওয়ালিউল্লাহ (র.) এর আঙ্গিনা। দিল্লীতে এসে তিনি বায়আত করেন শাহ ওয়ালিউল্লাহ (র.) এর বড় পুত্র ও খলীফা শাহ আবদুল আযীয দেহলভী (র.) এর হাতে। পাঁচ বছর দিল্লীতে অবস্থানকালে ইমামুল হিন্দ ও তার সন্তানদের বিপ্লবী ও প্রজ্ঞাপূর্ণ চিন্তাধারা সায়্যিদ আহমদ (র.)কে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছিল। এক দিকে মুসলমানদের অস্তিত্ব রক্ষা, আরেকদিকে সমাজে ছড়িয়ে থাকা শিরক-বিদআতকে অপনোদন করে ইসলামী খিলাফত প্রতিষ্ঠা করার তীব্র স্পৃহা জেগেছিল ২৫ বছর বয়সী এ মুজাদ্দিদে যামানের মনে।

প্রস্তুতিমূলক কর্মসূচি

আলতাফ কাদির তার Sayyid Ahmad Barailvi গ্রন্থে লিখেছেন, দীর্ঘ সাত বছর সায়্যিদ আহমদ (র.) আমির খান নামক এক যোদ্ধার সাথে বিভিন্ন অভিযানে যোগদান করেন। সাত বছর পর সায়্যিদ আহমদ বুঝতে পারেন তিনি ভুল মানুষের সাথে পথ চলছেন। আমির খানের একমাত্র উদ্দেশ্য বিভিন্ন জায়গায় হামলা করে সম্পদ আহরণ করা এবং নিজেকে নবাবদের কাতারে শামিল করা। ওদিকে মারাঠা সাম্রাজ্য ততদিনে বুঝতে পেরেছিল যে, ভারতের ক্ষমতা দখল করার পথে মুসলমানরা তাদের বাধা নয়; বাধা বাড়ন্ত ইংরেজ বেনিয়া শক্তি। ফলাফলস্বরূপ মুসলমানদের পিছু ছেড়ে মারাঠারা একের পর এক ইংরেজ কোম্পানির সাথে যুদ্ধে জড়াচ্ছিল। ১৮১৮ সালে ৩য় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বিজয়ী হয়। আমির খান তখন ইংরেজদের সাথে এক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে নবাব খেতাব পাওয়ার স্বাদ পূর্ণ করে। প্রসঙ্গত, বেশিরভাগ মুসলিম নবাবদের মূল লক্ষ্যই ছিল ইংরেজদেরকে খুশি করা।

আমির খানের সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করে সায়্যিদ আহমদ (র.) মনোনিবেশ করেন ভারতের মুসলিম সমাজের দিকে। কারণ মারাঠাদেরকে ঘায়েল করে ইংরেজরা তখন ভারতের সবচেয়ে বড় শক্তি। হাতে যেটুকু শক্তি আছে, তা নিয়ে ইংরেজ কোম্পানির মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। প্রস্তুতি ও লোকবল বৃদ্ধির আশায় মুসলিম সমাজে হাত দিয়ে সায়্যিদ আহমদ (র.) প্রচণ্ড হতাশ হন। তিনি উপলব্ধি করেন, বেশিরভাগ মুসলমান কেবল নামেই মুসলমান। ইসলামের মূল শিক্ষা ভুলে এরা ডুবে আছে নিজেদের বানানো রসম-রেওয়াজের মধ্যে। বারবারা যেটক্যাঙ্ক তার Islamic revival in British India গ্রন্থে লিখেছেন, সে সময়টি ছিল সায়্যিদ আহমদের জন্য পরিপক্কতা অর্জনের সময়। অর্থাৎ তিনি অমুসলিমদের সাথে জিহাদের পণ করে মাঠে নামলেও এটি খেয়াল করেননি যে, তার ঘরেই হাজার সমস্যা।

ইতিহাসবিদ অলিভিয়ার রয় লিখেছেন, সায়্যিদ আহমদ (র.) তখন মুসলিম সমাজে প্রচলিত শিরক-বিদআতের অপনোদনে মনোনিবেশ করেন। তিনি এ আন্দোলনের নাম দেন 'তরিকায়ে মুহাম্মাদিয়া'। দুনিয়ালোভী মৌলভীদের কাছে না গিয়ে সাধারণ জনগণের দ্বারে দ্বারে তিনি ইসলামের মূল শিক্ষা পৌঁছে দিতে শুরু করেন। এর ফল আসে আশার চেয়েও বেশি। সাধারণ মুসলমানরা দলে দলে তার দিকে হাত বাড়ায়। সায়্যিদ আহমদ (র.) উপমহাদেশের মুসলমানদের অঘোষিত আমির হয়ে দাঁড়ান।

তার এ আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তা ইংরেজদের মাথায় চিন্তার ভাঁজ ফেলে দিয়েছিল। ফলাফলস্বরূপ তারা তাকে 'ওয়াহাবি' বলে আখ্যায়িত করতে iরু করে। সুচতুর ইংরেজরা বুঝতে পেরেছিল, এই খেতাব সায়্যিদ আহমদের উত্তাল ঢেউকে থামিয়ে দেবে। কিন্তু তাদের সে কূটকৌশল সফল হয়নি। বারবারা যেটক্যাঙ্ক লিখেছেন, সায়্যিদ আহমদ (র.) তিনটি জিনিসকে ইসলামের বিশুদ্ধ আকীদার সাথে সাংঘর্ষিক মনে করতেন। একটি হচ্ছে সূফীবাদের নামে ভ্রান্ত মতবাদ, আরেকটি শিয়াদের ভ্রান্ত আকীদা, আরেকটি হিন্দুদের রসম-রেওয়াজ। শিয়া ও ভ্রান্ত সূফীদের বিরুদ্ধে লাগাতার তিন বছর তিনি হাজার হাজার মুরিদীনসহ উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানে দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনা করেছিলেন।

১৮২১ সালে সায়্যিদ আহমদ (র.) হজ্জ করতে যান। দুই বছর পর ফিরে এসে তিনি আবার দ্বীন কায়িমের স্বপ্নে মাঠে নেমে পড়েন। মারাঠা শক্তি তখন হিসাবের ভেতরেই ছিল না। অপরদিকে ইংরেজরা ছিল ধারণার চেয়েও বড় শক্তি। সায়্যিদ আহমদ (র.) তৎকালীন ভারতের অভ্যন্তরে যুদ্ধ পরিচালনার কেন্দ্র স্থাপন করেননি। এটি তার রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতার পরিচায়ক। তিনি

তাঁর কৌশলকে খানিকটা পরিবর্তন করে পাঞ্জাবকে তার লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণ করেন। কারণ ভৌগলিক দিক থেকে হিসাব করলে, পশ্চিমে মরক্কো থেকে শুরু হয়ে মুসলিম বিশ্বের মানচিত্র পূর্বদিকে একেবারে আফগানিস্তান পর্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে ছেয়ে আছে। এরপর পূর্বদিকে এগুলে সামনে পড়ে এক বিশাল বাধা, বৃহত্তর পাঞ্জাব। কিছু সীমান্ত এলাকা ব্যতীত পুরো পাঞ্জাবে তখন শিখদের আধিপত্য ছিল। এরপর আবার শুরু হয় মুসলমানদের আবাসভূমি (বর্তমান পাকিস্তান ও ভারতের উত্তর-পশ্চিম দিক)। এ দিক থেকে চিন্তা করে সায়্যিদ আহমদ (র.) পাঞ্জাব বিজয়ের স্বপ্ন দেখেন। তার উদ্দেশ্য ছিল, পাঞ্জাব বিজয় করতে পারলে একদিকে যেমন ভারতের মুসলমানরা মুসলিম বিশ্বের সাথে অবিচ্ছিন্নভাবে সংযুক্ত হয়ে যাবে, অপরদিকে পাঞ্জাবকে দুর্গ বানিয়ে পূর্বদিক (বাঙাল এলাকা) থেকে ধেয়ে আসা ইংরেজ শক্তির মুকাবিলা করাও সম্ভব হবে। নির্দ্বিধায় বলা যায়, পরিকল্পনাটি যুগোপযোগী ছিল।

ইসলামী খিলাফত প্রতিষ্ঠা

আলতাফ কাদির লিখেছেন, সায়্যিদ আহমদ (র.) আট হাজার মুজাহিদ সঙ্গে নিয়ে পাঞ্জাবের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। তবে তিনি সরাসরি পাঞ্জাব যাননি। বর্তমান ভারত ও পাকিস্তান পুরোটা ঘুরে লোকবল সংগ্রহ এবং জিহাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য প্রচার করে করে তিনি আফগানিস্তানে পৌঁছান। কান্দাহার, কাবুল অতিক্রম করে নওশহরে অবস্থান গ্রহণ করেন। সেখানে শিখ রাজা বুখ্য সিং-এর বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নেন। সে যুদ্ধ জয়ের মধ্য দিয়ে মুসলমানদের সাহস, আগ্রহ-উদ্দীপনা শতগুণে বেড়ে যায়। ১৮২৬ সালে তিনি পাখতুন জাতিগোষ্ঠীর বাসস্থান পেশাওয়ারে পৌঁছান। পাখতুনদের নেতৃত্ব ছিল পাঠানদের হাতে। সায়্যিদ আহমদ (র.) সেখানে গিয়েই ইসলামী অনুশাসন বাস্তবায়ন করেন। পাঠানদেরকে সরিয়ে তার সাথে আগত আলিমদের হাতে তিনি নেতৃত্ব তুলে দেন। এরপর পাঞ্জাবের রাজা রনজিত সিং-এর কাছে পত্র পাঠান। পত্রে লেখা ছিল- হয় ইসলাম কবূল করো, নয় জিযিয়া দাও, নয় তো যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও।

রাজনৈতিক দিক থেকে বিবেচনা করলে, এ পদক্ষেপ সঠিক ছিল বলে অনুমিত হয় না। সীমান্ত এলাকার মানুষ যে ইসলামী অনুশাসনে অভ্যস্ত নয় এ বিষয়টি হয়তো তিনি বিবেচনায় আনেননি। বংশ পরম্পরায় মুসলমান হলেও এদের কাছে ইসলাম ছিল নিজেদের বানানো কিছু রসম-রেওয়াজ। তিনি উত্তর-পশ্চিম ভারতে যেভাবে দাওয়াতি কার্যক্রম চালিয়েছিলেন, পেশাওয়ারেও সেরকম কার্যক্রম চালালে অবস্থা ভিন্ন হতে পারতো। সেটি না করেই তিনি তাদেরকে ইসলামী অনুশাসন মানতে বাধ্য করেছেন, যা তাঁর জন্য হিতে বিপরীত হয়েছে। তাছাড়া সীমান্ত অঞ্চলের ক্ষমতাধর পাঠানরা তাদের ক্ষমতা বেদখল হওয়া মেনে নিতে পারেনি। তাই এদের পক্ষ থেকে বারবার বিদ্রোহ করা হয়েছে। এতে সায়্যিদ আহমদের সময় ও শক্তি দুটিই নষ্ট হয়েছে।

১৮৩০ সাল পর্যন্ত সায়্যিদ আহমদ (র.) পুরো পেশাওয়ারের নিয়ন্ত্রণ নিতে সক্ষম হয়েছিলেন। তখন মুসলমানরা তাকে 'আমীরুল মুমিনীন' খেতাবে ভূষিত করে। তবে পাঠানদের বিরোধিতাকে তিনি কাবু করতে পারেননি। সেই বছর পাখতুনদের অতর্কিত হামলায় সায়্যিদ আহমদের বাহিনীতে বিপুল পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়। বাধ্য হয়ে বরফঢাকা শীতকালে তিনি পেশাওয়ার ত্যাগ করে কাশ্মীরের দিকে পা বাড়ান। কিন্তু কাশ্মীরে তিনি পৌঁছাতে পারেননি।

বালাকোট যুদ্ধ

১৮৩১ সালের ৬ই মে জুমুআর দিন সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.) এর সৈন্যরা শিখ রাজা রনজিত সিং-এর পুত্র শের সিং-এর নেতৃত্বাধীন দশ হাজার সৈন্যের বিশাল বাহিনীর মুখোমুখি হয়। ততদিনে সায়্যিদ আহমদের হাতে বাকি ছিল মাত্র ছয় থেকে সাতশ সৈন্য। যৎসামান্য এ রসদ নিয়ে তিনি কাশ্মীরের মানসেহরা জেলার পাহাড়ঘেরা বালাকোট প্রান্তরে যুদ্ধ শুরু করেন। স্থানীয় মুসলমানরা বিশ্বাসঘাতকতা করে শিখদেরকে সেখানে নিয়ে গিয়েছিল। যেসব সামন্ত ও পাঠানরা শিখদের অত্যাচার থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সায়্যিদ আহমদ (র.)কে আহ্বান করেছিল, তারাই পরবর্তীতে মুসলমানদেরকে সাহায্য না করে গোপনে শিখদের সাথে হাত মিলিয়েছিল। দুই ঘণ্টা স্থায়ী বালাকোটের সে যুদ্ধ ছিল কারবালা যুদ্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়। মুসলিম বাহিনী চূড়ান্ত বীরত্বের পরিচয় দিয়ে ছোট ছোট দল বানিয়ে শিখদের আক্রমণ করতে থাকে। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের এক পর্যায়ে শিখদের অতর্কিত আক্রমণে শাহাদাত বরণ করেন আমীরুল মুমিনীন সায়্যিদ আহমদ (র.)। মেটিকোট ঝর্ণার পাশে পড়ে থাকা তার দেহটি প্রথমে কারও নজরে আসেনি। সৈন্যরা তার খুঁজে সবটুকু শক্তি নিয়ে তখনও লড়াই করে যাচ্ছিল। এক পর্যায়ে শিখদের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে কিছু স্থানীয় মুসলমান কৌশলে সায়্যিদ আহমদের সৈন্যদেরকে পাহাড়ের চূড়ায় উঠে আসার আহ্বান জানায়। দিশেহারা সৈন্যরা সেনাপতির খুঁজে পাহাড়ের চূড়ায় উঠামাত্র আগে থেকে সেখানে লুকিয়া থাকা শিখ সৈন্যরা তাদের ওপর মুহুর্মুহু আক্রমণ চালায়। এতেই মুসলিম বাহিনী পরাজয় বরণ করতে হয়। ভারতের উত্তর-পশ্চিমের অর্দ্ধ-প্রদেশ থেকে মর্দান পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকাজুড়ে ইসলামী খিলাফত প্রতিষ্ঠা করা এক বীর মুজাহিদ যেন অভিমান নিয়েই চলে যান মালিক-মাওলার স্মরণে।

মাত্র ৪৫ বছরের জীবনে সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.) যে তুলনাহীন কাজ সম্পন্ন করে দেখিয়েছেন, তার প্রভাব কল্পনার চেয়েও সুদূরপ্রসারী। সায়্যিদ আহমদ (র.) এর তাজদীদ, তাঁর জিহাদ, তাঁর তরীকায়ে মুহাম্মদিয়া যুগ যুগ ধরে উপমহাদেশের মুসলিম সমাজে ইসলামের প্রচার-প্রসার, শিরক-বিদআতের অপসারণ ও আত্মশুদ্ধির মূল অনুপ্রেরণা হয়ে আসছে। সায়্যিদ আহমদ (র.) এর প্রধান দুই খলীফা হযরত মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (র.) ও হযরত মাওলানা নূর মুহাম্মদ নিযামপুরী (র.) এর সিলসিলাহ বৃহত্তর বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম এলাকায় ইংরেজদের প্রতিরোধ, স্বাধীনতা আন্দোলন, ইসলাম প্রচার, হিন্দুয়ানি রসম-রেওয়াজ অপসারণ, মুসলমানদের আত্মশুদ্ধি, ইলমে দ্বীন চর্চা, বাতিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদসহ সর্বোপরি ইসলামের যে পরিমাণ খিদমাত আঞ্জাম দিয়েছে, অন্যরা কেউ এর সিকিভাগও করতে পারেননি। এক্ষেত্রে মাওলানা কারামত আলী (র.) এর নামটি সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। ১৮৩১ সালে বালাকোট যুদ্ধে সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.) শাহাদাতবরণ করলেও তাঁর আদর্শ মরেনি, তাঁর চেতনা লুপ্ত হয়নি। বরং সেদিন থেকে আজ অবধি এ উপমহাদেশের বুকে যতগুলো ইসলামী আন্দোলন হয়েছে, হচ্ছে আর হবে, সবগুলোই মহান বালাকোট আন্দোলনের প্রতিধ্বনি। সহস্রাব্দের ঘুনে ধরা মুসলিম সমাজে ইসলামী দাওয়াত, খিলাফত, জিহাদ ইত্যাদি শব্দগুলোকে নতুন করে চিনিয়েছেন সায়্যিদ আহমদ (র.)। ক্ষণিকের জন্য হলেও দ্বীন কায়িমের স্বপ্নকে সার্থক করেছেন সায়্যিদ আহমদ (র.)। আল্লাহর জন্য শাহাদাতের অর্থ কী- সেটি দেখিয়েছেন সায়্যিদ আহমদ (র.)। এ উপমহাদেশের মুসলমানদের জন্য ইসলামী চেতনার বাতিঘর হয়ে আছেন হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.)।

সূফী নূর মুহাম্মাদ নিজামপুরী (র.): জীবন ও অবদান

মাসুক আহমেদ

সূফী নূর মুহাম্মাদ নিজামপুরী (র.) উনিশ শতকের প্রভাবশালী সূফীদের মধ্যে অগ্রগণ্য। তিনি উপমহাদেশে স্বাধীনতা আন্দোলনের বীর মুজাহিদ সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.) এর অন্যতম খলীফা ছিলেন। নূর মুহাম্মাদ নিজামপুরী বালাকোট যুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করেন এবং গাজীয়ে বালাকোট উপাধি লাভ করেন।[১]

বংশ পরিচয়

ইতিহাসবিদদের মতে তাঁর পূর্বপুরুষ ছিলেন ইরানী সূফীবংশোদ্ভূত। কালক্রমে তাঁরা আফগানিস্তানের গজনীতে সুলতান হন। গজনীর সুলতান বখতিয়ার কুতুব আলমের তিনি সপ্তম উত্তরপুরুষ। কারো কারো মতে, নূর মুহাম্মাদ নিজামপুরীর সঙ্গে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.) এঁর বংশধর খালিদ বিন আবদুল্লাহর যোগসূত্র আছে। উমাইয়া শাসনকালে জনাব আবদুল্লাহ ৬৬৪ সালে কাবুলের শাসনকর্তা ছিলেন। আবার কারো মতে, তিনি ইরানের সূফীকবি আবু মুহাম্মাদ মুসলেহ উদ্দীন বিন আবদিল্লাহ শিরাজীর (শেখ সাদী) বংশধর।[২] আনওয়ারুন নাইয়্যিরাইন গ্রন্থের বর্ণনা মতে, শাহ সূফী নূর মুহাম্মাদ নিজামপুরী (র.) এর পূর্বপুরুষগণ গজনীর অধিবাসী ছিলেন। গজনী থেকে বাংলাদেশে আগমনের বহুল প্রচলিত ইতিহাস রয়েছে তা নিম্নরূপ-

বখতিয়ার নামে গজনীর বাদশাহর একজন ছেলে ছিল। বাদশাহ তাকে কুতুবে আলম নামে ডাকতেন। বাল্যকালেই বখতিয়ার পিতৃহারা হন। মৃত্যুকালে তার পিতা তাকে তার এক মামার রক্ষণাবেক্ষণে রেখে যান এবং সমস্ত রাজত্ব ও ধন-দৌলত তাকে দিয়ে ওসীয়াত করেন; যদি ছেলে বড় হয়, তাহলে সমস্ত রাজত্ব ও ধন-দৌলত ছেলেকে সমর্পণ করবে। বখতিয়ার বড় হবার পর তার পিতৃসম্পত্তি মামার নিকট দাবি করলে তিনি তা দিতে অস্বীকার করেন। বরং তার উপর বিভিন্ন জুলুম, অত্যাচার করে তাকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেয়। বখতিয়ার নিরুপায় হয়ে নিজপুত্র ফিরোজ শাহ ও কন্যা মায়মুনা খাতুন এবং কতেক সম্ভ্রান্ত লোককে সঙ্গে নিয়ে দেশ ত্যাগ করেন এবং দিল্লীর বাদশাহর নিকট উপস্থিত হন। দিল্লীর বাদশাহ রাজপুত্র হিসেবে বখতিয়ারকে খুব সম্মান করলেন। ফলে বখতিয়ারের ভাগ্য আলোকিত হয়ে গেল। বাদশাহ তার অপরিসীম বুদ্ধিমত্তায় মুগ্ধ হয়ে তাকে গৌড় নামক স্থানের বাদশাহী প্রদান করেন।

বখতিয়ার দীর্ঘ দিন নিজ দায়িত্বে বহাল থেকে যোগ্যতা ও দক্ষতার পরিচয় দেন। তার যোগ্যতা, দক্ষতা, কর্মপটুতা ও কর্তব্যপরায়ণতা স্থানীয় লোকদের ঈর্ষার কারণ হয়। বাদশাহকে এই বলে প্ররোচিত করল, তাকে যদি দেশ থেকে বহিষ্কার করা না হয়, তাহলে সে একসময় দিল্লীর বাদশাহীর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারে। তাই স্থানীয় লোকজন ও বাদশাহ তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে। ফলে তিনি দিল্লীতে বসবাস করা কিংবা স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করা কোনোটাই উচিত নয় বলে মনে করে সুদূর নোয়াখালী জেলার দান্দিরা নামক স্থানে চলে আসেন। এখানে বখতিয়ারের বংশধর খ্যাতি অর্জন করে। ফিরোজ শাহ তার বোন মায়মুনা খাতুনকে সেনাপতি শুজা খাঁ এর সাথে বিবাহ দেন। ফলে মায়মুনাকে কেন্দ্র করে তাদের বংশ বিস্তার লাভ করে। মায়মুনা খাতুনের গর্ভে মিয়া মল্লিক জন্মগ্রহণ করেন। মিয়া মল্লিকের ঘরে ইবরাহীম জন্মগ্রহণ করেন। ইবরাহীমের ঘরে শেখ মুবারক ও শেখ বদ্দুহ জন্মগ্রহণ করেন। শেখ বদ্দুহ থেকে শেখ আমানুল্লাহ এবং শেখ আমানুল্লাহ থেকে শেখ নাসের মুহাম্মদ জন্মগ্রহণ করেন। তার ঘরে জন্মগ্রহণ করেন শেখ মুহাম্মদ ফানাহ (র.)। তিনিই শাহ সূফী নূর মুহাম্মাদ নিজামপুরী (র.) এর শ্রদ্ধেয় পিতা।

জন্ম

সূফী নূর মুহাম্মাদ নিজামপুরীর জন্মসন ও জন্মস্থান নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভিন্নতা দেখা যায়। অধিকাংশের মতে তিনি ১৭৯০ খ্রিষ্টাব্দে নোয়াখালী জেলার দান্দিরা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।[৩]

শিক্ষাজীবন

তাঁর পিতা শেখ মুহাম্মাদ ফানাহ কুরআন ও হাদীস বিশারদ আলিমে দ্বীন ছিলেন। তাঁর কাছেই তিনি প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। এরপর নোয়াখালী জেলার বাহমনী এলাকার বিশিষ্ট আলিম ও বুযুর্গ আজিমপুর দায়রা শরীফের সূফী দায়েমের খলীফা শেখ জাহিদের তত্ত্বাবধানে শিক্ষা লাভ করেন। এরপর উচ্চ শিক্ষালাভের জন্য তিনি ঐতিহাসিক কলকাতা আলীয়া মাদরাসা গমন করেন। সেখান থেকে কুরআন, হাদীস, তাফসীর, ফিকহ, দর্শন ইত্যাদি বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। নূর মুহাম্মাদ আজমী তাঁর গ্রন্থে সূফী নূর মুহাম্মাদ নিজামপুরীকে চট্টগ্রামের মুহাদ্দিসীনে কিরামের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেন। কারো কারো মতে আলিয়া মাদরাসায় অধ্যয়ন সমাপ্তের পর তাঁকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করে মাদরাসা কর্তৃপক্ষ।[৪]

তাসাওউফের তালীম

মাদরাসায় অধ্যয়নের পর তিনি আজিমপুর দায়রা শরীফের গদিনশিন সূফী সায়্যিদ লাক্বীত উল্লাহ (র.) এর কাছে নকশবন্দিয়্যাহ মুজাদ্দিদিয়াহ তরীকায় বায়আত গ্রহণ করে সূফী খেতাব লাভ করেন।[৫] এরপর হযরত নবী করীম ﷺ কর্তৃক স্বপ্নে আদিষ্ট হয়ে কলকাতায় গিয়ে সায়্যিদ আহমাদ শহীদ বেরলভী (র.) এর কাছে কাদিরিয়া, চিশতিয়া, নকশবন্দিয়্যাহ-মুজাদ্দিদিয়া, মুহাম্মাদিয়া তরীকায় বায়আত গ্রহণ করেন।[৬] আইনায়ে ওয়াইসী গ্রন্থের ১০২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে, একদা সায়্যিদ আহমদ শহীদ তিনমাস কলকাতায় অবস্থান করেন। এ সময় তাঁর প্রভাবে হাজার হাজার মুসলমান সঠিক পথ প্রাপ্ত হয়। সিলেট, চট্টগ্রাম এর দূর দূরান্ত থেকেও অনেক মুসলমান আসে এবং তাঁর নিকট বায়আত গ্রহণ করে সত্যিকার ও ধার্মিক মুসলমান হয়। সায়্যিদ মুহাম্মদ আলী স্বীয় গ্রন্থ মাখযানে আহমদী গ্রন্থে লিখেছেন, প্রত্যেক এলাকা ও অঞ্চল থেকে অগণিত মুসলমান তাঁর নিকট উপস্থিত হন। শিরক-বিদআতে লিপ্ত মুসলমানগণ এবং নাফরমান ও পাপীগণ নিজেদের খারাপ কর্ম থেকে তাওবা করে খাঁটি মুমিনের দলভুক্ত হয়। সে সময় চট্টগ্রাম জেলার উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে মীরসরাই থানার অন্তর্গত মালিয়াইশ (মিঠানালা) গ্রামের জনৈক আলিম মাওলানা সূফী নূর মুহাম্মাদ

নিজামপুরীকে স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পক্ষ থেকে সুসংবাদ দেওয়া হয় যে, আমার আওলাদ সায়্যিদ আহমদ এসেছে, তুমি গিয়ে তাঁর হাতে বায়আত করো। অতঃপর সূফী নূর মুহাম্মাদ তাড়াতাড়ি কলকাতা আসলেন এবং নবী করীম ﷺ এর সুসংবাদ অনুসারে আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদ আহমদ বেরলভী (র.) এর নিকট বায়আত গ্রহণ করেন।

সায়্যিদ আহমদ শহীদ (র.) এর সুহবত

স্বপ্নে আদিষ্ট হয়ে বায়আত গ্রহণ করার পর ১৮২১-১৮৩১ এই দশ বছরের দীর্ঘ সময় তিনি মুরশিদের সরাসরি সুহবতে ছিলেন। ১৮২১ খ্রিষ্টাব্দের ৩০ জুলাই, ১২৩৬ হিজরী সনের ২০ শাওয়াল ৪৩০ জন সঙ্গীসহ সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.) কলকাতা থেকে হজব্রত পালনের উদ্দেশ্যে বায়তুল্লাহ শরীফ রওয়ানা হন। পথিমধ্যে আরো ৭০০ জন এই মুবারক কাফেলায় যুক্ত হয়। সূফী নূর মুহাম্মদ নিজামপুরী এই হজ্জের সফরে অন্যতম প্রধান সঙ্গী হিসেবে গমন করেন। জিহাদের সফরে সায়্যিদ আহমদ শহীদ (র.) তাবুর সন্নিকটেই নূর মুহাম্মাদ নিজামপুরী (র.) এর কামরা থাকত।[৭]

খিলাফত, দ্বীন প্রচার ও ফায়য প্রদানের নির্দেশ

বায়আত গ্রহণের পরেই তিনি পীরের নির্দেশে রিয়াযতে নিমগ্ন হন। সায়্যিদ আহমদ শহীদ (র.) এর তালীম তাওয়াজ্জুহের ফলে দ্রুত তিনি কামালতের উচ্চ পর্যায়ে পৌছান এবং খিলাফত লাভ করেন। পীর ও মুরশিদ কর্তৃক তিনি দ্বীন ও তরীকা প্রচার এবং সালিকদের মধ্যে ফায়য প্রদানের নির্দেশ প্রাপ্ত হন। তিনি ও তাঁর পীরভাইদের একান্ত প্রচেষ্টায় সায়্যিদ আহমদ শহীদ (র.) এর কাফেলায় অসংখ্য সালিকের সমাবেশ ঘটতে থাকে তাঁরা সায়্যিদ আহমদ শহীদ (র.) এর কাছে বায়আত হয়ে সুন্নাতে নববীর অনুসরণের প্রতি তৎপর হয়ে ওঠে। এমনকি এসময় প্রতিদিন ৫০ থেকে ১০০ জন বিধর্মী মুসলমান হতো। মাখযানে আহমদীর লেখক বলেন, ঐ সময় জনসমাজে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, (দেখলে) তুমি বলতে এ যেন নবীর যুগ পুনর্জীবন লাভ করেছে।[৮]

জিহাদের বায়আত ও অবদান

তরীকতের বায়আতের পাশাপাশি সূফী নূর মুহাম্মদ তাঁর পীর মুরশিদ সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.) এর কাছে জিহাদেরও বায়আত গ্রহণ করেন। ১৮২৬ -১৮৩১ পর্যন্ত প্রায় ১৮টি ন্যায়সঙ্গত যুদ্ধে তিনি সক্রিয় অংশগ্রহণ ও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। যেমন- আকুড়ার যুদ্ধ, নওশাহের যুদ্ধ, পাঞ্জতারের যুদ্ধ, মায়দার যুদ্ধ, শায়দুর যুদ্ধ, হাজারার যুদ্ধ, মাইয়ার যুদ্ধ ও ঐতিহাসিক বালাকোট যুদ্ধ। এছাড়া ফুলেড়া অভিযান, পেশোয়ার অভিযান ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। মায়দার যুদ্ধে শত্রুপক্ষ কামানের গোলা ছুড়তে শুরু করলে টিকে থাকা কঠিন হয়ে পড়ে তখন সূফী নূর মুহাম্মাদ নিজামপুরী (র.) হাকীকতে মাকামে সাইফুল্লাহর ফায়য প্রয়োগ করেন ফলে নিজেদের সৈন্য রক্ষা ও শত্রুপক্ষকে ঘায়েল করার প্রথম পদক্ষেপ সফল হয়। এমনকি তিনি তাঁর নিজ হাত মুবারক দিয়ে কামানের গোলা হস্তগত করে অকার্যকর করে দেন। এর ফলশ্রুতিতে মুজাহিদ বাহিনী জয়লাভ করে। বিপুল পরিমাণ অস্ত্র, কামান, গোলা, বারুদ ইত্যাদি হস্তগত হয়।[৯]

১৮৩০ খ্রিষ্টাব্দে মাইয়ার যুদ্ধে ফজলুর রহমান বর্ধমানী শহীদ হন এবং মাওলানা আব্দুল হাকীম বাঙ্গালী ও সূফী নূর মুহাম্মাদ নিজামপুরী (র.) প্রমুখ জখমী হন। নওশাহের যুদ্ধে সূফী নূর মুহাম্মাদ নিজামপুরী অন্যতম সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেন। প্রতিপক্ষের সহস্রাব্দিক সৈন্যের মুকাবিলা করেন। অসীম বীরত্ব ও সঠিক নেতৃত্ব সর্বোপরি আল্লাহ তাআলার গায়বী মদদে মুসলমানগণ উক্ত যুদ্ধে জয়লাভ করেন। এ সকল জিহাদে নূর মুহাম্মাদ নিজামপুরী বিশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন, যুদ্ধের পূর্বে তিনি একটা রুমাল ঘুরিয়ে সেনাবাহিনীর চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করতেন এবং শত্রুপক্ষের তীর, বর্শা ইত্যাদি বিসমিল্লাহ বলে হাত দিয়ে ধরে ফেলতেন। অগণিত তীর, বর্শা ও বল্লমের আঘাতে তাঁর একহাত অবশেষে অবশ হয়ে যায় তবুও তিনি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেন নি। রণজিৎ সিং এর বাহিনীর সাথে এক যুদ্ধের প্রাক্কালে রণজিতের প্রাসাদের অদূরে আমীরুল মুমিনীন সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.) তাঁর মুজাহিদ বাহিনী নিয়ে তাঁবু খাটান। নামাযের সময় হলে তিনি ঘোষণা দেন, 'আজ ঐ ব্যক্তি আযান দিবেন যার (দীর্ঘ সময় উল্লেখপূর্বক) আসরের সুন্নাত নামায ছুটে যায়নি' সেদিন সূফী নূর মুহাম্মদ নিজামপুরী আযান দেন। কথিত আছে, তাঁর আযানের সাথে সাথে রণজিত সিং এর রাজমুকুট খসে পড়ে এবং ঝড় শুরু হয়।[১০]

বালাকোট যুদ্ধে অবদান

১২৪৬ হিজরীর ২৪ জিলকদ জুমুআ বার মুতাবিক ৬মে ১৮৩১ ইং সালে ঐতিহাসিক বালাকোট প্রান্তরে ইতিহাসখ্যাত বালাকোট যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে সূফী নূর মুহাম্মাদ নিজামপুরী অনবদ্য ভূমিকা রাখেন। এ যুদ্ধে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৩০০ জন এবং শিখদের সংখ্যা ছিল ২০ হাজার। অপর্যাপ্ত রসদ ও প্রায় অস্ত্রবিহীন তিনশত মুসলিম মুজাহিদ বাহিনী বীরবিক্রমে যুদ্ধ করে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ২০ হাজার শিখ সৈন্যকে বালাকোট প্রান্তর থেকে প্রায় ছয় মাইল দূরে হটিয়ে দেয়। কিন্তু কিছু পাঠানের বিশ্বাসঘাতকতায় অতর্কিত হামলায় মুজাহিদ বাহিনী বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। এক পর্যায়ে মুজাহিদে আযম সায়্যিদ আহমদ বেরলভী, শাহ ইসমাইল ও সায়্যিদ ওয়ারেস আলী প্রমুখ শাহাদাতের পেয়ালা পান করেন। এমন সঙ্কটকালে সূফী নূর মুহাম্মাদ নিজামপুরী সেনাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং তাঁর ইমানদীপ্ত ভাষণে মুজাহিদ বাহিনীর মনোবল ফিরে আসে। অতঃপর দুর্নিবার গতিতে যুদ্ধ চলতে থাকে নূর মুহাম্মাদ নিজামপুরী একাই প্রায় দুই হাজার শিখকে হতাহত করেন। তাঁর মুবারক হাঁটুতে একটি গুলি বিদ্ধ হয়ে বের হয়ে যায় কিন্তু তাঁর কোন অনুভূতিই ছিল না, হাঁটু দিয়ে যখন অজস্র ধারায় রক্ত প্রবাহিত হতে লাগল এবং সেই পবিত্র রক্তের ধারায় কাপড় ভিজে গেল তখন তিনি অনুভব করতে পারলেন। এভাবে অবিরাম যুদ্ধ করার কারণে ও অনাহারে থাকার কারণে ক্রমশ দুর্বল হতে থাকেন। তারপরেও তিনি ময়দান ছেড়ে যাননি। এক পর্যায়ে সারা শরীরে জখম ও রক্ত প্রবাহিত হতে থাকলে তিনি তরবারি ছেড়ে দিয়ে কবিতার পংক্তিতে আল্লাহ তাআলার দরবারে ফরিয়াদ করেন, "বরছুরম আমদওলে বিছিয়ার জোদ আজমন গুনদাসত, দৌলাত তেজী কেমীন গৌইয়ান্দ শমশির তাবুয়াদ।" অর্থাৎ 'হে আমার রব! আমার মাথার উপর অনেক তীর তরবারি এসে পড়েছে কিন্তু তাতে আমার কোনো খবরই ছিল না বরং তরবারি আমাকে ঐশী প্রেরণা দেয় যুদ্ধ চালিয়ে যেতে। কিন্তু আমি যে হীন দুর্বল হয়ে পড়েছি। আর যুদ্ধ করতে পারছি না।'[১১] বালাকোট যুদ্ধে এই বীরত্বপূর্ণ অবদানের জন্য তিনি 'গাজীয়ে বালাকোট' খেতাব প্রাপ্ত হন।

বালাকোট পরবর্তী জীবন

বালাকোট যুদ্ধের পর সূফী নূর মুহাম্মাদ কিছুকাল কলকাতায় অবস্থান করেন। একদা সূফী নূর মুহাম্মাদ গোলাম রহমান মসজিদে জামাআতের সহিত ইশার নামায পড়ার জন্য উপস্থিত হন। তখন ইংরেজ সরকারের একদল সিপাহী মসজিদটির চার পাশ ঘিরে ফেলে। পরিস্থিতি অনুধাবন করতে কারো অসুবিধা হলো না। সিপাহীরা অপেক্ষা করতে লাগল সূফী সাহেব নামায পড়ে বের হলেই গ্রেফতার করবে। অন্যান্য মুসল্লীগণ নামায শেষ করে স্ব স্ব গন্তব্যে ফিরে গেলেন।

কেবলমাত্র সূফী নূর মুহাম্মাদ মসজিদের ভিতর আল্লাহর যিকরে মগ্ন। সিপাহীগণ ভাবল, তিনি আর কতক্ষণ মসজিদে থাকতে পারবেন, রাত্রি শেষে বাধ্য হয়েই তাকে বের হতে হবে এ ভেবে মসজিদ অবরোধ করে রাখল। তিনি যেন পালাতে না পারেন সেদিকে বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রাখা হলো। কিন্তু স্বয়ং আল্লাহ যাঁর নেগাহবান, তাঁর অনিষ্ট সাধন করা কি মানুষের সাধ্য? ভোর হওয়ার পর সিপাহীরা সূফী সাহেবকে ডাকতে লাগল, মসজিদের ভিতর তন্ন তন্ন করে সন্ধান করা হলো কিন্তু তাঁর নাম গন্ধও পাওয়া গেল না। মহান আল্লাহ পাকের অপার করুণা ও অসীম কুদরতে সূফী নূর মুহাম্মাদ অলৌকিকভাবে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। এক বর্ণনায় পাওয়া যায়, ইংরেজ সিপাহীরা যখন উক্ত মসজিদ ঘেরাও করে রেখেছিল ঠিক একই সময়ে আসামের মুসলমানরা সূফী নূর মুহাম্মাদকে আসামে দেখতে পায়। এ সংবাদ জানতে পেরে ইংরেজ সরকার আরো বিচলিত হয়ে পড়ে। উক্ত ঘটনার কিছুদিন পর ইংরেজরা সংবাদ পেল যে, সূফী নূর মুহাম্মাদ গোলাম রহমান মসজিদের পার্শবর্তী একটি লঙ্গরখানায় অবস্থান করছেন। সংবাদ পাওয়া মাত্র কলিকাতা সিটি পুলিশের একটি বাহিনী অতর্কিতে সে লঙ্গরখানায় উপস্থিত হয় তাঁকে গ্রেপ্তার করার জন্য। কিন্তু এবারও তিনি অলৌকিকভাবে রক্ষা পান। ইংরেজদের চক্রান্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এবার ইংরেজ সরকার আরেকটি কৌশল অবলম্বন করে। ইংরেজ সরকার সূফী নূর মুহাম্মাদ নিজামপুরীর দৈনন্দিন কাজ-কর্মের রিপোর্ট করার জন্য কিছু গুপ্তচর নিয়োগ করে। কিন্তু আল্লাহ পাকের মহিমা গুপ্তচররা সূফী সাহেবের সান্নিধ্যে এসে তাঁর অলৌকিক ক্ষমতা দেখে আত্মসমর্পণ করে এবং মুসলমান হয়ে যায়। এভাবে ইংরেজ সরকার একের পর এক কৌশল গ্রহণ করে। কিন্তু তাদের সকল চেষ্টা ও চক্রান্ত ব্যর্থ হয়। এবার সূফী নূর মুহাম্মাদ কে হত্যা করার জন্য জনৈক দুষ্কৃতিকারীকে নিয়োগ করে। কিন্তু সে দুষ্কৃতিকারীও সূফী সাহেবের কারামত দর্শনে সূফী সাহেবের নিকট আত্মসমর্পণ করে এবং মুসলমান হয়ে যায়।[১২]

এরপর তিনি ফিরে এসে নিজামপুর পরগনার মলিয়াইশে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেন। এবং বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে তাঁর পীর মুর্শিদের প্রতিষ্ঠিত তরীকা-ই-মুহাম্মদীয়ার বার্তা প্রচারে নিজেকে নিয়োজিত করেন। দ্রুততম সময়ে যদিও মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা সহজসাধ্য ছিল না, তাই লোকজনের মনোযোগ আকর্ষণ এবং ইসলাম ধর্মের মৌলিক নীতি বিষয়ে লোকজনকে প্রশিক্ষণ দিতে তিনি তাঁর মসজিদ সংলগ্ন একটি খানকা প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর বক্তব্য শুনতে এবং নিজেদেরকে তরীকায়ে মুহাম্মদিয়ার বিধি অনুযায়ী সজ্জিত করতে এই খানকায় বিপুল সংখ্যক লোক একত্রিত হতো। তিনি মুজাররাদ (চিরকুমার) ছিলেন।[১৩]

সিলসিলাহ পরিচিতি ও অবদান

বাংলা অঞ্চলে সায়্যিদ আহমদ শহীদ (র.) এর দুইজন বিশিষ্ট খলীফা মাওলানা শাহ কারামত আলী জৌনপুরী (র.) ও সূফী নূর মুহাম্মাদ নিজামপুরী (র.) এর সিলসিলাহের মাধ্যমে বিকাশ লাভ করে। উক্ত দুই মুবারক সিলসিলাহ'র মাধ্যমে দ্বীনের প্রচার প্রসারে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জিত হয়। বিশাল সংখ্যক মানুষের ইসলাম গ্রহণ, ইসলামী তাহযীব, তামাদ্দুন ও সুন্নাতের ব্যাপক প্রচলন এবং অসংখ্য মসজিদ, মাদরাসা, খানকা, ইয়াতীমখানা, হিফযখানা, কিতাবখানাসহ বিভিন্ন দ্বীনী ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করে এই সিলসিলাহদ্বয় দ্বীন ও দেশের কল্যাণে অসামান্য অবদান রাখে।[১৪]

খলীফা

সূফী নূর মুহাম্মদ নিজামপুরী (র.) এর খলীফাদের মধ্যে সূফী ফতেহ আলী ওয়াইসি বর্ধমানী (র.) ছিলেন প্রধান। তিনি কামালিয়াতের উচ্চ পর্যায়ের অধিকারী ছিলেন। তাঁর পিতা সায়্যিদ ওয়ারেস আলী বালাকোট যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। তিনি রুহানীভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর অহরহ যিয়ারত পেতেন বিধায় তাঁকে 'রাসূলে নুমা' বলা হয়। তিনি উচ্চ পর্যায়ের আশিকে রাসূল ছিলেন। তরীকতের ইমামগণের কাছ থেকে তিনি রূহানী তালীম তারবিয়াতপ্রাপ্ত হয়েছিলেন বিধায় তাঁকে ওয়াইসী বলা হয়। 'দিওয়ানে ওয়াইসী' তাঁর ফারসি ভাষায় লিখিত ইশকে রাসূল ﷺ এর অমর কাব্যগ্রন্থ। তাঁর ৩৯ জন বিশিষ্ট খলীফা ছিলেন। এর মধ্যে ফুরফুরা শরীফের মুজাদ্দীদে জামান শাহ আবূ বকর সিদ্দিকী (র.) ছিলেন প্রধান খলীফা। তাঁর মাধ্যমে ফুরফুরা সিলসিলাহ বিকাশ লাভ করে। মুসলমানদের পশ্চাৎপদতার সময় তিনি ৮০০ ওল্ড স্কিম ও নিউ স্কিম মাদরাসা ও ১১০০ মসজিদ সহ বহু খানকা, সামাজিক ও দ্বীনী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। শিক্ষা, সমাজ সংস্কার ও উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে তিনি অনন্য ভূমিকা পালন করেন। বাংলা ভাষায় ইসলাম চর্চায় কিতাব রচনা ও সংবাদপত্রের পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁর অগ্রণী ভূমিকা রয়েছে। তাঁর অন্যতম প্রধান খলীফা মাওলানা রুহুল আমীন বশীরহাটি (র.) একাই প্রায় ১৩৮টি কিতাব রচনা করেন। মুজাদ্দীদে যামানের আরেক বিশিষ্ট খলীফা সূফী ছদর উদ্দীন আহমদ শহীদ (র.) তাসাওউফের উপর ১৮টি কিতাব রচনা করেন। খলীফাদের মধ্যে পীর প্রফেসর আব্দুল খালেক (র.) পাকিস্তানের সংবিধানে শরীআর আইন বাস্তবায়নের জন্য গঠিত 'তা'লীমাতে ইসলামিয়া' বোর্ডের সদস্য ছিলেন। প্রফেসর আব্দুল খালেক (র.) তাঁর পীরের নির্দেশে বাংলা ভাষায় সর্ববৃহৎ ও সর্বাধিক তথ্যবহুল সিরাতগ্রন্থ 'সায়্যিদুল মুরসালীন' এর রচয়িতা। মুজাদ্দীদে জামান (র.) এর অন্যতম প্রধান ও বিশিষ্ট খলীফা সূফী নিসার উদ্দীন আহমদ (র.), যিনি ছারছিনা সিলসিলাহ'র প্রতিষ্ঠাতা। সূফী নিসার উদ্দীন (র.) বাংলাদেশের অন্যতম প্রাচীন কামিল মাদরাসা 'ছারছিনা দারুচ্ছুন্নাত কামিল মাদরাসা' প্রতিষ্ঠাসহ বহু মসজিদ, মাদরাসা, খানকা, ইয়াতীমখানা প্রতিষ্ঠা, কিতাব ও সংবাদপত্র প্রকাশসহ বহুমাত্রিক খিদমত করেন। মুজাদ্দীদে যামানের খলীফাদের মধ্যে বহুভাষাবিদ জ্ঞানতাপস ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, সোনাকান্দার আব্দুর রহমান হানাফী, যশোরের সূফী তোয়াজুদ্দীন, মাওলানা হাতেম আলী বাগদাদী (র.) প্রমুখের মাধ্যমেও বহু খিদমত সাধিত হয়। যা এখনও তাঁদের খলীফা ও উত্তরসূরিদের মাধ্যমে জারী আছে।[১৫]

সূফী নূর মুহাম্মাদ নিজামপুরী (র.) এর অন্যান্য খলীফাদের মধ্যে চট্টগ্রামের শাহ আহমদুল্লাহ (র.) খান বাহাদুর হামীদুল্লাহ খান (র.), মাওলানা আকরাম আলী নিজামপুরী (র.) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।[১৬]

বিশিষ্ট জনের মূল্যায়ন

১। ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ তাঁর 'বাংলাদেশে খ্যাতিমান আরবীবীদ (১৮০১- ১৯৭১)' গ্রন্থে ২৩ জন বিশিষ্ট আলিমের নাম উল্লেখ করেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম সূফী নূর মুহাম্মদ নিজামপুরী (র.)।

২। প্রখ্যাত আলিম আল্লামা নূর মুহাম্মাদ আজমী (র.) তাঁর মিশকাত শরীফের বঙ্গানুবাদের ১ম খণ্ড ২য় অধ্যায়ে 'বঙ্গে ইলমে হাদীস' সম্পর্কিত আলোচনায় সূফী নূর মুহাম্মাদ নিজামপুরী (র.) কে চট্টগ্রামের মুহাদ্দিসীনে কিরামের মধ্যে তালিকাভুক্ত করেন।

৩। প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ও ইসলামী গবেষক সায়্যিদ আবুল হাসান নদভী (র.) তাঁর রচিত 'কারাওয়ানে ঈমান ও আজীমত' গ্রন্থে বলেন, সূফী নূর মুহাম্মাদ নিজামপুরী (র.) ছিলেন বাংলা অঞ্চলে সায়্যিদ আহমদ বেরলভী (র.) এর প্রধান খলীফাদের একজন।[১৭]

উপসংহার

বাংলার এই অঞ্চলে মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (র.) এর পাশাপাশি সূফী নূর মুহাম্মাদ নিজামপুরী (র.) এবং তাঁর খলীফাগণ নিজেদেরকে তরীকা তথা তরীকায়ে মুহাম্মাদীয়ার প্রচার ও প্রচারণায় গভীরভাবে নিয়োজিত করেন। এছাড়া মাওলানা ওলিয়ত আলী ও এনায়েত আলী রাজশাহী ও মালদায়, মাওলানা ইমাম উদ্দিন চট্টগ্রামের সন্দ্বীপ ও নোয়াখালীতে এবং মাওলানা আবদুল্লাহ ঢাকায় এই আন্দোলনকে ছড়িয়ে দেন। সূফী নূর মুহাম্মাদ জিহাদ থেকে চট্টগ্রামের নিজামপুর পরগনার মলিয়াইশ গ্রামে ফিরে এসে আসাম, কুমিল্লা ও চট্টগ্রামে তাঁর পীর সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.) এর আধ্যাত্মবাদ প্রচার করেন। সায়্যিদ আহমদ (র.) এর একনিষ্ঠ অনুসারী হিসেবে তাঁর অন্তর্গত গুণ, পবিত্র চরিত্র, অদম্য সাহস সূফী নূর মুহাম্মাদ নিজামপুরীকে তাঁর ইন্তিকালের আগ পর্যন্ত তরীকায়ে মুহাম্মাদিয়া প্রচারে নিয়োজিত রেখেছিল। ইতিহাসবিদ গোলাম রাসূল মেহের বলেন, সূফী নূর মুহাম্মাদ নিজামপুরী (র.) অত্যান্ত নিষ্ঠাবান, রিয়ামুক্ত, দ্বীনদার ও পরহেজগার বুযুর্গ ছিলেন। ইসলামী বিশ্বকোষের ১৪ খণ্ডে উল্লেখ আছে, 'তিনি ছিলেন উঁচু মাপের আলিম ও মুহাদ্দিস। ছিলেন সমকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কামিল বুযুর্গ।' সূফী নূর মুহাম্মাদ নিজামপুরী (র.) এর পবিত্র জীবন যেন আসহাবে সুফফার নূরে জ্যোতির্ময়। তাঁর জীবনালেখ্য আমাদের সাহাবা কিরামের সেই জীবনাচারকেই যেন পুনর্পাঠ করায়। এই মহান মুহাদ্দিস ও বীর মুজাহিদ ১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দের ১ নভেম্বর, ১৩ কার্তিক ১২৬৬ বঙ্গাব্দ, ১২৭৫ হিজরীর রবীউল আউয়াল মাসের ২৪ তারিখ সোমবারে ইহধাম ত্যাগ করেন। চট্টগ্রামের মিরসরাইতে তাঁর প্রতিষ্ঠিত মসজিদের পাশেই তিনি শায়িত আছেন।

তথ্যসূত্র

১. ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, ইসলাম প্রসঙ্গ, মাওলা ব্রাদার্স, ২য় মুদ্রণ, ২০০০, পৃ. ১০১, Shabnam Begum, Bengal's Contribution to Islamic Studies During The 18th Century, PhD. Thesis, Aligarh Muslim University, 1994, P.7

২. মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ মিয়া, সীরাতে সূফী নূর মোহাম্মদ নিজামপুরী (র.), পৃ. ১৩

৩. মোহাম্মদ সাইফুল হক সিরাজী, নূর মোহাম্মদ নিজামপুরী (র.) এর জীবনী, পৃ. ৬

৪. মোহাম্মদ সাইফুল হক সিরাজী, মীর সরাইয়ের সুফী সাধক ও ইসলামিক ব্যক্তিত্ব, পৃ. ২৮

৫. মোশ্বদায়ে ফজলে হক, ১৩৫২ হিজরীতে মুদ্রিত, আজীমপুর দায়রা শরীফ, সিদ্দিক আহমদ খান, মাওলানা আব্দুল খালেক (র.) এর জীবনী পৃ. ৪৫০-৫১, ড. মতিউর রহমান খান, আইনায়ে ওয়াইসি, পৃ.১১৯

৬. ড. মো. ইবরাহীম খলিল, সূফীবাদ এবং প্রধান প্রধান সূফী ও তাঁদের অবদান, পৃ. ৩২১

৭. মুহা. মুবারক আলী রহমানী, সীরাতে- ওয়সী,পৃ. ২য় সংস্করণ, ২০১৭, পৃ. ২১-২২

৮. মাওলানা মুহাম্মদ নিজাম উদ্দীন খান, সাইয়েদ আহমদ বেরেলভী (র.), পৃ.১২৩, মাওলানা রুহুল আমীন, কারামতে আহমদীয়া, পৃ. ৩৪

৯. মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ মিয়া, প্রাগুক্ত পৃ.১৫৯-১৬৪, .মাওলানা মুহাম্মদ নিজাম উদ্দীন খান, প্রাগুক্ত পৃ.২১৮

১০.চট্টগ্রামের সূফী সাধক, পৃ. ৯৩-৯৪, মুহা. মুবারক আলী রহমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

১১. এম ওবাইদুল হক, বাংলাদেশের পীর আওলিয়াগণ, পৃ. ৩০৪, মাওলানা নুরুর রহমান, তাযকেরাতুল আওলিয়া, ৬ষ্ঠ খন্ড, এমদাদীয়া লাইব্রেরী, ১ম মুদ্রণ, ১৯৮২, পৃ. ২০৫-৯, মাওলানা আবুল লায়েস আনসারী, চল্লিশ আওলিয়ার কাহিনী, পৃ. ৫১৯-৫২৬, আব্দুল মান্নান চৌধুরী, সূফী নূর মুহাম্মদ র. এর জীবনী, পৃ. ৯

১২. মুহা. মুবারক আলী রহমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪, মাওলানা রুহুল আমীন, ফুরফুরা পীর সাহেবের বিস্তারিত জীবনী, ৬ষ্ঠ মুদ্রণ, পৃ. ২৩, মাওলানা আবুল লায়েস আনসারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২৬-৩১

১৩. Muhammad Ismail, Development of Sufism In Bengal, PhD. Thesis, Aligarh Muslim University, 1989, P. 33,34, ড. মুহম্মদ শেহাবুল হুদা (দ্যা সেইন্টস এন্ড শ্রাইনস অব চিটাগাং) শীর্ষক অভিসন্দর্ভ এর অনুবাদ, শাহাব উদ্দীন নীপু, চট্টগ্রামেরর সূফী সাধক ও দরগাহ সুফিবাদ চর্চার হাজার বছর, পৃ. ১৩৯১৪. হামিদ উল্লাহ খান, আহাদিসুল খাওয়ানিন, কলকাতা, ১৮৩১, পৃ. ৩১৮ ইনস্ক্রিপশানস অব বেংগল, খন্ড ৪, পৃ. ২৮৭-৮৮

১৫. শেখ বোরহানুদ্দীন, হাদিয়াতুছ ছালেকীন, ১ম সংস্করণ, ১৯৬০, পৃ. ১৭-২০, আহমদুল ইসলাম চৌধুরী, শানে ওয়াইসী, ওয়াইসী হয়ে আজমগড়ী সিলসিলাহ, পৃ১৯,২৩, ৩৯, ড. আ. র.ম. আলী হায়দার, শিক্ষা বিস্তার ও সংস্কারে ফুরফুরার পীর আবু বকর সিদ্দীকী (র), ইফাবা, মে ২০০৪, পৃ. ১৩

১৬. ড. মুহম্মদ শেহাবুল হুদা (দ্যা সেইন্টস এন্ড শ্রাইনস অব চিটাগাং) শীর্ষক অভিসন্দর্ভ এর অনুবাদ, শাহাব উদ্দীন নীপু, প্রাগুক্ত পৃ. ১৪৬, ১৫৩, রশীদ আহমদ, বাংলাদেশের সূফীসাধক, ঢাকা, মার্চ, ১৯৭৪, পৃ. ৩৯, সৈয়দ দেলোয়ার হোসেন, জীবনী ও কারামত, ১ম সংস্করণ, পৃ. ৩৬, ড. মঈন উদ্দিন আহমদ খান, আ হিস্ট্রি অব ফরায়েজি মুভমেন্ট ইন বেংগল, ১৯৬৫, পৃ. ১১, আহমদুল ইসলাম চৌধুরী, প্রাগুক্ত পৃ.৩৬

১৭. মোহাম্মদ সাইফুল হক সিরাজী, নূর মোহাম্মদ নিজামপুরী (র.) এর জীবনী, পৃ. ২১

রং প্রিন্টার্স
একটি নতুন সৃষ্টির চিন্তাধারা

আমাদের সেবাসমূহ

ম্যাগাজিন, ভাউচার, আইডি কার্ড, ব্যানার, ক্যালেন্ডার, খাম, প্যাড, ফ্যাস্টুন, পোস্টার, চালান বই, স্টিকার, গেঞ্জি প্রিন্ট, লিফলেট, আমন্ত্রণ কার্ড, চাঁদা রশিদ, মগ প্রিন্ট, ক্যাশ মেমো, ভিজিটিং কার্ড, লেভেল, যাবতীয় ছাপা কাজ।

পিয়ার মাহমুদ, স্বত্বাধিকারী, মোবা: ০১৭১৮ ৩৩৬৮৫৫
আহসান মাহমুদ, পরিচালক, মোবা: ০১৭৪২ ৬২৭৮৭৯
হোসেন মাহমুদ, পরিচালক, মোবা: ০১৭৬৫ ৩৬১৯৬২

৩১৭, রংমহল টাওয়ার (৩য় তলা), বন্দর বাজার, সিলেট।
E-mail: rangprinter@gmail.com

বাংলা জাতীয় মাসিক
পরওয়ানা
জীবন জিজ্ঞাসা বিভাগে

"ঈমান, আমাল ও আকীদা বিষয়ক আপনার যেকোনো প্রশ্ন আজই পরওয়ানার অনুকূলে পাঠিয়ে দিন।???

প্রশ্ন করার নিয়ম
- শুধুমাত্র প্রশ্নের মূল কথাগুলো লিখে পাঠাতে হবে
- ই-মেইল অথবা ডাকযোগে প্রশ্ন পাঠাতে পারবেন

প্রশ্ন করুন

প্রশ্ন পাঠানোর ঠিকানা
অফিস: বি.এন টাওয়ার (৯ম তলা), ২৮/১ বি, দৈনিক বাংলা মোড়, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
সিলেট বিভাগীয় অফিস: পরওয়ানা ভবন-৭৪, শাহজালাল লতিফিয়া আ/এ, সোবহানীঘাট, সিলেট
E-mail: parwanabd@gmail.com

Sirajam Muneera Jame Masjid & Education Centre

A centre where knowledge is priority and is accessible for everyone

Founded by :
Allama Imad Uddin Chowdhury
Boro Saheb Qiblah Fultali

A 2500 People capacity Masjid,

Hosting a wide range of Islamic Seminars, Every Sundays Being Dars of Bukhari

Islamic Weekday And Weekend courses for Children and Adults (Mon-Fri 4.30-6.30 PM)

Hosting scholars from around the world.

Khateeb and Principal
Shaykh Sayyid Fadi Zouba Ibn Ali al Hasani (Damascus)

6, Francis Road, B25 8HP, Birmingham, UK

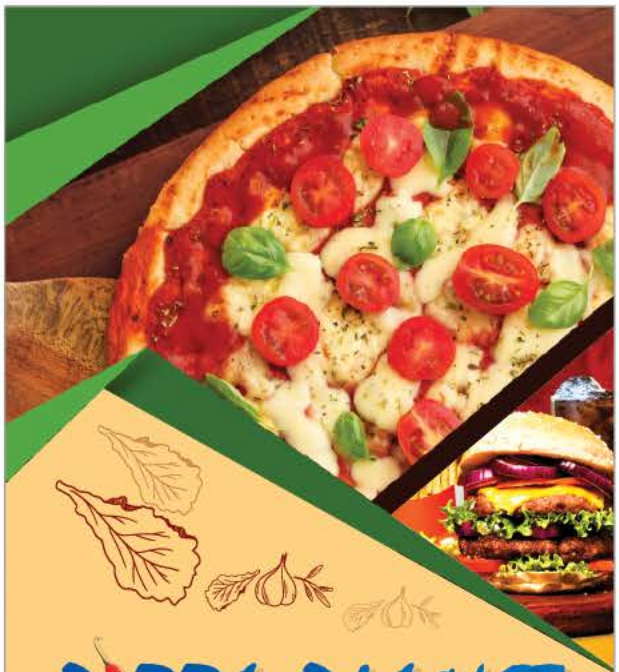

PIZZA PLANET
COVENTRY

Proprietor
Alhajj Md. Joshim Uddin

641, Stoney Stanton Road
Coventry, CV6 5GA

লতিফিয়া হিফজুল কুরআন মাদরাসা
মৌলভীবাজার
[হিফ্য ও সাধারণ শিক্ষা সমন্বিত একটি আবাসিক মাদ্‌রাসা]

মো. শফিকুল আলম
প্রিন্সিপাল

হাফিয মো. এনামুল হক
প্রধান হাফিয

প্রধান পরিচালক : আলহাজ হাফিয সাব্বির আহমদ

বড়কাপন, মৌলভীবাজার-৩২০০। যোগাযোগ : ০১৭১৮-৫৯৯৪৪৩, ০১৭১২-৩২৭৮৯০, ০১৭১১-৪৬৭৭৪৭, ০১৭৩০-১২৯২৫৪

FULTALI ISLAMIC CENTRE
COVENTRY

Fultali Islamic Center Coventry
136 The Chesils Coventry CV3 5BJ

আল-মামুরা গ্রুপ
Al- Mamora Group

আরব আমিরাত ■ Arab Emirates

আমাদের সেবা সমূহ

মির্জা আবু সুফিয়ান চেয়ারম্যান

- এয়ার টিকেট ও হোটেল বুকিং
- হজ্জ ও উমরাহ প্যাকেজ
- পাসপোর্ট নবায়ন
- সেনজেন ভিসা প্রসেসিং
- লাইসেন্স ও পার্টনার ভিসা প্রসেসিং করা হয়।
- বাংলাদেশিদের জন্য আরব আমিরাতের ভিজিট ভিসা প্রসেসিং

Office

Al Mamora Document service
Amer centar 2nd floor 03no gate shop no8
Nehar Al thowere Dubai- UAE

Al Mamora Typing Office
Al Rawda -2 Ajman UAE

Golden Al Mamora Travels
Mena Bazar Neyar, Al Ain UAE

+971527774491, +971557657024
mirzaabusufian@gmail.com, almamoratyping@gmail.com

আপনি কি ২০২১, ২০২২, ২০২৩ সালের মধ্যে হজ্জ করতে চান?
মাত্র ৩১,০০০ টাকা জমা দিয়ে আজই প্রাক নিবন্ধন করুন
ওমরাহ স্পেশাল প্যাকেজ

"আমরা শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করিনা তবে আমরা ব্যতিক্রম"

স্বত্বাধিকারী
আলহাজ্ব মাওলানা খাজা মঈনউদ্দীন আহমদ জালালাবাদী
+88 01711 838 624

জালালাবাদ হজ্জ কাফেলা
Khaja Air Liner

খাজা
Khaja
air Liner
Travel & Tours
হজ্জ ওমরাহ গ্রুপ

আন্তর্জাতিক এ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট এন্ড টুরস
Govt. Licn. No :253, 511, 882

IATA ACCREDITED AGENT

Biman BANGLADESH AIRLINES APPROVED
TURKISH AIRLINES
BRITISH AIRWAYS
Emirates
QATAR
SINGAPORE AIRLINES
US-BANGLA AIRLINES
REGENT
NOVOAIR

আমাদের নিজস্ব স্টক হতে সর্বনিম্ন মূল্যে বিশ্বের যে কোন গন্তব্যের বিমান টিকেট প্রাপ্তির নিশ্চয়তা

সিলেট অফিস
সবুজ বিপনী (৩য় তলা) জিন্দাবাজার
01742 926 329, 01714 486796
www.khajaairliner.com

ঢাকা অফিস
হোটেল বকসি (২য় তলা). ফকিরাপুল
01724 691 177, 0248 313524
khajaairliner@yahoo.com

সু-বিশাল ক্যাম্পাসে-মনোরম পরিবেশে

লতিফিয়া হিফযুল কুরআন একাডেমি ওসমানীনগর

(একটি অত্যাধুনিক মানসম্পন্ন আবাসিক হাফিজিয়া মাদরাসা)

দক্ষিণ তাজপুর বাজার, ওসমানীনগর, সিলেট।

পূর্ব নামঃ লতিফিয়া ক্যাডেট মাদরাসা ওসমানীনগর

সফলতার ৮ বছর

ভর্তি চলছে

সিসি ক্যামেরা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত

একাডেমিক ভবন ও ছাত্রাবাস

আমাদের বৈশিষ্ট্য

- অভিজ্ঞ শিক্ষকমন্ডলীর তত্ত্বাবধান।
- সম্পূর্ণ আবাসিক ব্যবস্থাপনা।
- সেমিষ্টার পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণ।
- সুন্নাতে নববীর পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ।
- প্রবাসী ছাত্রদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ।
- কম্পিউটার শিক্ষা বাধ্যতামূলক।
- সর্বোচ্চ তিন বছরে হিফজ সম্পন্ন। (ইনশা আল্লাহ)
- ইয়াকুবিয়া হিফযুল কুরআন বোর্ডের সিলেবাস অনুসরণ।
- ৫ বছরে দাওরাহসহ দাখিল ৮ম/১০ম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠদান।
- কুরআন হিফজের পাশাপাশি সম্পূরক সিলেবাস তথা বাংলাদেশ
- মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড ও জাতীয় পাঠ্য ক্রমের অনুসরণ।
- বোর্ড পরীক্ষার্থীদের সর্বোচ্চ ফলাফল অর্জনে বিশেষ তত্ত্বাবধান ও উন্নত হ্যান্ডনোট সরবরাহ।
- একাধিক ক্লাস টেষ্ট এবং বিষয় ভিত্তিক মডেল টেষ্ট গ্রহণ।
- ছাত্রদের খেলাধুলা ও শরীরচর্চার সুযোগ সুবিধা।
- প্রতিভা বিকাশের লক্ষে সাপ্তাহিক সভা, শবিনা, বিতর্ক অনুষ্ঠান ও দেয়ালিকা প্রকাশ।

প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক/ প্রিন্সিপাল

মাওলানা এম এ রব

মোবাঃ ০১৭১৬-৯৩৯৯১৮/০১৭৮৬-১২৮১২৮

প্রতিষ্ঠাতা পরিচালকঃ মশাহিদুর রহমান

Mail: moshahidurrahman@yamail.com

বের হয়েছে! বের হয়েছে!!

আস সুন্নাহ কায়িদাহ

মাওলানা মুফতি শেহাব উদ্দিন আলীপুরী

প্রকাশক

মুহাম্মদ হাসান তালুকদার রাজা

সুন্নী হানাফী পাবলিকেশন্স

+34632155292 01789914137

Sunni.Hanafi.publication@gmail.com

আমাদের প্রকাশিতব্য অন্যান্য প্রকাশনা

কুরআনুল কারীম

ছিপারা

তালিমুদ্দীন দ্বীন ও মাসনুন দোয়া-১

তালিমুদ্দীন দ্বীন ও মাসনুন দোয়া-২

তালিমুল মাসায়েল

ফাদ্বায়ালে নেক আমল

সিরাতুল মুসতাকিম

Sunni Hanafi Global Organization

www.sunnihanafipublication.com

LATIF TRAVELS

Hajj Licence No. 249 ■ Omrah Licence No. 312

Latif Holidays

Hajj & Umrah Agent

We serve
- All Domestic Airlines Ticket
- All International Airlines Ticket
- All Airlines Return Ticket, Date Change & Reconfirm
- Hajj Package
- Omrah Package
- Visa Processing
- Worldwide Hotel Booking
- Package Tour
- Honeymoon Packages
- We Arrange PTA Ticket
- Manpower

LATIF TRAVELS 59 Years CELEBRATING

IATA

104-109 Rose View Complex
(Ground Floor) | Uposohor | Sylhet.
Tel : (0821) 715359 | 712096 | 724 007
01711 32 22 44 | 019 39 77 88 66
E-mail : latiftravels@gmail.com

Station Road | Varthokhola | Sylhet.
Tel | (0821) 717437 | 714476 | 715243
01711 006 105 | 01711 330 729
01846 390 784 | 01846 390 785
E-mail | latiftravels@hotmail.com

119-124 R. B Complex
East Zindabazar | Sylhet | Tel : 714322
0821-714577 | 717677 | 01918 500 500
01711 330 729 | 0171 34 11 600
E-mail : latiftravels1962@gmail.com

Beanibazar : **Hazi Siraj Vhabon** | 1st Floor College Road | M # 01771 144666
Barlekha : **Habib Market** | 1st Fl. | Near Pubali Bank Moulvibazar | M # 01708 42 44 42
Moulovibazar : **Kushumbag Shopping City** | (Gr. Fl) Moulovibazar | M # 01712 687871

WE SELL US BANGLA, NOVO AIR, REGENT AIR DOMESTIC TICKET.
(Office Open 10 am to 8 pm, Zindabazar & Uposohor)

www.latiftravels.com
www.latiftravels.com.bd

হলি দারুন্নাজাত হজ্জ ওভারসীজ

IATA Approved Agent | ATAB MEMBER | Biman Approved

সরকার অনুমোদিত ট্রাভেল এন্ড হজ্জ এজেন্ট; এইচ.এল নং-১৪৬২

আমাদের সেবাসমূহ

◆ পবিত্র হজ্ব ও ওমরাহ ◆ ভিসা প্রসেসিং ◆ ট্যুর প্যাকেজি ◆ স্টুডেন্ট ভিসা ◆ হোটেল রিজারভেশন
◆ বিশ্বের যে কোনো দেশের এয়ার টিকেট ◆ প্রবাসী বাংলাদেশীদের জন্য ঢাকাসথ হেল্প সেন্টার

সার্বিক ব্যবস্থাপনায়
মাওলানা মোঃ আনোয়ার হোসাইন সালেহী
প্রোপ্রাইটর

সুন্দর ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে
সর্বোত্তম সেবা প্রদানই
আমাদের অঙ্গীকার

প্রধান কার্যালয়
বি.এন টাওয়ার (৯ম তলা), ২৮/১ বি, দৈনিক বাংলা মোড়, মতিঝিল, সি/এ, ঢাকা-১০০০
মোবা: ০১৭১৫-৫৮৮১৮৮, ০১৭১১-০১৭৫৮০, ফোন: +৮৮-০২-৭১৯৩৬০০, dnazat@gmail.com

আফগানিস্তান: এখনই সব মার্কিন সেনা সরছে না
শান্তি কতদূর?

রহমান মোখলেস

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন অবশেষে তাঁর পূর্বসূরি সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের করা চুক্তি থেকে সরে আসলেন। ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের সঙ্গে তালেবানের চুক্তি হয়েছিল। সেই চুক্তি অনুযায়ী ১ মের আগে আফগানিস্তান থেকে সব মার্কিন সেনা নিজ দেশে ফিরিয়ে নেওয়ার কথা ছিল। বাইডেন ১ মে দেশটি থেকে মার্কিন সেনা প্রত্যাহার শুরু করবেন এবং আগামী ১১ সেপ্টেম্বরের আগে আফগানিস্তান থেকে সব মার্কিন সেনা সরিয়ে নেবেন। বাইডেন গত ১৪ এপ্রিল এক ঘোষণায় এ কথা বলেন।

এখন প্রায় ২৫০০ মার্কিন সেনা আফগানিস্তানে অবস্থান করছে। এছাড়া আছে ন্যাটোর বিভিন্ন সদস্য রাষ্ট্রের আরো প্রায় সাড়ে সাত হাজার সেনা। মার্কিন সূত্র থেকে ২৫০০ সেনার কথা বলা হলেও কোনো কোনো সূত্র মতে আসলে মার্কিন সেনা আছে সাড়ে তিন হাজার। ট্রাম্প প্রশাসনের সাথে তালেবানের যে চুক্তি হয়, সেই চুক্তির অধীনে যুক্তরাষ্ট্র ১ মের আগেই তার সমস্ত বাহিনী প্রত্যাহারে সম্মত হয়। বিনিময়ে শান্তি চুক্তির শর্তানুসারে তালেবান সন্ত্রাস পরিহার করবে, মার্কিন সেনারা দেশে ফিরবে, তালেবান আল-কায়েদার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে এবং চুক্তির পর থেকে ১ মে পর্যন্ত মার্কিন বাহিনীর ওপর হামলা বন্ধ করবে। উভয় পক্ষেই চুক্তি বাস্তবায়নে জোরালো প্রতিশ্রুতি ছিল। ২০১১ সাল থেকেই শান্তি চুক্তিতে আসার ব্যাপারে কাতারের রাজধানী দোহায় বৈঠক করে আসছেন তালেবান নেতারা। উল্লেখ্য, তালেবান এখন দেশটির বিশাল অংশ নিয়ন্ত্রণ করছে।

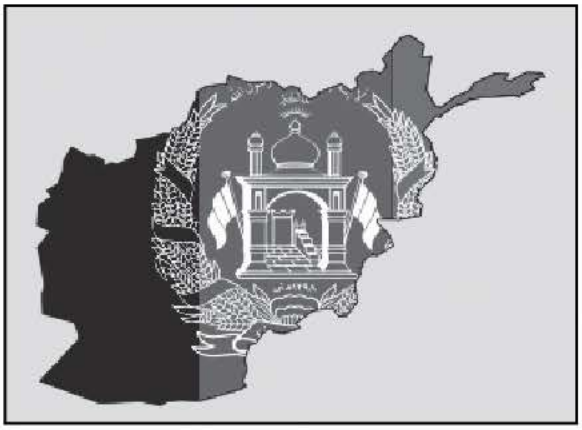

সময় নিয়ে প্রশ্ন ট্রাম্পের

সেনা প্রত্যাহারে বাইডেনের সময়সীমা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন দেশটির সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ট্রাম্প বলেছেন, বর্তমান প্রেসিডেন্ট বাইডেন যেন আফগানিস্তান থেকে মার্কিন সেনা ফিরিয়ে আনার সময়সীমা ১১ সেপ্টেম্বর নির্ধারণ না করেন। তার আগেই দেশটি থেকে সেনা সরিয়ে আনেন। আফগানিস্তান থেকে যুক্তরাষ্ট্রের সেনা প্রত্যাহারকে চমৎকার একটি উদ্যোগ অভিহিত করে ট্রাম্প বলেন, তিনি ১৮ মাসের পরিকল্পনা নিয়ে ১ মের মধ্যেই আফগানিস্তান থেকে মার্কিন সেনা প্রত্যাহারের সময় সীমা নির্ধারণ করেছিলেন। আফগানিস্তান থেকে সব সেনা প্রত্যাহারের তারিখ তাঁর নির্ধারিত সময়সীমার কাছাকাছি রাখার জন্য তিনি বর্তমান প্রশাসনের প্রতি আহ্বান জানান।

আফগান সরকারের প্রতিক্রিয়া

বাইডেনের ঘোষণার পরপরই আফগানিস্তানের প্রেসিডেন্ট আশরাফ গণি টুইট করে বলেছেন, 'আমি মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা বলেছি এবং তাঁদের সিদ্ধান্তকে শ্রদ্ধা জানাই। সেনা প্রত্যাহারের ক্ষেত্রে আমরা আমাদের মার্কিন অংশীদারদের সঙ্গে নিবিড়ভাবে কাজ করব এবং চলমান শান্তি প্রচেষ্টায় আমরা মার্কিন ও ন্যাটো অংশীদারদের সঙ্গে তৎপরতা অব্যাহত রাখব।'

তালেবানের প্রতিক্রিয়া

এদিকে আফগানিস্তান থেকে মার্কিন সেনা প্রত্যাহারে বাইডেনের সময়সূচি ঘোষণাকে প্রত্যাখান করেছে তালেবান। তালেবান বলেছে, সেনা প্রত্যাহারের বিষয়ে মার্কিন সরকার তাদের সঙ্গে যে চুক্তি করেছিল বাইডেন তা লজ্জাজনকভাবে লঙ্ঘন করেছে। গত ১৫ এপ্রিল কাতারের রাজধানী দোহায় তালেবানের রাজনৈতিক কার্যালয়ের মুখপাত্র মুহাম্মাদ নাঈম ওয়ারদাক ইরানের প্রেস টিভিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এ কথা বলেন। তিনি বলেন, চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে অর্থাৎ ১ মের মধ্যে সব মার্কিন সেনা প্রত্যাহার না হলে জোরপূর্বক তাদেরকে আফগানিস্তান থেকে বের করে দেওয়া হবে। তিনি বলেন, ওয়াশিংটন তার প্রতিশ্রুতি মেনে চলতে ব্যর্থ হয়েছে। ২০২০ সালে তালেবানের সঙ্গে যে চুক্তি হয়েছিল তার প্রতি তারা কোনো সম্মান দেখায়নি।

নাঈম ওয়ারদাক আরও বলেন, আফগান জনগন দখলদারদের বিরুদ্ধে জিহাদে লিপ্ত রয়েছে এবং গত বিশ বছর ধরে বিদেশি সামরিক আগ্রাসনের মুখে তারা নিজেদের রক্ষা করে চলেছে। তিনি বলেন, 'আমাদের দেশকে স্বাধীন করার জন্য আমরা লড়াই করছি। জনগণকে রক্ষার জন্য স্বাধীন একটি সরকার চাই।'

প্রেস টিভিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তালেবান মুখপাত্র নাঈম ওয়ারদাক আরও বলেন, 'আফগানিস্তানে সম্প্রতি যে সহিংসতা বেড়েছে তার জন্য যুক্তরাষ্ট্রই দায়ী। মার্কিন বোমাবর্ষণ আমাদের অভিযানের পরিধি বাড়াতে বাধ্য করেছে।' আবার ক্ষোভ প্রকাশ করলেও কোনো কোনো তালেবানের নেতা বাইডেনের ঘোষণায় একদিকে নিজেদের বিজয় হিসেবেও দেখছে।

এদিকে আফগানিস্তানে শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে গত ২৪ এপ্রিল তুরস্কের ইস্তাম্বুলে যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল, তালেবান তাতে অংশ নেবে না ঘোষণা দেওয়ার পর ২১ এপ্রিল বৈঠকটি স্থগিত করে তুরস্ক। এ সম্মেলনে জাতিসংঘসহ ২০টির বেশি দেশ অংশ নেওয়ার কথা ছিল।

তালেবানের মুখপাত্র জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ এক টুইটে জানান, 'আফগানিস্তানের মাটি থেকে সব বিদেশি সেনা প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত তালেবান এই নিয়ে আর কোনো বৈঠক বা সম্মেলনে অংশ নেবে না।'

যা ভাবছে বর্তমান মার্কিন প্রশাসন

বর্তমান মার্কিন প্রশাসন ১ মে থেকে শুরু করে আগামী ১১ সেপ্টম্বরের মধ্যেই তাদের সব সেনা প্রত্যাহার করতে চায়। মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেন বলেছেন, প্রেসিডেন্টের লক্ষ্য খুবই পরিষ্কার। আমাদের সৈন্যদের ঘরে ফিরিয়ে আনতে হবে ঠিক, তবে অন্যদিকে আফগানিস্তান যেন আবার সন্ত্রাসবাদের আশ্রয়স্থল না হয়ে ওঠে তাও নিশ্চিত করতে হবে। ব্লিংকেন বলেন, সব সেনা প্রত্যাহারের আগে আফগানিস্তানে একটি স্থিতিশীল গণতান্ত্রিক পরিবেশ প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। সে জন্য যৌথ বাহিনী কাজ চালিয়ে যাবে। যেখানে তালেবান সহিংতা পরিহার করে রাজনৈতিক ধারায় ফিরবে।

অপরদিকে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ ট্রাম্প প্রশাসনের মতো তাড়াহুড়া না করে ধীরে ধীরে সৈন্য প্রত্যাহারের সুপারিশ করেছে। সিআইএ মনে করে, পরিস্থিতি বিবেচনা করেই আফগানিস্তান থেকে সেনা প্রত্যহার করতে হবে। প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার সময় থেকেই আফগানিস্তান থেকে সেনা প্রত্যাহারে চাপ ছিল। 'অমূলক' এ ব্যয় বহুল যুদ্ধ চালানো এবং আফগানে অবস্থান করার এখন আর কোনো কারণ নেই বলে মনে করেন মার্কিন বিশ্লেষকরা। এর আগে বারবার সময়সূচি নির্ধারণ করেও বারাক ওবামা কিংবা ট্রাম্পের সময়ে সব সেনা প্রত্যাহার সম্ভব হয়নি।

আফগানিস্তান যুদ্ধে গত ২০ বছরে প্রাণ গেছে প্রায় আড়াই হাজার মার্কিন সেনার। হতাহত হয়েছে লাখো আফগান নাগরিক। এই যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের খরচ হয়েছে ২ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১১ সালে আফগানিস্তানে সর্বোচ্চ ১ লাখ মার্কিন সেনা সদস্য ছিল। পরে বিভিন্ন সময়ে তা কমানো হয়েছে। আর এবার পুরোপুরি সেনা প্রত্যাহার করে নিচ্ছে দেশটি। আগামী ১১ সেপ্টেম্বরের পর কাবুলে মার্কিন দূতাবাসের মতো যুক্তরাষ্ট্রের স্থাপনাগুলোর নিরাপত্তার জন্য যত সংখ্যক সেনা প্রয়োজন, ঠিক তত সংখ্যক মার্কিন সেনাই আফগানিস্তানে থাকবে।

এদিকে আফগানিস্তান পুনর্গঠনের জন্য ২০০২ সাল থেকে ১৪৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার খরচ করেছে যুক্তরাষ্ট্র। তার মধ্যে ৮৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার খরচ হয়েছে আফগান সেনাদের প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য সহায়তা দিতে। যুদ্ধে হাজার হাজার সাধারণ মানুষের মৃত্যু মার্কিন জনগণকে ক্ষুব্ধ করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের রাজপথে যুদ্ধ বিরোধী মিছিল সমাবেশ হয়েছে।

কী ভাবছে ন্যাটো

আফগানিস্তান থেকে পশ্চিমা দেশগুলোর সামরিক জোট ন্যাটোর সেনাদেরও সরিয়ে নেওয়া হবে একই সময়ে। ন্যাটো জোট ইতোমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছে, ন্যাটো আফগানিস্তান থেকে ১ মে সব সৈন্য সরাচ্ছে না। ন্যাটোর মতে, তালেবান চুক্তির সমস্ত বিষয় মেনে চলছে না। কাজেই আফগানিস্তান থেকে ন্যাটোর সৈন্য সরানোর মতো পরিস্থিতি এখনো তৈরি হয়নি। ১ মে নয়, ১১ সেপ্টেম্বরের মধ্যেই তারাও আফগানিস্তান থেকে তাদের সব সেনা সরাবে।

সম্প্রতি ন্যাটোর প্রধান জ্যাঁ স্টলটেনবার্গ ব্রাসেলসে এক সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, আফগানিস্তানে শান্তি স্থাপনের জন্য এবং গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনতে দীর্ঘ দিন ধরে কাজ করেছে ন্যাটো। সে কারণেই সেখানে যৌথ বাহিনীর সেনা মোতায়েন করা হয়েছিল। গত দুই দশকে লাখ লাখ অর্থ খরচা হয়েছে। এখন যদি দ্রুত সেনা ফিরিয়ে নেওয়া হয়, তাহলে মিশন সফল হবে না। পরিশ্রম সব বিফলে যাবে। আর এ জন্যই এত দ্রুত সৈন্য প্রত্যাহার সম্ভব নয়। তার আগে দেশটিতে শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। দেশে যাতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়, সে বিষয়েও তারা আগ্রহ দেখাবে। গত ডিসেম্বরেও কাবুলে বড়সড় বিস্ফোরণ ঘটায় তালেবান। যেখানে মৃত্যু হয় ডেপুটি গভর্নরের। এখনই সেনা সরিয়ে নিলে জঙ্গি আক্রমণ আরো বেড়ে যাবে। এদিকে জোটের শরীক জার্মানি ঘোষণা দিয়েছে, তারা ৪ জুলাইয়ের মধ্যে আফগানিস্তান থেকে তাদের সেনা সরিয়ে নেবে।

আফগানিস্তান সংকটের শুরু যখন থেকে

কখন থেকে এই আফগান সংকটের শুরু তা খুব সংক্ষেপে একটু জেনে নেওয়া যাক। গত চার দশক ধরে চলছে আফগান সংকট। যুক্তরাষ্ট্রকে মুকাবিলায় নিজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের দৃষ্টি ছিল মধ্য এশিয়া থেকে আফগানিস্তান হয়ে আরব সাগরে পৌঁছা। তার আগে আফগানিস্তান দখল এবং সেখানে কমিউনিস্ট শাসনের প্রতিষ্ঠা। এ জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯৭৮ সালে আফগানিস্তান একটি অভ্যুত্থান ঘটায়। এর মধ্য দিয়ে আফগানিস্তান পিপলস ডেমোক্রেটিক পার্টি (পিডিপিএ) ক্ষমতায় আসে। এই অভ্যুত্থান তথা বিপ্লবে মুহাম্মদ দাউদ খানের সরকার উৎখাত হয়। আর ১৯৭৯ সালেই আফগানিস্তানে ঢুকে পড়ে সোভিয়েত বাহিনী। এদিকে দাউদের পর নূর মুহাম্মদ তারাকি রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান হন। তারপর আসে হাফিজউল্লাহ আমিন। এরপর সোভিয়েত ইউনিয়নের উদ্যোগে আরো একটি অভ্যুত্থানের নাটক। হাফিজউল্লাহ আমিনকে হত্যা করে ক্ষমতায় বসে সোভিয়েতপন্থী বাবরাক কারমাল। ১৯৮৬ সালে কারমালকে হটিয়ে ক্ষমতায় আসে মুহাম্মদ নজিবউল্লাহ। এদিকে আফগানিস্তান থেকে কমিউনিস্ট শাসন ও সোভিয়েতপন্থী সরকার হটাতে গড়ে ওঠে বিভিন্ন মুজাহিদ বাহিনী। মার্কিন উদ্যোগে ও অস্ত্রে প্রতিষ্ঠা হয় আল-কায়েদা। এ সময় সংঘাতে লাখ লাখ আফগান উদ্বাস্তু হয়ে পাকিস্তান আসে। পাকিস্তানের আফগান উদ্বাস্তু শিবিরে গঠিত হয় আফগান ছাত্রভিত্তিক সংগঠন তালেবান। ১৯৭৯ সালের ২৪ ডিসেম্বর আফগানিস্তানে সোভিয়েত সৈন্য প্রবেশ করলে সোভিয়েত সেনার বিরুদ্ধে মুজাহিদ বাহিনীও যুদ্ধের সূচনা করে। মুজাহিদ বাহিনী ও আল-কায়েদার হামলার তীব্রতায় ১৯৮৮ সালের ১৫ মে আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েত সৈন্য প্রত্যাহার শুরু হয়। ১৯৮৯ সালে যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে।

এদিকে ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তি ঘটলে ১৯৯২ সালের এপ্রিলে পতন ঘটে নজিবউল্লাহ সরকারের। এ সময় নজিবউল্লাহকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। সোভিয়েতের বিদায়ে আবদুর রশিদ দোস্তামের মুজাহিদ বাহিনী ও আফগান সরকারের মধ্যে শুরু হয় ক্ষমতার লড়াই। এদিকে আফগানিস্তানে দ্রুত উত্থান ঘটে তালেবানের। এক পর্যায়ে আল-কায়েদার সমর্থনে ক্ষমতা দখল করে তালেবান।

আফগানিস্তানে মার্কিন সেনার প্রবেশ

তালেবান ক্ষমতায় আসার পরই আল-কায়েদার সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রেরও বিরোধ শুরু হয়ে যায়। এরই এক পর্যায়ে ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরে নিইউয়র্কে মার্কিন টুইন টাওয়ারে ভয়াবহ সন্ত্রাসবাদী হামলার ঘটনা ঘটে। যুক্তরাষ্ট্র এ জন্য দায়ী করে আল-কায়েদাকে। এ ঘটনার এক মাসেরও কম সময়ের মধ্যে আফগানিস্তানে সামরিক

অভিযান শুরু করে যুক্তরাষ্ট্র। সামিল হয় মিত্র ন্যাটো জোটও। তারা দ্রুত আফগানিস্তানে 'আল-কায়েদার পৃষ্ঠপোষক' তালেবান সরকারকে উৎখাত করে। তালেবান হঠিয়ে এরপর আফগানিস্তানে আসে একের পর এক মার্কিন সমর্থিত সরকার। এরই সর্বশেষ পর্যায় তথাকথিত নির্বাচনের মাধ্যমে বর্তমানে ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্ট আশরাফ গণি সরকার এখন ক্ষমতায়। যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধের ইতিহাসে ভিয়েতনাম যুদ্ধের পর আফগান যুদ্ধ দ্বিতীয় দীর্ঘতম যুদ্ধ। তবে ভিয়েতনাম যুদ্ধ এতদিন স্থায়ী হয়নি।

এদিকে মার্কিন সেনা প্রত্যাহারের পর আফগানিস্তান পরিস্থিতি যাতে অস্থির না হয়ে উঠে, তার জন্য গোপনে কাজ করছে বাইডেন প্রশাসন। তুরস্কের সহযোগিতায় তালেবানের সাথে আফগান সরকারের একটি সমঝোতার চেষ্টা চলছে। এপ্রিল মাসের শেষে এ নিয়ে তুরস্কের ইস্তাম্বুলে একটি বৈঠকের কথা রয়েছে।

আফগান সরকার-তালেবান শান্তি আলোচনা

আফগান সরকার ও তালেবানের মধ্যেও শান্তি আলোচনা শুরু হয়েছিল, তবে এতদিনেও তারা চূড়ান্ত নিষ্পত্তিতে আসতে পারেনি। কাতারের রাজধানী দোহায় ট্রাম্প আমলে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় আফগান সরকার এবং তালেবান প্রতিনিধিদের মধ্যে এ শান্তি আলোচনা শুরু হয়। প্রাথমিকভাবে তিন পৃষ্ঠার একটি চুক্তিতে দুই পক্ষ সম্মত হলেও পরে তা আর রক্ষা হয়নি। চুক্তিতে তালেবান আফগানিস্তানের মাটিতে সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালাবে না এবং অস্ত্র পরিহার করবে এমন শর্ত ছিল। বিনিময়ে আফগানিস্তান থেকে সব মার্কিন সেনা প্রত্যাহার এবং বন্দি তালেবান সদস্যদের মুক্তি দেওয়ার শর্ত ছিল। শর্ত অনুযায়ী অনেক তালেবান বন্দিকে মুক্তিও দেয় আফগানিস্তানের আশরাফ গণি সরকার।

কিন্তু এই আলোচনা চলার মধ্যেই তালেবানের হামলা অব্যাহত থাকায় এবং আলোচনার বিষয়গুলো নিয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে সমঝোতা না হওয়ায় এ নিয়ে তারা কোনো চূড়ান্ত চুক্তিতে পৌঁছাতে পারেনি।

মঞ্চে আবার রাশিয়া

আফগানিস্তান থেকে মার্কিন সেনা প্রত্যাহার নিয়ে টালবাহানার মাঝে মঞ্চে আবার এসে হাজির হয় রাশিয়া। শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়ে হঠাৎ করেই তৎপর হয়ে ওঠে রাশিয়া। রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন যুদ্ধ-পরবর্তী আফগানিস্তানে তার দেশের স্বার্থ যাতে সুরক্ষিত থাকে, সে ব্যাপারে উদ্যোগী হন। কাতারের রাজধানী দোহায় সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের উদ্যোগে স্বাক্ষরিত শান্তি চুক্তি নিয়ে অচলাবস্থার মাঝে রাশিয়া মস্কোতে গত ১৮ মার্চ আফগান সরকার, তালেবান ও অন্য নেতাদের নিয়ে শান্তি সম্মেলনের আয়োজন করে। যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও পাকিস্তান এই বৈঠকে তাদের প্রতিনিধি পাঠায়।

রাশিয়ার দেওয়া শান্তি প্রস্তাবে বলা হয়েছে, আফগানিস্তান থেকে সব মার্কিন সেনা প্রত্যাহার করতে হবে। ৪১ বছর ধরে চলা গৃহযুদ্ধের অবসান এবং ক্ষমতা ভাগাভাগির চুক্তি করতে হবে।

এদিকে ওয়াশিংটনের সঙ্গে শান্তি আলোচনার পাশাপাশি মস্কো, বেইজিং ও তেহরানের সঙ্গেও সম্পর্ক স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে তালেবান। তালেবান নেতারা একাধিকবার মস্কো, তেহরান ও বেইজিং সফর করেছেন।

শান্তি কতদূর?

সিএনএনের এক বিশ্লেষণে বলা হয়েছে, মার্কিন সেনা প্রত্যাহারে আফগান যুদ্ধ শেষ হবে না। এই পদক্ষেপ অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক উভয় ক্ষেত্রে নতুন ঝুঁকি সৃষ্টি করতে পারে। দেশটি আরও অস্থিতিশীল হতে পারে। এই অস্থিতিশীলতা আঞ্চলিক পর্যায়েও ছড়াতে পারে। সিএনএনের মতে আফগানিস্তানে এখন আল-কায়েদাও বেশ তৎপর। এছাড়া এই যুদ্ধের মধ্যেই আফগানিস্তানে আইএসেরও উত্থান ঘটেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আফগান যুদ্ধের অবসান এবং এ ক্ষেত্রে আফগানিস্তানের সকল পক্ষ ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে এগিয়ে আসা উচিৎ। গত চার দশক ধরে আফগানিস্তানে যে রক্ত ঝরছে তার অবসান হওয়া উচিৎ। তালেবান আগেই ঘোষণা দিয়ে রেখেছে, আগামী ১ মের মধ্যে আফগানিস্তান থেকে মার্কিন সেনা প্রত্যাহার না হলে তারা আবারও বিদেশি সৈন্যদের ওপর হামলা শুরু করবে।

আফগানিস্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে আশঙ্কা করছেন নিরাপত্তা বিশ্লেষকেরাও। দেশটিতে শেষ পর্যন্ত শান্তি ফিরবে তো? তবে তার আগে যত দ্রুত সম্ভব দেশটি থেকে মার্কিন ও ন্যাটো জোটসহ সব বিদেশি সেনার চলে যাওয়া উচিৎ। এছাড়া এখনই বর্তমান আফগান সরকার ও তালেবান এবং যুক্তরাষ্ট্র ও তালেবানের মধ্যে একটি কার্যকর চুক্তি ও সমঝোতা হতে হবে। বাইডেন ক্ষমতায় এসেই বলেছিলেন, আফগানিস্তান থেকে দ্রুততার সাথে মার্কিন সেনা প্রত্যাহার করা হবে। তা হলে আর বিলম্ব কেন? ১ মে কে সামনে রেখেই যুক্তরাষ্ট্র, আফগান সরকার ও তালেবান এই ত্রিমুখী বৈঠকের মাধ্যমে সংকটের শান্তিপূর্ণ ফয়সালা হতে পারত। কারণ যত বিলম্ব হবে, আফগানিস্তানে তত রক্ত ঝরবে। আর তালেবানকেও এগিয়ে আসতে হবে সদিচ্ছা নিয়ে। পরিহার করতে হবে কঠোর রক্ষণশীল মনোভাব। তাদেরকে সশস্ত্র পন্থা বাদ দিয়ে নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির পথে আসতে হবে। এটাই শান্তির রাস্তা। তালেবানকে এই পথেই আসতে হবে। গত ২০ বছরের যুদ্ধ থেকে শিক্ষা নিতে হবে। যুদ্ধের মাধ্যমে কখনই শান্তি সম্ভব নয়। ভূরাজনৈতিক অবস্থানের কারণে আফগানিস্তান বৃহৎ শক্তি ও আন্তর্জাতিক মোড়লদের কাছে সবসময়ই ছিল লোভনীয়। তাই সাবেক সোভিয়েত সেনারা চলে যাওয়ার পর আফগানিস্তান যেভাবে মার্কিন ঘূর্ণি চক্রে পড়েছিল এবার মার্কিন সেনারা চলে যাওয়ার পর আবার সেই চক্রের মুখে দেশটি যেন না পড়ে। অনেক রক্ত ঝরেছে, আর নয়। আর যুদ্ধ নয়, শান্তি ফিরে আসুক। কিন্তু সেই শান্তি এখন কত দূর?

সাইমুন

লাইব্রেরী এন্ড স্টেশনারী

এখানে স্কুল-কলেজ-মাদরাসার যাবতীয় পাঠ্যপুস্তক কোরআন শরীফ, ধর্মীয় বই, স্কুলব্যাগ, স্টেশনারী সহ অন্যান্য গিফ্‌ট সামগ্রী পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় হয়।

পরিচালক: মাওলানা আতাউর রহমান
মোবাইল: ০১৭১৯ ৪২৮০৬৯

শাহজালাল লতিফিয়া আ/এ
(হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা সংলগ্ন)
সোবহানীঘাট, সিলেট

অধ্যাপক মুহাম্মদ আব্দুল মালেক (র.)
জীবনালেখ্য ও অবদান

আব্দুল্লাহ জুবায়ের

[অধ্যাপক মুহাম্মদ আব্দুল মালেক (র.) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের স্বনামধন্য অধ্যাপক ছিলেন। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের মতাদর্শী এ মহান শিক্ষাবিদ গতমাসের ৯ তারিখ ইন্তিকাল করেন। আমরা আল্লাহ তাআলার দরবারে তাঁর মাগফিরাত ও দরজা বুলন্দি কামনা করছি। -সম্পাদক]

আল্লাহ তাআলা মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। এরপর মানবজাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠতম উম্মত করেছেন উম্মতে মুহাম্মদীকে। জ্ঞান, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, মর্যাদা, সরলতা ও নিষ্কলুষতায় উম্মতে মুহাম্মদী এক অনন্য ভূষণে ভূষিত। এই উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্যেই আরও নির্দিষ্ট কিছু মানুষ উচ্চতর মর্যাদায় আসীন। তাঁরা কুরআনের বাহক, খাদিম, শিক্ষক ও সমগ্র মানবজাতির হিদায়াতের আলোকবর্তিকা। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর অত্যন্ত প্রসিদ্ধ একটি হাদিস আমরা জানি- خَيْرُكُمْ مَّنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ -তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম, যে নিজে কুরআন শিখে ও অন্যকে শিখায়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সম্মানিত অধ্যাপক মুহাম্মদ আব্দুল মালেক (র.) ছিলেন তেমনই একজন ব্যক্তিত্ব। অসাধারণ বিদ্যা-বুদ্ধি আর চারিত্রিক সৌন্দর্য দিয়ে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আলো ছড়িয়েছেন অর্ধশতকেরও বেশি সময় ধরে। এমন স্তরের দ্বিতীয় আরেকজন আলিমকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এত দীর্ঘ সময় ধরে পেয়েছে বলে আমাদের জানা নেই।

এ মহান ব্যক্তিত্ব ১৯৪৩ সালের ১ জানুয়ারি তৎকালীন বাকেরগঞ্জ জেলার স্বরূপকাঠী থানার (বর্তমান বরিশাল জেলার নেছারাবাদ উপজেলা) মাগুরা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা ছিলেন মাওলানা মুহাম্মদ মুসলেম আলী মিঞা এবং মা মোসাম্মাৎ সবুরা খাতুন।

শৈশব থেকেই তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। মাতৃগৃহেই প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন তিনি। ছারছীনা দরবার শরীফের প্রতিষ্ঠাতা ও যুগের অন্যতম আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব পীর নিছারুদ্দীন (র.) তখনও বেঁচে ছিলেন। বাড়ির পাশে মাদরাসা হওয়ায় প্রথমেই তিনি সেখানে ভর্তি হন।

অধ্যাপক আব্দুল মালেক স্যার পবিত্র কুরআনের শিক্ষক হিসেবে পেয়েছিলেন আল্লামা নিছারুদ্দীন (র.) কে। আল্লামা নিছারুদ্দীন (র.) নিজেই তাঁকে পবিত্র কুরআনের সবক দিয়েছিলেন।

অধ্যাপক মুহাম্মদ আব্দুল মালেক ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত আলিয়া মাদরাসা থেকে ১৯৫৪, ১৯৫৮, ১৯৬০ ও ১৯৬২ সালে যথাক্রমে দাখিল, আলিম, ফাযিল ও কামিল পাশ করেন। অসাধারণ মেধার স্বাক্ষর হিসেবে তিনি সকল পরীক্ষাতে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হওয়াসহ বোর্ডের মেধা তালিকায় স্থান অর্জন করেন। এরই মধ্যে ১৯৬১ সালে প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে পূর্ব পাকিস্তান মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড থেকে মেট্রিক পাশ করেন এবং ১৯৬৪ সালে যশোর বোর্ডের অধীনে ফজলুল হক কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। ১৯৬৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে বিএ অনার্স এবং ১৯৬৮ সালে একই বিভাগ থেকে এমএ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অর্জন করেন। সে সময় শুধু অনার্স শ্রেণিতে একটি স্বর্ণপদক চালু ছিল। তিনি সে পদক লাভ করেন। এছাড়া আলাদাভাবে ১৯৭৩ সালে তিনি ফারসি ভাষাতেও মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন।

অধ্যাপক মুহাম্মদ আব্দুল মালেক (র.) এমএ তে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়ে উত্তীর্ণ হবার পরই যোগ দেন শেরে বাংলার স্মৃতিবিজড়িত চাষারের ফজলুল হক কলেজে। সেখানে আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে লেকচারার হিসেবে ১৯৬৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৭০ সালের ১৩ আগস্ট পর্যন্ত প্রায় দু'বছর কর্মরত ছিলেন।

এরপর ১৯৭০ সালের ১৯ আগস্ট তিনি প্রথমবারের মতো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে অস্থায়ী লেকচারার হিসেবে যোগ দেন। প্রথমবারের এই নিয়োগে তিনি ১৯৭১ সালের ২ এপ্রিল পর্যন্ত অর্থাৎ সাত মাসের মতো কর্মরত ছিলেন।

পরবর্তীতে তিনি ১১ আগস্ট ১৯৭১ থেকে ১৩ মার্চ ১৯৭২ পর্যন্ত কবি নজরুল সরকারি কলেজে প্রভাষক পদে দায়িত্ব পালন করেন। ঐ সময় কলেজটির নাম ছিল ইসলামিয়া কলেজ।

এরপর ৪ এপ্রিল ১৯৭২ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে প্রভাষক পদে যোগদান করেন। আমৃত্যু তিনি এ বিশ্ববিদ্যালয়েই শিক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। এছাড়া প্রয়োজন অনুসারে অলঙ্কৃত করেছিলেন বিভিন্ন প্রশাসনিক পদ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ১৯৭৮ সালে সহকারী অধ্যাপক, ১৯৮৬ সালে সহযোগী অধ্যাপক ও ১৯৯৯ সালে অধ্যাপক পদে উন্নীত হন। ইতোমধ্যে আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ আলাদা হয়ে গেলে তিনি ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগকে বেছে নেন। ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত তিনি ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে অনারারি অধ্যাপক পদে কর্মরত ছিলেন।

জাতীয় ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন

অধ্যাপক মুহাম্মদ আব্দুল মালেক (র.) মূলত ছিলেন নির্ভৃতচারী জ্ঞানসাধক। জ্ঞানার্জন আর অর্জিত জ্ঞানকে ছড়িয়ে দেওয়া-এই দুটি বিষয়কে তিনি সারাজীবন গুরুত্বের সাথে আনজাম দিয়েছেন। এরপর দেশ, জাতি ও প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে তিনি বেশ কিছু প্রশাসনিক দায়িত্বও পালন করেছেন। যেমন- চেয়ারম্যান, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাবি (১৯৯২-১৯৯৫)। আবাসিক শিক্ষক, জহুরুল হক হল, ঢাবি (১৯৮০-১৯৮৯)। সদস্য, সিলেকশন বোর্ড, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাবি। সদস্য, সিলেকশন বোর্ড, আরবি বিভাগ, রাবি। সদস্য, সিলেকশন বোর্ড, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাবি। সদস্য, সিলেকশন বোর্ড, দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইবি। সদস্য, ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত কামিল মাদরাসা এডভাইজরি বোর্ড, পিরোজপুর।

গবেষণামূলক কার্যক্রম

অধ্যাপক মুহাম্মদ আব্দুল মালেক (র.) রচিত ও সম্পাদিত বহু গ্রন্থ ও গবেষণাকর্ম রয়েছে। তন্মধ্যে প্রকাশিত গ্রন্থ: ৪টি; প্রকাশিত সম্পাদিত গ্রন্থ: ০৮; প্রকাশিত অনূদিত গ্রন্থ: ০২; প্রকাশিত গবেষণামূলক প্রবন্ধ: ১৮।

তিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশনের তাফসীরে মাযহারী (১৩ খণ্ড) এর সম্পাদনা পরিষদের সভাপতি ছিলেন। এর বাইরে তিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সুনানে নাসাঈ, সুনানে ইবনে মাজাহ, সীরাতে ইবনে হিশাম ও আল হিদায়া এর সম্পাদনা পরিষদের সদস্য ছিলেন।

অধিকন্তু তিনি তাফসীরে রুহুল মাআনী ২য় ও ৩য় খণ্ড, তাফসীরে কাবীর ১ম খণ্ড, ইলাউস সুনান ৭ম খণ্ড, এবং আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৬ষ্ঠ খণ্ডের একক সম্পাদনা করেছেন। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ইসলামী বিশ্বকোষে তাঁর ২১ টি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও তিনি জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত ষষ্ঠ-দশম শ্রেণির ইসলাম শিক্ষা বই রচনার সাথে যুক্ত ছিলেন।

এ মহান জ্ঞানসাধক গত ৯ এপ্রিল ২০২১ শুক্রবার দিবাগত রাত ১০ টায় আল্লাহ তাআলার যিম্মায় চলে যান। তাঁর ইন্তিকালের ফলে ইসলামী জ্ঞানচর্চার আকাশে এক ধ্রুবতারা অদৃশ্য হয়েছে সত্য, এরপরও তিনি তাঁর লেখনী ও শিষ্যদের মাধ্যমে আমাদের মাঝে বেঁচে থাকবেন।

স্যারের এই আনুষ্ঠানিক জীবন বৃত্তান্তের বাইরেও তাঁর ব্যক্তি জীবনের উপর আলোকপাত করা প্রয়োজন। কারণ শুধু আনুষ্ঠানিক পরিচয় দিয়ে ব্যক্তি সম্পর্কে খুব কমই জানা যায়। স্যারের সাথে এ নিবন্ধকারের সম্পর্ক দশ বছরের। এর মধ্যে অনেকটা ঘনিষ্ট যোগাযোগ পরবর্তী বছরগুলোতে। অনেকেই আছেন, যাদের সাথে স্যারের সম্পর্ক দীর্ঘ কয়েক যুগের। এরপরও স্যারের চরিত্রের নানা দিক খুবই সংক্ষেপে আমি নিজে যতটুকু বুঝেছি ও দেখেছি তুলে ধরছি:

সবার প্রথমেই আসে পাঠদানের কথা। এক্ষেত্রে অধ্যাপক আব্দুল মালেক স্যার পুরোনো যুগের আলিমদের রীতি অনুসরণ করতেন। অর্থাৎ পড়ানোর সময় সরাসরি মূল গ্রন্থ নিয়ে আসতেন সাথে করে। কোনো ধরনের নোট, গাইড বা বাংলা লেখা আনতেন না। এক হাতে মাইক্রোফোন মুখের কাছে ধরে অত্যন্ত দুর্বোধ্য বিষয়ও সাবলীলভাবে পড়িয়ে যেতেন। সাধারণত বিভাগের সবচেয়ে জটিল কিতাবটিই তাঁকে পড়াতে দেওয়া হতো। সবার আস্থা ছিল বলেই এমন ছিল। সবাই জানতেন এই কিতাব যথাযোগ্য হক আদায় করে তিনিই পড়াতে পারবেন।

বছর দুয়েক আগে তিনি নিবন্ধকারের কাছে আক্ষেপ করে বলেছিলেন, কাশশাফ আর পড়াবেন না। কারণ হিসেবে বলেছিলেন, এখন আর শরীর আগের মতো সায় দেয় না। কারণ ৪০ মিনিটের একটি ক্লাসের জন্য তিনি দীর্ঘ সময় ধরে যে মুতাআলা করতেন, তা করার মতো সময় এখন আর পাচ্ছেন না।

তিনি কখনও নিজের জানাটাকে যথেষ্ট মনে করতেন না। দীর্ঘদিন ধরে কাশশাফ-বায়যাভীর মতো জটিল সব তাফসীর পড়িয়েও ভাবতেন, এই তাফসীরের আরও কোনো কোনো দিক হয়তো অজানা রয়ে গেছে। শিক্ষার্থীদের হক হয়তো আদায় হচ্ছে না। আমার তখন এই ভেবে আফসোস হচ্ছিল, স্যার যা পড়াচ্ছেন, তা ধারণ করার মতো যোগ্যতা কি শিক্ষার্থীদের আছে?

পাঠ্যগ্রন্থ যখন পড়াতেন, তখন তাঁর ভেতরকার অনুপম আখলাক, তাকওয়া, নবীপ্রেম ইত্যাদি ফুটে উঠত। সূরা নূরের তাফসীর পড়ানোর সময় আয়িশা (রা.) এর ঘটনা বলতে গিয়ে কখনও কখনও কেঁদেও ফেলতেন তিনি।

অধ্যাপক মুহাম্মদ আব্দুল মালেক স্যার সবসময় শিক্ষার্থীদের 'আপনি' বলে সম্বোধন করতেন। পুরো বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে কজন শিক্ষার্থী এমন শিক্ষক পেয়েছেন, তা গবেষণার দাবি রাখে। কখনও কখনও শিক্ষার্থীদের গ্রেট মাওলানা এন্ড স্কলার্স বলে সম্বোধন করতেন। বলতেন আপনারা জুনিয়র স্কলার।

তাঁর বাসায় যে গিয়েছে তাঁকেই তিনি এমনভাবে আপ্যায়ন করতেন যে, তাতে অতিথিরই লজ্জায় পড়তে হতো। নিজেই বাসার ভেতর থেকে ট্রেতে করে হরেক রকম খাবার নিয়ে আসতেন। অতিথি খেতে না চাইলে একরকম শাসন করে হলেও খাওয়াতেন।

বৃদ্ধ বয়সেও যখন তাঁর কৃত্রিম পেসমেকারে হৃদস্পন্দনের গতি ধীর হয়ে এসেছে, তখনও পাঁচ তলা থেকে নেমে মসজিদে জামাআতে শরীক হতেন।

লেনদেনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত স্বচ্ছ ছিলেন। আমরা কতবার কলাভবনের নিচতলায় তাঁর জন্য রিকশা ডেকেছি। তাঁর ব্যাগ আর লাঠিটা নিয়ে দাঁড়িয়েছি। তিনি রিকশায় উঠে বাসায় রওয়ানা হয়েছেন। আমাদের শত অনুরোধেও এ পর্যন্ত কেউ তাঁকে রিকশা ভাড়া দিয়ে দিতে পেরেছে বলে আমার মনে হয় না। তাঁর সাথে যারাই কাজ করেছেন, তাদেরকে পাই পাই হিসাব বুঝিয়ে দিতেন।

তাঁর চরিত্রের একটা দিক হলো আত্মমর্যাদাবোধ। কখনও কোনো প্রয়োজন পড়লেও তা তাঁর একান্ত ঘনিষ্ঠজন ছাড়া কেউ জানতে পারত না। তিনি পেনশনের প্রাপ্ত অর্থ আর সমস্ত সঞ্চয়ের সিংহভাগ তাঁর গ্রামের মসজিদ নির্মাণে ব্যয় করেছিলেন, আমার বিশ্বাস তাও তার একান্ত কাছের কয়েকজন ছাড়া কেউ জানে না।

একাকী যখন তাঁর বাসার বৈঠকখানায় অথবা বিভাগে তাঁর নিজস্ব রুমে বসার সুযোগ হতো, পুরোনো দিনের নানা কথা বলতেন। পঞ্চাশ, ষাট, সত্তর বছর আগের যেসব মানুষের স্মৃতিচারণ তিনি করতেন, তাঁরা বহু আগেই গত হয়েছেন। এসব বিষয় বইয়েও আর পাওয়া যায় না। একদিন অনেক কথা হলো। স্যার তখন তাঁদের শিক্ষক শায়খ আবদুর রহীম ছাহেবের নাম বললেন। বিরাট বড় মাওলানা। প্রচলিত প্রায় সমস্ত বিদ্যাই তাঁর হস্তগত ছিল। তাঁর আসল বাড়ি ছিল মুর্শিদাবাদে। কোর্ট-এ প্র্যাকটিস করতেন। একবার জনৈক জমিদারের বিপক্ষে গরীব এক হিন্দু প্রজা তাঁর সাহায্যপ্রার্থী হলেন। তিনি ভাবলেন, গরীব মানুষ, সাহায্য করতেই হয়। শর্ত দিলেন, যা বলবো তোমাকে তাই শুনতে হবে। প্রথম কথা হলো গোঁফদাড়ি, চুল এসব কাটা যাবে না। বড় হোক ধীরে ধীরে। কোর্ট-এ কিছুদিন পর মামলা ওঠার পর তিনি বললেন, মাই লর্ড। এর অবস্থা তো দেখতেই পাচ্ছেন। এ নিতান্তই নিরীহ গোবেচারা। দেখেন না দাড়ি-চুলের কী অবস্থা। ব্যাস। মামলা খতম। নিরীহ (!) প্রজা জিতে গেল। এদিকে ওকালতির উপর থেকেও ওনার মন উঠে গেল। যে পেশায় মিথ্যা না বললে চলছে না, তাতে আর না। তিনি শিক্ষকতায় ঢুকলেন- আমাদের ঢাবির ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে।

এককথা দুকথা- এরপর পড়ল ছারছীনা মাদরাসার কথা। নিছারুদ্দীন (র.) কে স্যার ছোটবেলায় দেখেছেন। বললেন, দাদা হুযূর নিছারুদ্দীন (র.) আকর্ষণীয় চরিত্রের একজন মানুষ ছিলেন। নামাযের সময় ছাড়া সারাদিন বইপত্র নিয়ে সময় কেটে যেত। তিনি যখন খানকা থেকে বের হতেন, চারপাশে লোকজন ঘিরে থাকত। কখনও কখনও তাঁর দু'ছেলে সাথে থাকতেন। কখনও অন্যরা।

যখন বাথরুমে যেতেন, আলাদা একটি সেলাইবিহীন লুঙ্গি পরে যেতেন। এরপর মোড়ায় বসে উযূ করতেন। একটি বড় কেতলি ছিল। সেখান থেকে পানি ঢালা হতো। আগে মিসওয়াক করতেন। মজার ব্যাপার হলো, মিসওয়াক করার আগে সময় নিয়ে মিসওয়াক ঝাড়তেন- কোন পিঁপড়া যেন মারা না যায়। অনেক সময় মিসওয়াকে পিঁপড়া জমা হয়।

স্যারের বিনয়ের কথা না বললেই নয়। প্রবাদ আছে, ফলবান বৃক্ষ ফলের ভারে নুয়ে পড়ে। জ্ঞান আর প্রজ্ঞায় বিনয়ের ভারে অধ্যাপক আব্দুল মালেক স্যার ঠিক সেভাবেই বিনম্র হয়ে জীবন কাটিয়ে গেছেন। তাঁর ইন্তিকালের কয়েক দিন আগের কথা। অধ্যাপক আব্দুর রশীদ স্যারের আব্বা ইন্তিকাল করেছেন। রাত প্রায় সাড়ে বারোটা। আব্দুল মালেক স্যার পাশেই একটি চেয়ারে বসে আছেন। সেন্ট্রাল মসজিদের খতিব সাহেবও এসেছেন। তিনি স্যারের পাশে দাঁড়ানো ছিলেন। স্যার ঐ কঠিন মুহূর্তেও খতিব সাহেবকে বললেন, আপনি বসুন। আমি দাঁড়াই। খতিব সাহেব তাঁর নাতি ছাত্রেরও ছাত্রের বয়সি। তিনি অত্যন্ত বিব্রত হয়ে বললেন, কি বলছেন স্যার। আপনি বসুন।

একজন আদর্শ শিক্ষক যে শুধু ক্লাসরুমেই শিক্ষক নন, বরং জীবনের প্রতিটা পর্যায়ে সবসময় তাঁর থেকে শেখার আছে, তা স্যারের জীবন থেকে আমরা পদে পদে শিখেছি। আল্লাহ তাআলা স্যারের কবরকে আলোকিত করে দিন। আমীন।

শ্রমের মর্যাদায় ইসলাম

মাহফুজ আল মাদানী

মানুষের জীবনের উন্নতির উচ্চশিখরে আরোহণ করার মূল হচ্ছে তার পেশা ও কর্মদক্ষতা। মানব জাতির অস্তিত্ব, প্রগতি, সভ্যতা ও উন্নয়ন সবকিছুর মূলে রয়েছে শ্রম। এটাই জীবিকা নির্বাহের অন্যতম উপায়। আল্লাহ বলেন, "নিশ্চয়ই আমি মানুষকে শ্রম নির্ভররূপে সৃষ্টি করেছি।" (সূরা আল বালাদ, আয়াত-০৪)

যে যত বেশি পরিশ্রমী, সে তত বেশী সফলকাম। তা যেকোনো পর্যায়ের শ্রম হোক না কেন। শিক্ষার্থী পরিশ্রমী হলে তার ফলাফল হয় সেরা। একজন কৃষক তার কৃষি কাজে সময়মতো শ্রম প্রয়োগ করলে সেও লাভবান হয়। তেমনিভাবে প্রত্যেক ক্ষেত্রে যে যত শ্রম ব্যয় করবে সে তত সফল হবে। এজন্যই তো বলা হয়, 'পরিশ্রম সৌভাগ্যের প্রসূতি'।

মানুষের জীবিকা অর্জনের প্রধান উপায় হচ্ছে শ্রম। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, 'আর এই যে মানুষ তা-ই পায় যা সে করে। আর তার কর্ম অচিরেই দেখানো হবে; অতঃপর তাকে দেওয়া হবে পূর্ণ প্রতিদান' (সূরা নাজম, আয়াত-৩৯, ৪১)। তাছাড়া মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বান্দাকে ইবাদত বন্দেগি শেষে জমিনে ছড়িয়ে পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন কাজ তথা শ্রম ব্যয় করার জন্য। আল্লাহ বলেন, 'অতঃপর যখন নামায সমাপ্ত হয়, তখন তোমরা (জীবিকা উপার্জনে) জমিনে ছড়িয়ে পড়ো' (সূরা জুমুআ, আয়াত-১০)। আল্লাহ এই আদেশ প্রদান করেছেন বান্দাহ যাতে হালালভাবে রিজিক অন্বেষণ করে এবং হালাল তথা পবিত্র রিজিক হতে পানাহার করে। হালাল রিজিক অর্জনে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন। মহান আল্লাহ তাআলার বাণী, 'হে মানবজাতি! পৃথিবীর হালাল ও পবিত্র বস্তু-সামগ্রী ভক্ষণ করো। শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিঃসন্দেহে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু' (সূরা বাকারা, আয়াত-১৬৮)। হাদীস শরীফেও এ বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ হযরত সা'দ (রা.) কে বলেছেন, 'হে সা'দ! তোমার খাদ্য হালাল বানাও, তাহলে মুস্তাজাবুত দাওয়াত হতে পারবে'। আমাদের পানাহার হালাল হলে সমাজে বিরাজ করবে জান্নাতী পরিবেশ। আমাদের সকলের আদর্শ প্রিয় নবী ﷺ হালাল উপার্জন করার জন্য বিশেষভাবে তাগিদ প্রদান করেছেন। হাদীসের ভাষ্যানুযায়ী, 'হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, ফরয ইবাদত আদায়ের পর হালাল রুজি উপার্জন করা ফরয' (বায়হাকী)। আমাদের উচিত প্রিয় নবীর আদর্শ অনুকরণের মাধ্যমে হালাল বা বৈধ উপায়ে রিযিক অন্বেষণ করে সমাজকে আদর্শবান হিসেবে গড়ে তোলা। যা হবে আমাদের বসবাস উপযোগী। হালাল উপার্জনের পাশাপাশি হারাম অর্জন থেকে বিরত থাকার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। হারাম উপার্জনকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মন্দ কাজ বলে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহর বাণী, 'আর আপনি তাদের অনেককে দেখবেন যে, দৌড়ে দৌড়ে পাপে, সীমালঙ্ঘনে এবং হারাম ভক্ষণে পতিত হয়। তারা অত্যন্ত মন্দ কাজ করছে' (সূরা মায়িদা, আয়াত-৬২)। হারাম উপায়ে উপার্জন এবং তা হতে ভক্ষণ অবশ্যই মন্দ এবং ঘৃণিত কাজ।

এতে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, উপার্জন তথা শ্রম ব্যয় নিঃসন্দেহে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এজন্যই নবী করীম ﷺ নিজের শ্রমে অর্জিত উপার্জনকে উত্তম বলে আখ্যা প্রদান করেছেন। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন,'কারও জন্য নিজ হাতের উপার্জন অপেক্ষা উত্তম আহার্য বা খাদ্য আর নেই। আল্লাহর নবী হযরত দাউদ (আ.) নিজ হাতের কামাই খেতেন' (বুখারী ও মিশকাত)। আমাদের প্রিয় নবীও নিজে শ্রম দিয়ে কাজ করেছেন। হাদীস শরীফের ভাষ্যানুযায়ী, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ দুনিয়াতে এমন কোন নবী পাঠাননি যিনি ছাগল ও ভেড়া চরাননি। তখন সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন, হে রাসূল ﷺ আপনিও? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, হ্যাঁ! আমিও কয়েক কীরাতের বিনিময়ে মক্কাবাসীদের ছাগল ও ভেড়া চরাতাম। (বুখারী, হাদীস নং ১৩৪০)

ইসলামী বিধানে শ্রমিক, চাষী এবং অন্যান্য শ্রমজীবীকে কেউ বিনা পারিশ্রমিকে খাটাতে পারবে না। ন্যায়সঙ্গত যথার্থ পারিশ্রমিক তাদের দিতেই হবে। তাই ইসলামের নির্দেশনা অনুসারে শ্রমিকের কাজের ফল বা মজুরি কিংবা পারিশ্রমিক যথাযথ দেওয়া এবং কোন রকম যুলম-অন্যায়, নিপীড়ন, শোষণ বা বঞ্চনার প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন, 'প্রত্যেকের মর্যাদা তার কাজ অনুযায়ী, এটা এজন্য যে, আল্লাহ প্রত্যেকের কর্মেও পূর্ণ প্রতিফল দিবেন এবং তাদের প্রতি অবিচার করা হবে না' (সূরা আহকাফ, আয়াত-১৯)। হাদীস শরীফে কাজের মজুরি প্রদানের গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। শ্রমিকের মজুরি দেওয়ার জন্য কঠোরভাবে নির্দেশ প্রদান করে রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, 'শ্রমিকের শরীরের ঘাম শুকানোর আগেই তার মজুরি দিয়ে দাও'। পাশাপাশি মানুষের শ্রম করার অধিকার অত্যন্ত পবিত্র ঈমানী দায়িত্ব এবং এ অধিকার নারী-পুরুষের জন্য সর্বতোভাবে সমান মৌলিক অধিকার ও কর্তব্য হিসেবে স্বীকৃত। নিজের পছন্দমতো বৈধ ও আইনসম্মত যে কোনো পন্থায় শ্রম করা প্রতিটি মানুষের পূর্ণ স্বাধীনতা সহকারে মর্যাদাসম্পন্ন অধিকার। প্রত্যেকেই তার শ্রমের গুরুত্ব ও মর্যাদা অনুসারে মজুরি পাওয়ার অধিকার রাখে। কেউ অতিরিক্ত বা অতি উত্তম কাজ করলে তারও মজুরি বা সেজন্য ঘোষিত পুরস্কার পাওয়ার অধিকারও অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন, 'কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা দেখবে এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও দেখবে'। (সূরা যিলযাল, আয়াত-৭,৮)

রাসূল ﷺ শ্রমিককে মজুরি দান করার পরও তাকে লাভের অংশ দেওয়ার জন্য উপদেশ দিয়ে বলেছেন, 'কর্মচারীদের তাদের কাজের লভ্যাংশ দাও। কেননা আল্লাহর শ্রমিকদের বঞ্চিত করা যায় না' (মুসনাদে আহমদ)। মজুরি না দেওয়া বা কাজ অনুপাতে মজুরি কম দেওয়াও ইসলামে নিষিদ্ধ। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, 'তিন ব্যক্তির ওপর আল্লাহ কিয়ামতের দিন অসন্তুষ্ট হবেন। তাদের একজন হচ্ছে যে ব্যক্তি কোনো শ্রমিক নিযুক্ত করে তার দ্বারা পূর্ণ কাজ করিয়ে নেয়ার পর তার মজুরি দেয়নি' (বুখারী)। ইসলাম একমাত্র ধর্ম যা শ্রমের সঠিক মর্যাদা এবং শ্রমিকের সঠিক মূল্যায়ন করেছে।

একজন নওমুসলিমের অভিব্যক্তি

আযান আমার হৃদয়কে জাগিয়েছে

ইসলাম শাশ্বত জীবনব্যবস্থা। যেখানে সূফী দরবেশগণ তাদের খানেকা স্থাপন করেছেন সেখানেই দলে দলে লোক ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। সম্প্রতি বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীসহ কয়েকজন যুবক ও তরুণের ইসলামগ্রহণ বেশ আলোচিত হয়েছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এমন একজন কথা বলেছেন ***মাসিক পরওয়ানার*** *সঙ্গে। যার চুম্বক অংশ নিবন্ধ আকারে তুলে ধরা হলো। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন* ***মোহাম্মদ কামরুজ্জামান।***

আমাদের বাড়ি থেকে আযান শুনা যায়। মুয়াজ্জিনের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে আযানের বাক্যগুলো উচ্চারণ করতাম। কাজটা নিছক ছেলেমানুষি ছিল। এভাবে এক সময় আযানের বাক্যগুলো মুখস্থ করে ফেলি। একদিন লক্ষ করলাম আযানের বাক্যগুলো অনেকটা ছন্দময়। কখনও একাকী থাকলে সুর করে আযানের আবৃত্তি করতাম। আমার বন্ধুদের প্রায় সকলেই মুসলিম। তাদের নামায পড়া আমার কাছে ভালো লাগত। একসময় মনে হয় নামায অন্য যেকোনো ধর্মের উপাসনার চেয়ে ভালো। হয়তো নামাযের কোনো অর্থ রয়েছে। আমি আমার পিতৃধর্ম নিয়ে এমন কিছু বলব না যাতে আমার স্বজনরা কষ্ট পান। তবে ছোটবেলা থেকে আকৃতিবিশিষ্ট প্রভুর উপাসনা আমাকে তৃপ্ত করত না। আমি যেভাবে স্রষ্টাকে কল্পনা করতাম মনে হতো এ আকৃতি তার নয়। এটা থেকে এক সময় উপাসনালয়ে যাওয়া বন্ধ করি।

একদিন একজন মুসলমানের লাশ কবরস্থ করতে দেখি। মনে হলো একটি মৃতদেহের প্রতি যথার্থ সম্মান দেখানো হচ্ছে। শবে বরাতে স্বজনের কবরের পাশে দাঁড়িয়ে কান্নাকাটি করে একজনকে মোনাজাত করতে দেখি। যা আমার ভাবনার দুয়ার খুলে দেয়। ইসলামের প্রতিটি আচার অনুষ্ঠানে আছে ভিন্নতা, রয়েছে তাৎপর্য। ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময়ের রীতি আমাকে মুগ্ধ করে। সবকিছুতে এক শুভ্রতা ও স্বচ্ছতা দেখতে লাগলাম। এক স্বজনের সৎকার আমার জন্য ছিল খুব কষ্টদায়ক। তবুও রীতি অনুযায়ী কাজটি করতে হয়েছিল। মনে হয়েছিল আমার দ্বারা এমনটি করা উচিত হয়নি। খোলাসা করে সব বলতে পারব না। আমার কান্না আসছে।

কোথাও পড়েছিলাম ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। চলার পথে প্রতিক্ষেত্রে এটা অনুভব করতে থাকি। গাড়িতে উঠলে দুআ লেখা দেখি। ভবনের সিড়ি ওঠানামার জন্যও দুআ আছে। দৈনন্দিন জীবনের প্রতিক্ষেত্রে ইসলামের নির্দেশনা রয়েছে। সামাজিক, পারিবারিক যেকোনো সমস্যা সমাধানের জন্য আমাদেরকে রাষ্ট্রীয় আইন খুঁজতে হয়, অথচ ইসলামে সব বিষয়ে বিধান রয়েছে। ব্যবসা, বাণিজ্য ও দান দক্ষিণার জন্যও ইসলামের বিধান রয়েছে। এমন কোনো বিষয় নেই যে বিষয়ে ইসলামের বিধি নিষেধ নেই। আমার ধারণা প্রবল হতে থাকে, ইসলাম আসলেই পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা।

এসব ভাবনা থেকে এক সময় অনুভব করতে লাগলাম স্রষ্টা একজন। নিরাকার স্রষ্টার প্রতি আমার বিশ্বাস দৃঢ় হতে থাকে। দিনদিন ইসলাম ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে ওঠি। আমার অধিকাংশ বন্ধু মুসলিম। আযান হলেই তাদেরকে নামাযে যেতে বলতাম। মুসলিম বন্ধুদের নামাযের প্রতি খুব গুরুত্ব দিতাম। মনে হতো নামায একটি অর্থবহ প্রার্থনা। সুযোগ পেলেই নামায পড়া দেখতাম। লক্ষ করি নামাযের প্রতিটি পদক্ষেপে রয়েছে বিনয়ের ছাপ। যা আমার উপাসনায় পেতাম না। মনে হতে লাগল, আমিও যদি এভাবে নামায পড়তে পারতাম। স্কুলে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের একটি কবিতা পড়েছিলাম- 'তিমির রাত্রি এশার আযান শুনি দূর মসজিদে। প্রিয়হারা কার কান্নার মতো এ বুকে আসিয়া বিঁধে।' আমি খুব পড়ালেখা করা মানুষ নই। কিন্তু আযান নিয়ে এ পংক্তিটি আমার অনুভূতির সাথে মিলে যায়। রাত শেষে ফজরের আযান হলে আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়। বুকের ভেতর গভীর শূন্যতা অনুভব করি। আযান কেবল আমার ঘুম ভাঙায়নি, আমার ঘুমন্ত হৃদয়কে জাগিয়েছে। আযান কেবল নামাযের আমন্ত্রণ নয়, এ যেন একত্ববাদের প্রতি আহ্বান।

একক স্রষ্টায় বিশ্বাস ও নবী মুহাম্মদ ﷺ এর প্রতি গভীর ভালোবাসা উপলব্ধি করতে লাগলাম। আল্লাহু আকবার ও মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতে প্রশান্তিবোধ করি। তাহলে সংকোচতা কিসের। আমি বিশ্বাস করি স্রষ্টা একজন। এটা প্রকাশ করতে দ্বিধা কোথায়? ধর্মীয় স্বাধীনতা তো মৌলিক অধিকার। আর দেরি করা উচিত নয়। পড়ে নিলাম- লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ।

আমার বাবা পাঁচ বছর আগে গত হয়েছেন। পরিবারে আমার মা ও ভাই রয়েছেন। তাদেরকে আমার বিশ্বাসের কথা বলি। তারা আমাকে সমর্থন করেননি। বন্ধু বান্ধবের সাথে স্রষ্টার আস্তিত্ব নিয়ে আলোচনা করি। অনেকেই একমত হয় স্রষ্টা নিরাকার। কিন্তু পরিবার পরিজনের কথা ভেবে কেউ সিদ্ধান্ত নিতে রাজি হয় না। ধর্ম ত্যাগ করলে পরিবার ত্যাগ করতে হবে। আমিও সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলাম না। অবশেষে মনে হলো, ধর্ম একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। ধর্ম ত্যাগ করলে কেন মাকে ত্যাগ করতে হবে? আমি যদি মায়ের সকল দায়িত্ব আদায় করি তাহলে ধর্ম পরিবর্তনে দোষ কোথায়? মুসলিম হয়ে গেলে হয়তো বাড়িতে খুব যাওয়া হবে না। ঠিক করলাম, মাসে যা রোজগার করি তার কিছু অংশ বাড়িতে পাঠাব।

প্রায় একবছর আগে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিই। রুমের দরজা বন্ধ করে একাকী নামায পড়তে শুরু করি। আনুষ্ঠানিকভাবে ইসলাম গ্রহণের জন্য আমি একটি বিশেষ সময় খুঁজছিলাম। জানলাম রামাদান মাস সবচেয়ে ভালো সময়। কয়েকজন বন্ধুকে এফিডেভিট করার কথা বলি। তারা জানতে চায় এটা স্বতঃস্ফূর্ত সিদ্ধান্ত কিনা। আমি আমার দৃঢ়তার কথা জানাই। রামাদানের প্রথমদিকে কোর্টে এফিডেভিট করে নিই। জুমুআবারকে মুসলিম হিসেবে আত্মপ্রকাশের দিন হিসেবে বেছে নিলাম। কেননা দিনটি আমার জীবনে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

নাম পরিবর্তনের ব্যাপারটা আমি খুব উপভোগ করেছি। নিজের পছন্দমতো নাম গ্রহণের সুযোগ কজন পেয়ে থাকে। এক্ষেত্রে বিশেষ এক নামাযের নামকে পছন্দ করি। কেননা এই নামাযই আমাকে মুসলিম হতে প্রেরণা যোগায়। তবে এই কাজে আমার এক ঘনিষ্টজন সাহায্য করেছেন। বলতে পারি নামটা তারই দেওয়া। রামাদান মাসকে পছন্দ করার আরেকটি কারণ আছে। মুসলিমদের এ মাসের কার্যপ্রণালি খুব সুন্দর। কেবল একটি উপাসনার জন্য মানুষের অভ্যাসের পরিবর্তন হয়। এ মাসে অপরাধ কমে যায়। এটা খুব গভীর একটি বিষয়।

প্রথম রামাদান থেকে রোযা রাখছি। কী গভীর তৃপ্তিবোধ করছি। নামায পড়াটাও খুব অনুভব করছি। একজন ইমাম সাহেব আমাকে নামাযের সূরা ও তাসবীহ শেখাচ্ছেন। পাশাপাশি আরবী হরফও পড়ছি। হরফ পরিচয় করতে পারলে কুরআন শরীফ পড়তে পারব। যে মহাগ্রন্থের সুর আমার হৃদয়ে প্রশান্তি যোগায়।

স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ইসলামী নির্দেশনা

আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

-হে মানবজাতি! তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য এসেছে উপদেশ, অন্তরের শিফা, হিদায়াত এবং মুমিনদের জন্য রহমত। (সূরা ইউনুস, আয়াত-৫৭)

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

-আর আমি নাযিল করেছি কুরআন, যা মুমিনদের জন্য শিফা ও রহমত। কিন্তু তা যালিমদের জন্য কেবল অনিষ্টতাই বৃদ্ধি করে। (সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত-৮২)

ইসলামে স্বাস্থ্য সচেতনতার প্রক্রিয়া

চিরন্তন ও মহীয়ান সত্তা আল্লাহ কুরআনকে অসুস্থ ব্যক্তির শিফার জন্য তিলাওয়াতের পাশাপাশি আরও বিস্তীর্ণ করেছেন। এই সমৃদ্ধ ভাণ্ডার থেকে আমরা কুরআনিক চিকিৎসার অগণিত উৎস পাই। এখানে তার কিয়দাংশ আলোচনা করা হলো।

কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদীসে সাব্যস্ত ইসলামের সব নির্দেশনা প্রতিষেধক চিকিৎসার ফায়দা দেয়। যেমন, কুরআন-হাদীস পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে অনেক গুরুত্বারোপ করে। শরীরের পবিত্রতা অর্জন ছাড়া নামাযের মতো বড় ইবাদত গ্রহণযোগ্যই হয় না। জানাবাত এর পর আল্লাহ গোসল করা আবশ্যক করেছেন। তেমনি মহিলাদের ঋতুস্রাব শেষে গোসলকে পবিত্র হওয়ার মাধ্যম বানিয়েছেন। রাসূল ﷺ প্রতি জুমুআর দিন গোসল করা পছন্দ করতেন (এই পছন্দ শরীআতে সুন্নাত বিবেচিত)। নামাযের জন্য মনোনিবেশকারী ব্যক্তির যদি প্রস্রাব, পায়খানা বা বাতাস নির্গত হওয়ার মাধ্যমে উযূ চলে যায়, তাহলে তার জন্য উযূকে অনিবার্য করেছেন। হাত-পা, মুখসহ শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধোয়ার পাশাপাশি মাথা পানি দিয়ে মোছা উযূর অন্তর্ভুক্ত। শরীআত নির্দেশনা দেয় রাতের ঘুম থেকে ওঠার পর দুই হাত ধৌত করতে। খাওয়ার সময় হাত ধৌত করাকে উৎসাহ দেয়। প্রস্রাব-পায়খানা শেষে পাক হতে বিশ্বাসীরা এ প্রাকৃতিক প্রয়োজন সেরে সম্পৃক্ত অঙ্গ ভালোভাবে পরিষ্কার করেন। এই কল্যাণকামী বিধান নখ ও চুল কাটা, বগল ও নাভির নিচের পশম উপড়ে ফেলা ও মুণ্ডন করার আদেশ করেছে। আদেশ করেছে পুত্র সন্তানের খতনাকেও।

রাসূল ﷺ মিসওয়াক দিয়ে মুখ পরিষ্কার করার তাকীদ দিয়েছেন। তিনি বলেন, মিসওয়াক হলো মুখ পরিষ্কারকারী এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যম। ব্যক্তিকে অবকাশ যাপনের স্থান ও ঘর পরিচ্ছন্ন রাখতে গুরুত্বারোপ করেছেন। রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরাতে নির্দেশ করেছেন। মানুষের যাতায়াতের পথ, বসার স্থান এবং পানি উত্তোলনের ক্ষেত্রে কষ্ট দেওয়াকে কঠিনভাবে নিষেধ করেছেন।

রাসূল ﷺ মহামারিতে আক্রান্ত এলাকায় প্রবেশ করতে নিষেধ করেছেন। যারা আক্রান্ত এলাকা বা বসতিতে আছেন, তাদেরকেও বের হতে মানা করেছেন। আর এটিই হলো মহামারিতে দ্রুত ছড়িয়ে যাওয়া রোগ প্রতিরোধের সর্বোত্তম পন্থা। বর্তমান সময়ে এটিকেই কোয়ারেন্টিন বা সংগনিরোধ বলা হচ্ছে।

আমাদের খাবারের বেলায় পবিত্র খাবার ও পানীয় গ্রহণ করার বিধান করেছেন। ক্ষতিকর খাদ্য খেতে নিষেধ করেছেন। নিষেধ করেছেন খাবারে অপচয়কে। হারাম করেছেন মৃত পশু, প্রবাহিত রক্ত এবং শোকরের গোশতকে। যেমনভাবে হারাম করেছেন মদ ও নেশাদ্রব্যকে। বিবাহের বিধান রেখে ব্যভিচার ও সমকামিতাকে করেছেন নিষিদ্ধ।

ইসলামী নির্দেশনার অনুসরণ সুস্থতা নিশ্চিত করে, দেহকে সুরক্ষিত রাখে এবং রোগ-বালাই প্রতিহত করে। আনুগত্যকারীরা ইসলামের বিধানাবলিতে পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা পান, যার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা মানুষকে অধিকাংশ অসুখ থেকে দূরে রাখেন। ইসলামী পণ্ডিতগণ কুরআন-হাদীসের বিধানের উপর গবেষণা করে ধর্মের এ মূল বার্তা বুঝতে সক্ষম হয়েছেন যে, ইসলামী জীবন বিধান মানুষের শান্তি কামনা করে এবং অনিষ্টতা থেকে মুক্ত করতে চায়; এ জীবন বিধানের নির্দেশনা মানুষের ধর্ম, জীবন, মন, পরিবার ও সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিতের লক্ষ্যেই পরিচালিত হয়।

চিকিৎসাশাস্ত্র

চিকিৎসাশাস্ত্র মানবজীবনে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান হিসেবে গণ্য হয়। এ শাস্ত্রের কল্যাণ ও উপকারিতা অনেক। চিকিৎসাবিদ্যার সঠিক প্রয়োগ মানুষের শরীর সুস্থ রাখে এবং দেহের বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ করে। মুসলমানরা এ শাস্ত্রের সুফল ভোগ করে আল্লাহর আনুগত্য ও সন্তুষ্টি লাভের দিকে ধাবিত হয়।

সমাজে চিকিৎসকের বিচরণ থাকা জরুরী। এই প্রয়োজনীয়তার হার এলাকা এবং অবস্থাভেদে ভিন্ন হয়। যখন চিকিৎসকরা সমাজের চাহিদার যোগান দিতে না পারেন, তখন মানুষের জীবনে রোগ, যুদ্ধবিগ্রহের ক্ষত ও নতুন জীবাণুর প্রাদুর্ভাবে জর্জরিত হয়ে যায়। যার কারণে অনেকে মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়ে কিংবা বড় ধরনের ক্ষতির স্বীকার হয়। এজন্য আমাদের ইসলামী জীবন বিধানের নির্দেশনা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সৃষ্টির প্রতি দয়া, কষ্ট দূর করা এবং তাদের আঘাত প্রতিহত করার প্রতিরোধী ব্যবস্থার আদর্শে। ইসলাম ধর্ম এ কল্যাণময়ী নীতিমালা নিয়ে এসেছে। মুসলিম সমাজেও এইসব বর্ধনশীল প্রাকৃতিক সমস্যার সমাধান থাকা অপরিহার্য। তাই ইসলাম ধর্ম চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়নেরও বিধান দিয়েছে।

আল্লামা নববী (র.) বলেন,

وأما العلوم العقلية، فمنها ما هو فرض كفاية كالطب والحساب المحتاج إليه

-আর বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞান যার অনেকগুলোই ফরযে কিফায়া (ফরযে কিফায়া এমন আবশ্যক হুকুম, যা কতিপয়ের অংশগ্রহণে প্রয়োজন সেরে গেলে আদায় হয়ে যায়। কিন্তু চাহিদার কাজ না সারলে সবাই গুনাহগার হয়)। যেমন, প্রয়োজনীয় চিকিৎসাবিদ্যা এবং গণিতবিদ্যা।

ইমাম গাযালী (র.) বলেন,

ولا يستبعد عدُّ الطب والحساب من فروض الكفاية، فإن الحرَف، والصناعات التي لابد للناس منها في معايشهم كالفلاحة فرض كفاية، فالطب والحساب أولى

-চিকিৎসাশাস্ত্র এবং গণিতশাস্ত্র ফরযে কিফায়ার অন্তর্ভুক্ত। যেহেতু মানুষের জীবন পরিচালনায় সম্পৃক্ত কারুশিল্প ও অন্যান্য শিল্পকর্ম কৃষিকাজের মতো ফরযে কিফায়া, এ কারণেই চিকিৎসাশাস্ত্র ও গণিতশাস্ত্র আরও উত্তমরূপে ফরযে কিফায়া হবে।

এখানে ইমাম নববী (র.) এর বক্তব্যে, المحتاج إليه (প্রয়োজনীয় জ্ঞান) কথাটি উল্লেখ রয়েছে। এই বক্তব্যের মাঝেই প্রমাণ রয়েছে যে, প্রয়োজনীয় উপকার নেয়ার আবশ্যকতার আলোকে চিকিৎসাশাস্ত্রের হুকুম ফরযে কিফায়া হবে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, সকল যুগে সকল স্থানে চিকিৎসার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সময় ও অবস্থার ভিন্নতায় অপরিহার্যতার হারে তারতম্য হয়েছে। আমরা দেখতে পাই, ইসলামী আইনবিদ ও জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিতগণকে তাদের কিতাবে এ শাস্ত্রকে ফরযে কিফায়া বলে অবিহিত

করেছেন। এ হুকুম প্রদানেই শেষ নয়, এমনকি ইমাম শফিঈ (র.) বলেন,

لا أعلم علماً بعد الحلال والحرام أنبل من الطب

-হালাল-হারাম জ্ঞান অর্জনের পরে চিকিৎসাশাস্ত্রের চেয়ে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান সম্পর্কে আমি জানি না।

রাসূল ﷺ বলেছেন, أنَّ لكل داء دواء، فإذا أصيب الداء برأ بإذن الله عز وجل -নিশ্চিতভাবে সকল রোগের ঔষধ রয়েছে। যখন সে ঔষধ সঠিকভাবে ব্যবহার হয়, তখন আল্লাহর ইচ্ছায় আরোগ্য এসে থাকে।

রাসূল ﷺ আরও বলেন, ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء -আল্লাহ তাআলা চিকিৎসাহীন কোনো অসুখ দেন না।

উল্লিখিত পবিত্র হাদীসদ্বয় প্রমাণ করে, এমন রোগ নেই যার চিকিৎসার উপাদান আল্লাহ সৃষ্টি করেন নাই। রোগ-বালাইয়ের ক্ষেত্রে বিষয়টি এমন হওয়ায় মানুষের জন্য বিধান রয়েছে অসুখের কার্যকরী ঔষধ ব্যবহারের নির্দেশনামত গ্রহণ করা।

হযরত উসামা ইবনু শুরাইক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطير، فسلمت ثم قعدت، فجاء الأعراب من ههنا وههنا فقالوا: يا رسول الله أنتداوى؟ فقالتداووا فإن الله تعالى لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد: الهرم

-আমি রাসূল ﷺ এর নিকট আসলাম। তখন সাহাবারা এমন অবস্থায় ছিলেন, যেন তাদের মাথায় পাখি বসে আছে (তারা পিনপতন নিরবতায় কথা শুনছিলেন)। আমি সালাম দিয়ে বসলাম। এমন সময় এক বেদুঈন এসে রাসূল ﷺ কে প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমরা কি চিকিৎসা গ্রহণ করব? রাসূল ﷺ বলেন, চিকিৎসা গ্রহণ করো! কারণ আল্লাহ তাআলা এমন কোনো রোগ দেন নাই, যার চিকিৎসার অস্তিত্ব দেন নাই। কেবলমাত্র একটি অসুখ ব্যতিক্রম, আর তা হল বার্ধক্য।

এখানে সাহাবীরা রাসূল ﷺ কে চিকিৎসা নেয়ার ব্যাপারে জানতে চেয়েছিলেন। রাসূল ﷺ তা উপকারী আখ্যায়িত করে জবাব দিলেন, 'তোমরা চিকিৎসা গ্রহণ করো!' এটি আম তথা ব্যাপক অর্থবোধক। তা শরীআতের সীমা অতিক্রম না করা পর্যন্ত সঠিক পন্থার প্রত্যেক উপকারী চিকিৎসাকে অন্তর্ভুক্ত করে।

[ড. আলী মুহাম্মদ আস সাল্লাবি কৃত নিবন্ধটি আলজেরিয়ার আরবি নিউজ পোর্টাল 'আশ শুরুক' এ প্রকাশিত ও মো. ইমাদ উদ্দিন কর্তৃক অনূদিত।]

সুয়েজ খাল

সম্প্রতি এভার গিডেন নামক একটি জাহাজ আটকে পড়লে সুয়েজ খাল বেশ আলোচিত হতে থাকে। মিসরের একটি জনপ্রিয় প্রবাদ হলো, 'আপনি পৃথিবীর যেখানেই থাকুন, সুয়েজ খাল দ্বারা উপকৃত।' বিশ্ববাণিজ্যে সুয়েজ খালের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কারণেই হয়তো এই প্রবাদের সৃষ্টি। লোহিত সাগর এবং ভূমধ্যসাগরের মধ্যে সংযোগকারী ১২০ মাইল দীর্ঘ এই খাল এশিয়া এবং আফ্রিকা মহাদেশকে আলাদা করেছে। যা দিয়ে বিশ্ব বাণিজ্যের ১২ শতাংশ পণ্য পরিবহন হয়। বিশেষ করে এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের সাথে ইউরোপের বাণিজ্যের একটি লাইফ-লাইন হলো মিশরের এই খালটি। সুয়েজ খাল খননের আগে ইউরোপের জাহাজগুলোর দক্ষিণ এশিয়ায় আসতে সময় লাগত ৪০-৫০ দিন। আর পাড়ি দিতে হতো অতিরিক্ত সাত হাজার কিলোমিটার পথ। কিন্তু সুয়েজ খাল ব্যবহার করে জাহাজগুলো মাত্র ২০ দিনে দক্ষিণ এশিয়ায় পৌঁছতে পারে। সময় ও জ্বালানি বেঁচে যাওয়ায় বিশ্বজুড়েই বাণিজ্যিক পণ্যের উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের খরচ কমেছে অনেকাংশে।

প্রতিদিন প্রায় ৭০টি আন্তর্জাতিক জাহাজ চলাচল করে সুয়েজ খালে। এতে পণ্য পরিবহন করা হয় তিন থেকে পাঁচ মিলিয়ন টন। বছরে প্রায় ২৫ হাজার জাহাজ সুয়েজ খাল ব্যবহার করে। যার বিনিময়ে বছরে প্রায় ৬০০ কোটি ডলার রাজস্ব পাচ্ছে মিসর, যা দেশটির জিডিপির দুই শতাংশের মতো। ২০২৩ সালের মধ্যে এ আয় ১ হাজার ৩২০ কোটি ডলারে উন্নীত করার পরিকল্পনা রয়েছে দেশটির। করোনাভাইরাসের মহামারি চলাকালেও ২০২০ সালে প্রায় ১৯ হাজার জাহাজ বা প্রতিদিন গড়ে ৫১ দশমিক পাঁচটি জাহাজ সুয়েজ খাল দিয়ে চলাচল করেছে।

খ্রিষ্টপূর্ব ১৮৯৭ থেকে ১৮৩৯ সালের মধ্যবর্তী সময়ে এই খাল খননের কাজ শুরু করেন ফারাও সম্রাট দ্বিতীয় নিকো। ষোড়শ শতকে ভারত মহাসাগর এবং কৃষ্ণসাগর ও ইজিয়ান সাগরে ইউরোপীয় তৎপরতা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে তুর্কি প্রধানমন্ত্রী মুহাম্মদ পাশা সুয়েজ খাল খননের পরিকল্পনা করেন। যদিও তা বাস্তবায়িত হয়নি। ১৮৫৪ সালে ফরাসি প্রকৌশলী ফার্দিনান্দ ডি লেসেপ্স মিসর ও সুদানের শাসক সায়্যিদ পাশাকে সুয়েজ খাল খননের জন্য একটি আন্তর্জাতিক কোম্পানি গঠনের প্রস্তাব দেন। সায়্যিদ পাশা তাতে সম্মত হন এবং ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম সুয়েজ চ্যানেল কোম্পানি নামের একটি কোম্পানি গঠন করা হয়। তাঁর অধীনে ১৮৫৯ সালে খননকাজ শুরু হয়। ১৮৬৯ সালে খনন সম্পন্ন হলে তা সর্বসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হয়। এক দশক ধরে খালটি খননের কাজের নিয়মিত ৩০ হাজার করে নিয়োজিত ছিল ১০ লাখ মিসরীয় শ্রমিক। এতে হাজারো শ্রমিকের মৃত্যু হয়। নির্মাণসামগ্রী পরিবহন করা হতো উট ও খচ্চরের পিঠে চাপিয়ে। ১৮৬৯ সালের ১৭ নভেম্বর ১৬৪ কিলোমিটার দীর্ঘ খালটিতে প্রথম জাহাজ ভাসে। ১৯৫৬ সালের ২৬ জুলাই সুয়েজ খাল জাতীয়করণ করে মিসর। ১৯৬৭ সালে আরব-ইসরাইল যুদ্ধের পর সুয়েজ খাল বন্ধ হলে ১৯৭৫ সালে মিসর-ইসরাইল শান্তিচুক্তির মাধ্যমে জাহাজ চলাচল শুরু হয়। আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুযায়ী যুদ্ধ বা শান্তি যেকোনো সময় যেকোনো দেশের জাহাজ সুয়েজ খাল ব্যবহার করতে পারবে।

সুয়েজ খালের ওয়েবসাইটে দেওয়া তথ্যমতে, ১৮৬৯ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত খালটি মোট ৯ বার সংস্কার করা হয়। বর্তমানে সুয়েজ খালের দৈর্ঘ্য ১৯৩.৩ কিলোমিটার, সর্বোচ্চ গভীরতা ২৪ মিটার এবং প্রস্থ সর্বোচ্চ ২২৫ মিটার। যা দিয়ে সর্বোচ্চ ২ লাখ ৪০ হাজার টন ধারণক্ষমতার জাহাজ চলাচল করতে পারে। সুয়েজ খালের উত্তরমুখে ভূমধ্যসাগরের তীরে পোর্ট সৈয়দ এবং দক্ষিণ মুখে লোহিতসাগরের তীরে পোর্ট তৌফিক রয়েছে। খালটি এক লেনে জাহাজ চলাচল করতে পারে। এ ছাড়াও বাল্লাহ বাইপাস ও গ্রেট বিটার হ্রদ নামে দুটি পাসিং পয়েন্ট রয়েছে।

গত ২৩ মার্চ মিসরের মরুভূমিতে প্রবল ঝড়ে জোয়ারের চাপে ৪০০ মিটার দীর্ঘ একটি জাহাজ আড়াআড়িভাবে খালে আটকে যায়। ড্রেজারের মাধ্যমে মাটি সরিয়ে এবং ক্রেন দিয়ে ঠেলে জাহাজ মুক্ত করতে এক সপ্তাহ সময় লেগে যায়। এতে সুয়েজ খালে মালবাহী জাহাজের জট তৈরি হয়। সুয়েজ খাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, খাল বন্ধ থাকায় প্রতিদিন গড়ে এক কোটি ৫০ লাখ ডলার লোকসান হয়। অন্যদিকে বন্দর ও নৌ চলাচল বিষয়ক প্রাচীনতম জার্নাল লয়েডস লিস্ট প্রকাশিত পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, শত শত মাল ভর্তি জাহাজ আটকে থাকায় প্রতিদিন গড়ে ৯৬০ কোটি ডলারের ব্যবসা বন্ধ ছিল। যা প্রতি ঘণ্টায় প্রায় ৪০ কোটি ডলার।

মিসরের কূটনীতি ও অর্থনীতির অন্যতম প্রভাবক এই সুয়েজ খালের বিকল্প একটি খাল খননের পরিকল্পনা করছে ইসরাইল। যুক্তরাষ্ট্রে বিজনেস ইনসাইডার নামে একটি পত্রিকায় ১৯৬৩ সালের একটি গোপন সরকারি নথি ১৯৯৬ সালে আংশিকভাবে প্রকাশ করা হয়। যেখানে ১৬০ মাইল লম্বা একটি খাল খননের জন্য ইসরাইলের নেগেভ মরুভূমির তলায় ৫২০টি পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ করার কথা বলা হয়েছিল। ১৯৫৬ সালে ইসরাইল সুয়েজের নিয়ন্ত্রণ নিতে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সমর্থন নিয়ে মিশরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পর্যন্ত করেছিল। অর্থনৈতিক এবং ভূ-রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই জলপথের ওপর নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার সেই আকাঙ্ক্ষা থেকে ইসরাইল কখনই সরেনি। পুরোপুরি ইসরাইলের ভেতর দিয়ে না নিয়ে বরং মিশর-ইসরাইল সীমান্ত দিয়ে বিকল্প একটি খাল কাটার যে কথা হচ্ছে। সংযুক্ত আরব আমিরাত ওই খাল তৈরিতে বিনিয়োগ করার কথাও বলে। এই বিনিয়োগ করলে তা বিশ্বাসঘাতকতার সামিল হবে।

গায়ে হলুদ : একটি বিধর্মী অনুষ্ঠান

সৈয়দা নাদিরা হোসেন

ইদানীং একটি অনুষ্ঠান খুব ঘটা করে অনেক মুসলিম পরিবারের বিবাহগুলোতে পালন করা হচ্ছে তা হলো, 'গায়ে হলুদ'। বিয়ের অনুষঙ্গ হিসেবে গায়ে হলুদ এক গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে পরিণত হয়ে গেছে। কারণ বিয়ের দাওয়াতের সাথে সাথে বিয়ের পূর্বদিনের অর্থাৎ গায়ে হলুদের বিশেষ সময়সূচি সহকারে দাওয়াত কার্ডও ছাঁপা হয়ে থাকে। এ অনুষ্ঠানে বর বা কনের গায়ে হলুদ মাখানো হয়। কিন্তু বর্তমানে প্রচলিত যে গায়ে হলুদ তার কাজ ও খরচ অনেক। এর জন্য একটি সুদৃশ্য মঞ্চ সাঁজানো হয়, যেখানে বর বা বধূকে বসানো হবে। তার বেড়া ও ছাদ হবে কাঁচা ফুল, পাতা, রঙিন কাগজ ইত্যাদি দিয়ে। মঞ্চ এবং মঞ্চের সামনে দামি কার্পেট বিছানো হয়। আবার কাঠে রং মাখিয়েও কার্পেটিং করা হয়। তা হয় কুঞ্জ মন্দিরের মতো, কোনোটি তাজমহলের মতো। প্রচুর টাকা খরচ হয়। তাজা ফুল দিয়ে বর ও কনেকে সাজানো হয়। বর ও কনের নামাঙ্কিত কেক তৈরি হয়। পিতা-মাতা, ভাই-বোন, যে কেউ একজন প্রথম বর বা কনের হাতে রাখি বাঁধেন, যা হিন্দু ধর্মের লোকেরা আশীর্বাদ স্বরূপ বাঁধে। তারপর একে একে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবী, স্বামী-স্ত্রী জোড়ায় জোড়ায় গিয়ে বর বা কনের দুপাশে বসেন এবং গালে, কপালে ও মুখে হলুদ লাগিয়ে দেন। তারপর বর বা কনের সামনে সাজিয়ে রাখা মিষ্টি, আঙ্গুর, কেক ইত্যাদি খাবার খাইয়ে দেন। মাহরাম, গায়রে মাহরাম পুরুষ মহিলা বর বা কনেকে এভাবে হলুদ মাখাতে ও মিষ্টি খাওয়াতে থাকেন এবং সাথে সাথে ছবি তোলা ও ভিডিও করা চলতে থাকে।

একটু চিন্তা করলেই সমাজের যে কোনো বিবেকবান মুসলিম এ গায়ে হলুদ অনুষ্ঠানের মারাত্মক কুফলগুলো দিবালোকের মতো স্পষ্ট দেখতে পাবেন। নিম্নে তা থেকে একে একে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো-

ক. **অন্য ধর্মের অনুকরণ:** ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন-ব্যবস্থা। মানুষ সৃষ্টি করে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার যাবতীয় সমস্যার সমাধান লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন ইসলাম ধর্মের পবিত্র গ্রন্থ আল কুরআনে। একমাত্র ইসলামই হলো আল্লাহ পাকের মনোনীত ধর্ম। এ ধর্মে গায়ে হলুদের মতো নির্লজ্জ ও ঘৃণ্য অনুষ্ঠানের আভাস কখনও কোথাও পরিলক্ষিত হয়নি। এ হলো হিন্দু জাতির একটি অনুষ্ঠান। শুধু গায়ে হলুদই নয় খ্রিষ্টানদের অনুকরণে Birthday, Marriage Day পালনও করা হয় বিভিন্ন মুসলিম পরিবারে। অথচ আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে আমাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন, 'হে মুমিনগণ! ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানদের তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।' (সূরা মায়িদা, আয়াত-৫১)

খ. **পর্দার বরখেলাফ:** ইসলাম ধর্ম নারী-পুরুষ নির্বিশেষে পর্দা ফরয করেছে। পর্দার জন্য পবিত্র কুরআনে বারবার তাগিদ এসেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, হে নবী! আপনি আপনার পত্নীগণ ও কন্যাগণ এবং মুমিনদের স্ত্রীগণকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দাংশ নিজেদের উপর টেনে নেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে এবং তারা উপদ্রব ও নিপীড়নের শিকার হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা আহযাব, আয়াত-৫৯)

গ. **অর্থের অপচয়:** গায়ে হলুদ অনুষ্ঠানে গায়ে হলুদের কাপড় থেকে শুরু করে ফুল চন্দন ও খাবার-দাবারে যে খরচ হয়, তা বিয়ের খরচ থেকে খুব একটা কম নয়। এখানে অপচয়ের মাত্রাটা বেশি। অথচ রাসূল ﷺ আয়িশা (রা.) কে রুটি অপচয় করতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ জাল্লা শানুহু ইরশাদ করেছেন, 'তোমরা খাও, পান করো, কিন্তু অপব্যয় করো না। নিশ্চয় আল্লাহ অপব্যয়কারীকে পছন্দ করেন না।' (সূরা আরাফ, আয়াত-৩১)

ঘ. **সময়ের অপচয়:** সময় মানুষের জীবনের অমূল্য সম্পদ। প্রতিটি মানুষ, তার প্রতিটি মুহূর্ত কোন পথে ব্যয় করেছে আল্লাহ তার কঠোর হিসাব নেবেন। অদৃশ্য সময়ের নিঃশব্দ অনন্ত যাত্রা সম্পর্কে মানুষ সচেতন নয়। তাই তো সময় চিরদিনই মানুষকে ফাঁকি দিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যাচ্ছে। মানুষের কর্তব্য সময়কে কাজে লাগানো। সম্পদের চেয়ে সময়ের গুরুত্ব অনেক। হারানো সম্পদ ও স্বাস্থ্য হয়তো চেষ্টা করলে ফিরে পাওয়া যায়। কিন্তু হারানো সময় আর ফিরে পাওয়া যায় না। হযরত উমর (রা.) বলতেন, আমি এটাকে খুবই দোষণীয় মনে করি যে, তোমাদের কেউ অর্থহীন সময় কাটাবে, না দুনিয়ার জন্য কিছু করবে, না আখিরাতের জন্য। সময়ের গুরুত্ব এতো বেশি যে, আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে সূরা আসরে সময়ের কসম করে মানুষকে ধ্বংসের কবল থেকে বাঁচার উপায় বলে দিয়েছেন। "সময়ের শপথ! নিশ্চয় মানুষ ধ্বংসে পতিত। শুধু তারা নয়, যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে এবং একে অপরকে সত্য ও ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে।" (সূরা আসর)

ঙ. **ঈমান-আকীদার বরখেলাফ:** একজন মুসলমানের পরিচয়ের মূল ভিত্তি হচ্ছে তার ঈমান। ঈমানের বিষয়বস্তুগুলোকে সে মুখে স্বীকার করবে, অন্তরে বিশ্বাস করবে এবং কাজে তা প্রকাশ করবে। আমরা প্রতিদিন প্রতি রাকআত নামাযে আল্লাহ পাকের সামনে দাঁড়িয়ে শপথ করছি যে, যে পথ ভ্রান্তির, যে পথ পরিতাপের, যে পথ চির অভিশাপের, সে পথে আমাদের পরিচালিত করো না। কিন্তু পরক্ষণেই আমরা ভ্রান্তি ও পরিতাপের কাজ করে যাচ্ছি। আমাদের কথায় এবং কাজে মিল থাকছে না। যারা নামায, রোযা করেন, আবার গায়ে হলুদের মতো গর্হিত কাজ করেন, তাদের ইবাদত বন্দেগি কতটুকু আল্লাহ পাকের নিকট গ্রহণযোগ্যতা পাবে তা চিন্তার বিষয়। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, "ঈমানদারগণ! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করো।" ইসলাম ধর্মের রীতিনীতি পালন করবে, আবার বিধর্মীকে অনুসরণ করবে তা ইসলাম সমর্থন করে না। কারণ ইসলাম তো সর্বযুগের সর্বকালের জন্য আল্লাহ পাকের একমাত্র মনোনীত ধর্ম।

তাই আসুন! আমরা যারা অতীতে এ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছি বা নিজে করেছি অনুতপ্ত হয়ে গাফুরুর রাহীমের দরবারে ক্ষমা চাই আর ভবিষ্যতে যাতে ঐ ধরনের বিধর্মী অনুষ্ঠানে যোগ না দেওয়ার শপথ করি।

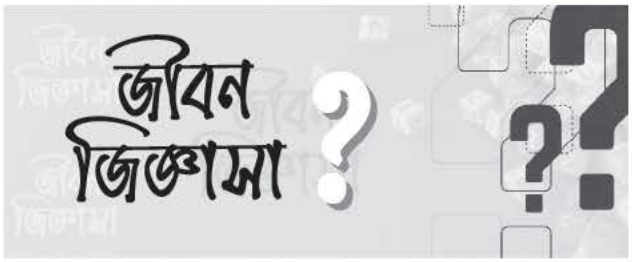

জবাব দিচ্ছেন-
মাওলানা আবূ নছর মোহাম্মদ কুতুবুজ্জামান তাফাদার
প্রিন্সিপাল ও খতীব, আল ইসলাহ ইসলামিক সেন্টার
মিশিগান, আমেরিকা।

মো. হাবিবুর রহমান বাবলু
মল্লিকপুর, ছাতক, সুনামগঞ্জ

প্রশ্ন: নামাযের বৈঠকে তাশাহ্হুদ পড়ার হাকীকত জানতে চাই।

জবাব: নামাযে উভয় বৈঠকে তাশাহ্হুদ পড়া ওয়াজিব। রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কিরামকে গুরুত্ব সহকারে নামাযের তাশাহ্হুদ শিক্ষা দিতেন, যেমন গুরুত্ব সহকারে কুরআন মাজীদের সূরা শিক্ষা দিতেন। আল্লামা মুল্লা আলী কারী (র.) তদীয় সুপ্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'মিরকাতুল মাফাতীহ' গ্রন্থে লিখেছেন, **والتشهد حقيقة النطق بالشهادة، وإنما سمي التشهد دعاء لاشتماله عليه**

-'তাশাহ্হুদ' প্রকৃত অর্থে শাহাদাতের বাক্য উচ্চারণকে বলা হয়। তাশাহ্হুদকে দুআও বলা হয়ে থাকে, যেহেতু এর মধ্যে দুআ বা প্রার্থনা রয়েছে।

আল্লামা কাযী আয়াদ (র.) লিখেছেন, **وسمي الذكر المخصوص تشهدا لاشتماله علي كلمتي الشهادة**

-নির্দিষ্ট দুআ বা যিকরকে তাশাহ্হুদ বলে নামকরণ করার কারণ হলো এতে সাক্ষ্যপ্রদানমূলক দুটি বাক্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

জুলহাস আহমদ চৌধুরী
জকিগঞ্জ, সিলেট

প্রশ্ন: জিহাদ কখন ফরয হয়? জিহাদের শর্তগুলো কি কি?

জবাব: জিহাদ সাধারণত ফরযে কিফায়াহ (সমষ্টিগত ফরয) যা কতিপয় মুসলমানের দ্বারা আদায় হলে অন্যান্যের পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যায়। তবে বিশেষ তিন অবস্থায় তা 'ফরযে আইন' তথা ব্যক্তিগত ফরয। অর্থাৎ প্রত্যেক সক্ষম ব্যক্তির উপর জিহাদ করা ফরয হয়ে পড়ে। যথা-

এক. যদি কাফির ও মুসলিমদের মাঝে যুদ্ধ বেধে যায় তাহলে যুদ্ধে সক্ষম প্রতিটি ব্যক্তির উপর জিহাদ করা ফরযে আইন। এই যুদ্ধ থেকে পলায়ন করা কবীরা গুনাহ।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ – وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

-হে ঈমানদারগণ, তোমরা যখন কাফিরদের সাথে মুখোমুখী হবে (যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে) তখন পশ্চাদপসরণ করবে না। আর যে লোক সেদিন তাদের থেকে পশ্চাদপসরণ করবে, অবশ্য যে লড়াইয়ের কৌশল পরিবর্তন কল্পে কিংবা যে নিজ সৈন্যদের নিকট আশ্রয় নিতে আসে সে ব্যতীত অন্যরা আল্লাহর গযব সাথে নিয়ে প্রত্যাবর্তন করবে। আর তার ঠিকানা হলো জাহান্নাম। বস্তুত: সেটা হলো নিকৃষ্ট অবস্থান।" (সূরা আনফাল, আয়াত-১৫ ও ১৬)

দুই. যদি কাফিররা মুসলিম দেশকে ঘিরে ফেলে, তাহলে প্রতিটি সক্ষম ব্যক্তির উপর দেশ ও মুসলিমদের ইজ্জত-আব্রু হিফাযতের স্বার্থে জিহাদ করা ফরয।

এ রকম যুদ্ধ সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা করবে মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান। যতক্ষণ উলিল আমর হিসেবে মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান থাকবে ততক্ষণ সে তা নির্বাহ করবে। এটাকে বলা হয়, প্রতিরক্ষামূলক জিহাদ।

তিন. মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান যদি দেশের নাগরিক ও প্রজা সাধারণকে জিহাদের জন্য আহ্বান জানান (বাইরের কোনো অপশক্তির বিরূদ্ধে লড়াই করার জন্যে) তাহলে প্রত্যেক সক্ষম ব্যক্তির উপর জিহাদে অংশগ্রহণ করা ফরযে আইন হয়ে যায়। এ মর্মে রাসূল ﷺ বলেন, **وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا** -যখন তোমাদেরকে জিহাদে বের হওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হয়, তখন তোমরা (জিহাদের উদ্দেশে) বের হয়ে যাও।" (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৭২৩)

যারা এই আহ্বান পাওয়ার পরও তাতে সাড়া দেয় না, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে তিরস্কার করে বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ ۚ أَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ ۚ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ

"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের কি হল, যখন আল্লাহর পথে (জিহাদে) বের হবার জন্যে তোমাদের বলা হয়, তখন মাটি জড়িয়ে ধরো, তোমরা কি আখিরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে পরিতুষ্ট হয়ে গেলে? অথচ আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনের উপকরণ অতি অল্প।" (সূরা তাওবা, আয়াত-৩৮)

তাই মুসলমানের ইমাম তথা রাষ্ট্রপ্রধান যখন জিহাদের জন্য আহ্বান জানাবেন এবং অন্যান্য মুসলিমগণ জিহাদে যাবেন তখন সক্ষমতা থাকাবস্থায় অবশ্যই তাতে সাড়া দেওয়া ফরয।

মুহাম্মদ আবদুল্লাহ
সুনামগঞ্জ

প্রশ্ন: ১ চার রাকাআত বিশিষ্ট নামাযের চতুর্থ রাকাআতের পর না বসে ভুলবশত দাঁড়িয়ে গেলে করণীয় কি?

প্রশ্ন:২ চার রাকাআত বিশিষ্ট নামাযের শেষ রাকাআতে শরীক হলে পরে কিভাবে তাশাহ্হুদ পড়তে হবে? জানতে চাই।

জবাব:১ এমতাবস্থায় ৫ম রাকাআতের সিজদা করার পূর্বে স্মরণ হলে সঙ্গে সঙ্গে বসে যাবে এবং তাশাহ্হুদ পড়ে ডান দিকে সালাম ফিরিয়ে সাহু সিজদাহ করবে এবং পুনরায় তাশাহ্হুদ, দরূদ ও দুআ মাসূরা পড়ে সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করবে। আর ৫ম রাকাআতের সিজদা করে ফেললে ফরয নামায বাতিল হয়ে তা নফল নামাযে স্থানান্তরিত হবে। কেননা এর দ্বারা চতুর্থ রাকাআতের বৈঠক সংশোধনের কোনো সম্ভাবনা আর অবশিষ্ট নেই, যা ফরয ছিল। তাই এমতাবস্থায় ৫ম রাকাআত পূর্ণ করে আরো এক রাকআতসহ মোট ৬ রাকাআত পড়ে সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করবে। উক্ত নামাযের সকল রাকাআত নফল হিসেবে পরিগণিত হবে। এমতাবস্থায় নির্ভরযোগ্য অভিমত অনুযায়ী সাহু সিজদাহ লাগবে না। আর মূল চার রাকাআত ফরয নামায পুনরায়

দোহরাতে হবে। (মুখতাছারুল কুদুরী, ১/৩৪; আল লুবাব, ১/৯৭; আল জাওহারাতুন নায়্যিরাহ, ১/৭৮; কানজুদ্দাকাইক, ১/১৮৩; তাবয়ীনুল হাক্বাইক, ১/১৯৬; আল ইনায়াহ শরহুল হিদায়াহ, ১/৫০৮; আল বিনায়াহ, ২/৬১৯)

জবাব:২ যে কোনো নামাযের জামাআতে কেউ শরীক হলে রাকাআত পাওয়ার ক্ষেত্রে রুকু পাওয়া শর্ত। সুতরাং শেষ রাকাআতে ইমামকে রুকু অবস্থায় কিংবা এর আগে পেলে ঐ রাকাআত পেয়েছে বলে গণ্য হবে। তাই এমতাবস্থায় ইমামের সালাম ফিরানোর পরে তার আরো তিন রাকাআত মুনফারিদ বা একাকী পূর্ণ করতে হবে। আর ঐ রাকাআতের রুকুর পর শরীক হলে তার ঐ রাকাআত ধর্তব্য হবে না। তাই ইমামের সালাম ফিরানোর পর তাকে নতুন করে চার রাকাআত পড়তে হবে। আগে ইমামের সাথে পাওয়া অংশটুকু পূর্ণ রাকাআত না হওয়াতে তার জন্য সেটা অতিরিক্ত।

আর তাশাহ্হুদ সর্বক্ষেত্রে দ্বিতীয় ও চতুর্থ রাকাআতে (মাগরিবের নামাযে দ্বিতীয় ও তৃতীয় রাকাআতে) পড়তে হয়। ইমামের সাথে এক রাকআত পেলে মাসবুক ব্যক্তির জন্য পরবর্তী নামাযের প্রথম রাকআত হলো দ্বিতীয় রাকআত। এ রাকআতে তাকে বৈঠক করে তাশাহ্হুদ পড়তে হবে। সকল মাসবুক নামাযের ক্ষেত্রে এরূপ হিসাব করে পূর্বের ইমামের সাথে পাওয়া রাকআতসহ মোট নামাযের দ্বিতীয় রাকআতে প্রথম বৈঠকের তাশাহ্হুদ, এবং চতুর্থ রাকাআতে শেষ বৈঠকের তাশাহ্হুদ দরূদ ও দুআয়ে মাসূরা পড়তে হবে। মাগরিবের ক্ষেত্রে শেষ বৈঠকের তাশাহ্হুদ হবে তৃতীয় রাকাআতে। ইমামের চতুর্থ রাকাআতের বৈঠকে মাসবুক ব্যক্তি তাশাহ্হুদ পরবর্তী দুআগুলো পড়বে না বরং তাশাহ্হুদ এমন ধীরে ধীরে পড়বে যেন ইমামের সালাম ফিরানোর পূর্বে তা শেষ হয়।

বদরুল ইসলাম
ডাইকের বাজার, নোয়াগাঁও, ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট

প্রশ্ন: মাযারের নামে কোনো কিছু মানত করা, মাযারের দান বাক্সে দান করা, মাযারের নিকট বাতি জ্বালিয়ে রাখা এবং মাযারের খাদিম হওয়া শরীআতের দৃষ্টিতে কতটুকু সঠিক? জানতে চাই।

জবাব: মান্নত হবে কেবল আল্লাহর নামে, কোনো ওলী বা মাযারের নামে নয়। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে মান্নত করা সম্পূর্ণ নাজায়িয। যেমন কেউ বলল, "আমি অমুক ওলীর কিংবা তার মাযারের নামে এরূপ সাদকাহ করার মান্নত করলাম।" এরূপ মান্নত গায়রুল্লাহর (আল্লাহ ব্যতীত অন্যের) নামে হওয়ার কারণে তা নাজায়িয এবং তা পূরণ করা যাবে না; বরং এজন্য তাওবা-ইস্তিগফার করা প্রয়োজন। (মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, হাদীস নং ১২৫৭৫; সুনানে আবূ দাউদ, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৬৯; আহকামুল কুরআন লিল জাসসাস, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৮৫; আল বাহরুর রায়েক ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৯৮; আলমুগনী লি ইবনে কুদামা, খণ্ড ১৩, পৃষ্ঠা ৬৪৩; রদ্দুল মুহতার, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৪৩৯)

তবে কেউ যদি আল্লাহর নামে মান্নত করেন এবং স্থান হিসেবে কোনো ওলীর মাযার এলাকা বা মসজিদকে শর্ত করেন, বা অন্য যেকোনো স্থান বা মসজিদকে শর্ত করেন, অনেকে আল্লাহর নামে কোন নেক কাজের মান্নত করতে গিয়ে কোন স্থানের কথা শর্ত করে থাকে, যেমন বলেন, "আমি আল্লাহর নামে অমুক মসজিদে দুই রাকআত নামায পড়ার মান্নত করলাম বা "আল্লাহর নামে একটা গরু বা ছাগল অমুক ওলীর মাযারের মিসকিনদেরকে দান করার মান্নত করলাম" এরূপ মান্নত করা জায়িয রয়েছে। তবে মান্নত পূর্ণ করার ক্ষেত্রে উক্ত মসজিদে তা আদায়ের কিংবা উক্ত স্থানের মিসকিনদেরকে দেওয়া আবশ্যক নয়, বরং অন্য যেকোনো স্থানে তা আদায় করা যাবে। এটি হানাফী ফকীহগণের নির্ভরযোগ্য অভিমত। এ সম্পর্কে 'বাদাইয়ুছ ছানায়ী' গ্রন্থে আছে,

وإن كان مقيدا بمكان بأن قال: لله علي أن أصلي ركعتين في موضع كذا، أو أتصدق على فقراء بلد كذا – يجوز أداؤه في غير ذلك المكان عند أصحابنا الثلاثة – رحمهم الله

-যদি মান্নতকারী কোন স্থানের শর্ত করে মান্নত করে থাকে, যেমন এভাবে বলল, আল্লাহর নামে অমুক স্থানে দু'রাকআত নামায আদায়ের মান্নত করলাম" অথবা বলল, "আল্লাহর নামে অমুক শহরের ফকীরদেরকে সাদকাহ করার মান্নত করলাম" তাহলে আমাদের তিন ইমাম তথা ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর মতানুযায়ী উক্ত স্থান ব্যতীত অন্য স্থানেও তা আদায় করা জায়িয হবে। (বাদাইয়ুছ ছানায়ী: ৫খণ্ড, ৯৩ পৃষ্ঠা)

মাযারের দান বাক্সে দান ও মাযার সংশ্লিষ্ট যে সকল দ্বীনী খিদমত রয়েছে, সেগুলোর সহায়তার উদ্দেশ্যে মাযারের দান বাক্সে দান করা যাবে। তবে উক্ত দানকৃত অর্থ যদি নাজায়িয কিংবা হারাম কাজে ব্যয় হবার সমূহ আশঙ্কা থাকে, তাহলে সে ক্ষেত্রে দান করা নাজায়িয। কেননা ইহা নাজায়িয বা হারাম কাজে সহায়তার নামান্তর। পবিত্র কুরআন মাজীদে মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

-তোমরা নেক ও খোদা ভীরুতার ক্ষেত্রে সহায়তা করো, আর তোমরা পাপাচার ও সীমালঙ্গনে সহায়তা করো না। (সূরা মায়িদা, আয়াত-০২)

মাযারের নিকট বাতি জ্বালানো: প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে যেমন- যিয়ারতকারীগণের সুবিধার্থে অন্ধকারচ্ছন্ন অবস্থায় কোনো আলোর ব্যবস্থা না থাকলে মাযারের নিকট বাতি জ্বালানো জায়িয। অন্য প্রকারের আলো থাকাবস্থায় অপ্রয়োজনে বাতি জালিয়ে রাখা নাজায়িয। যেহেতু ইহা অপচয়ের শামিল।

মাযারের খাদিম হওয়ার বিষয়টি মূলত সুষ্ঠুভাবে সেখানকার কার্যক্রম পরিচালনার জন্যে অর্থাৎ যেখানে জনসমাগম ও ব্যস্ত পরিবেশ রয়েছে, সেখানে সুষ্ঠুভাবে সবকিছু পরিচালনার প্রয়োজনে দায়িত্বশীল হিসেবে খাদিম নিযুক্ত থাকা জায়িয, যেমন অন্যান্য জায়িয কর্মকাণ্ড পরিচালনায় কমিটি কিংবা সমিতি দায়িত্ব পালনের জন্য নিযুক্ত থাকে। মাযারের খাদিম নিযুক্ত করা বা হওয়া প্রয়োজনে জায়িয হবে।

আব্দুল লতিফ
গোবিন্দগঞ্জ, ছাতক, সুনামগঞ্জ

প্রশ্ন: জন্মদিন পালন করা কিংবা কাউকে জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানানো, শরীআতের দৃষ্টিতে কি জায়িয?

জবাব: জন্মদিন বিশেষ রীতি-নীতির সহিত পালন করা মূলত বিজাতীয় সংস্কৃতির আওতাভুক্ত। এর চর্চা থেকে যথাসম্ভব বেঁচে থাকা পরহেজগারিতার লক্ষণ। কোন নিয়মের বাধ্যবাধকতা ব্যতীত এ মর্মে জন্মদিনকে স্মরণে রাখা যে, মহান আল্লাহর মেহেরবানীতে এ দিনে জন্ম গ্রহণ করার মাধ্যমে আল্লাহর অজস্র নিআমত পেয়ে ধন্য হয়েছি এবং সে জন্য আল্লাহর শোকরগোজার হওয়া শরীআত বিরুদ্ধ নয়, বরং মুবাহ বা বৈধ পর্যায়ের যতক্ষণ না এতে বিজাতীয় রীতি অনুসরণের সংযুক্তি পাওয়া যাবে। প্রচলিত পদ্ধতির জন্মদিন পালন সর্বাবস্থায় এড়িয়ে চলাই নিরাপদ। আর এ উপলক্ষ্যে শুভেচ্ছা জানানো হারাম না হলেও শরীআতের দৃষ্টিতে কোনো প্রশংসনীয় বিষয় নয়।

মো. লালন আহমদ রাজু
নরসিংপুর, দোয়ারাবাজার, সুনামগঞ্জ

প্রশ্নঃ মাগরিবের ৩ রাকাআত ফরয নামায জামাআতে আদায়কালে দুই রাকআত ছুটে গেলে কিভাবে নামায পূর্ণ করতে হবে? তাশাহহুদ কতবার পড়তে হবে?

জবাবঃ দুই রাকাআত ছুটে গেলে ইমামের সালাম ফিরানোর পর দাঁড়িয়ে বাকী দুই রাকাআত একাকী পড়তে হবে। উভয় রাকাআতেই যথা নিয়মে সানা, আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ ও সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সূরা পড়তে হবে। এক্ষেত্রে একাকী নামাযের প্রথম রাকাআত যেহেতু মোট নামাযের দ্বিতীয় রাকাআত সেহেতু এ রাকাআতে বৈঠক করে তাশাহ্হুদ পড়ে দাঁড়িয়ে পরবর্তী রাকাআত যথানিয়মে রুকূ, সিজদা ও শেষ বৈঠক করে তাশাহ্হুদ, দরূদ ও দুআ পড়ে সালাম ফিরাতে হবে। মাগরিবের নামাযে এক বা দুই রাকাআত ছুটে গেলে প্রত্যেক রাকাআতেই বৈঠক করতে হয়। (আল ফাতাওয়াল হিন্দিয়্যাহ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৯১; আল বাহরুর রাইক, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪০২)

মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী
কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার

প্রশ্নঃ পাগড়ি বাঁধা কি সুন্নাত? এর ফযীলত কী? সবুজ রংয়ের পাগড়ি বাঁধা কেউ কেউ বিদআত বলেছেন, এটা কি সঠিক? দলীলসহ জানতে চাই।

জবাবঃ হ্যাঁ, পাগড়ি পরিধান করা সুন্নাত। এর সুন্নাত হওয়া বহু বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। ইহা পরিধানে সুন্নাত আদায়ের সাওয়াব তো রয়েছে, তদুপরি পাগড়ি পরিহিত অবস্থায় নামায আদায়ে নামাযের সাওয়াব বৃদ্ধি পায়। পাগড়ি পরিধানের গুরুত্ব ও ফযীলত সম্পর্কে বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

হযরত জাবির (রা.) বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ (মক্কায়) প্রবেশ করলেন। তখন তাঁর মাথায় কালো পাগড়ি ছিল। (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৩৫৮)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) ও হযরত উবাদাহ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "তোমাদের পাগড়ি পরিধান করা উচিত। কেননা ইহা ফিরিশতাগণের বিশেষ চিহ্নস্বরুপ। আর এর প্রান্ত পিঠের উপর ছেড়ে দাও।" (আল মুজামুল কাবীর, হাদীস নং ১৩৪১৮; শুআবুল ঈমান, হাদীস নং ৫৮৫১)

আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি মক্কা মুকাররামার উদ্দেশ্যে বের হলে সঙ্গে পাগড়ি নিতেন এবং তা পরিধান করতেন। (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৫৫২)

হযরত মুগীরা ইবনে শুবা (রা.) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ উযূ করলেন এবং মাথার অগ্রভাগ ও পাগড়ির উপর মাসেহ করলেন। (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৮১)

পাগড়ি পরিধান সংক্রান্ত এ ধরনের আরো অনেক বর্ণনা হাদীসের বিভিন্ন কিতাবে বর্ণিত হয়েছে।

সাহাবা, তাবিঈগণও নামাযে এবং নামাযের বাইরে বিভিন্ন সময় ব্যাপকভাবে পাগড়ি ব্যবহার করতেন। (সহীহ বুখারী, ১/৫৬)

সবুজ রংয়ের পাগড়ি পরিধান সাহাবীগণের আমল থেকে সরাসরি প্রমাণিত। তাই ইহা বিদআত নয়। বরং সুন্নাতে সাহাবা। এ সম্পর্কে বিশিষ্ট তাবিঈ হযরত সুলাইমান ইবনে আবি আবদিল্লাহ (র.) বলেন, "আমি প্রথম যুগের মুহাজির সাহাবীগণকে কালো, সাদা, হলুদ, সবুজ বিভিন্ন রঙের পাগড়ি পরতে দেখেছি।" (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস নং ২৪৯৮৭)

মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী
কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার

প্রশ্নঃ নামাযের পর নাকি দুআ করা বিদআত? নামাযের পর সম্মিলিতভাবে দুআ করা কি জায়িয? নামাযের নিয়ত মুখে উচ্চারণ করা কি? দলীলসহ জানতে চাই।

জবাবঃ নামাযের পর দুআ করা সুন্নাত, বিদআত নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বয়ং নামাযের পর দুআ করতেন এবং সাহাবায়ে কিরাম ও তৎপরবর্তী সকলেই নামাযের পর দুআ করতেন। উপরন্তু ফরয নামাযের পর দুআ অধিক কবূল হয় বলে রাসূলুল্লাহ ﷺ ফরয নামাযের পর দুআ করতে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছেন। আর পবিত্র কুরআন মাজীদে নামাযের পর দুআ করার নির্দেশ সম্বলিত আয়াত রয়েছে। যেমন- তাফসীরে তাবারী গ্রন্থে এ সম্পর্কে লিখেছেন,

وقوله: (فإذا فرغت فانصب) اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم: معناه: فإذا فرغت من صلاتك، فانصب إلى ربك في الدعاء، وسله حاجاتك.

-মহান আল্লাহ তাআলার বাণী "যখন আপনি (নামায) সমাপ্ত করে অবসর হবেন তখন বিশেষভাবে (দুআ করতে) নিবিষ্ট হবেন।" ব্যাখ্যাকারকগণ এর ব্যাখ্যায় মতানৈক্য করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, এর মর্মার্থ হলো "যখন আপনি নামায শেষ করবেন, তখন আপনার রবের নিকট দুআ করতে মনোযোগী হন এবং তাঁর নিকট আপনার প্রয়োজনীয় বিষয় যাচনা করুন।" উক্ত অভিমত পোষণ করেছেন সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ট মুফাসসির হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)। (তাফসীরে তাবারী, ২৪/৪৯৩)

সুনানে তিরমিযী কিতাবে এ সম্পর্কে এসেছে-

عن أبي أمامة، قال: قيل يا رسول الله: أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر، ودبر الصلوات المكتوبات – هذا حديث حسن

-হযরত আবূ উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! কোন দুআ সর্বাধিক কবূল হওয়ার উপযুক্ত? তিনি বললেন, রাতের শেষ অংশ এবং ফরয নামায সমূহের পর। ইমাম তিরমিযী ইহাকে হাসান বলেছেন। (সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ৩৪৯৯)

রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাযের পর হাত তুলে দুআ করতেন বলে হাদীস শরীফের বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে। যেমন-

عن محمد بن أبي يحيى، قال: رأيت عبد الله بن الزبير ورأى رجلا رافعا يديه بدعوات قبل أن يفرغ من صلاته، فلما فرغ منها، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه حتى يفرغ من صلاته

-হযরত মুহাম্মদ ইবনে আবী ইয়াহইয়া থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.) কে দেখেছি যে তিনি জনৈক ব্যক্তিকে নামাযে হাত তুলে দুআ করতে দেখলেন। তার নামায শেষ হলে বললেন, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ ﷺ নামায শেষ না করে (দুআর জন্য) হাত তুলতেন না। (আল মু'জামুল কাবীর, হাদীস নং ৩২৪)

তাছাড়া সম্মিলিত দুআ মুতলাক (শর্তহীন) ভাবে বৈধ ও উত্তম হওয়ার বিষয়ে বহু হাদীস রয়েছে। যেমন- হযরত সালমান (রা.) বলেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন, কোন জামাআত কিছু প্রার্থনা করার জন্য আল্লাহর দরবারে হাত তুললে আল্লাহ তাআলার উপর ওয়াজিব হয়ে

যায় তাদের প্রার্থিত বস্তু তাদের হাতে তুলে দেওয়া। (আল মু'জামুল কাবীর, হাদীস নং ৬১৪২)

হযরত হাবীব ইবনে মাসলামা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, যদি কিছু সংখ্যক লোক একত্রিত হয়ে এভাবে দুআ করে যে, তাদের একজন দুআ করতে থাকে, আর অপররা 'আমীন' 'আমীন' বলতে থাকে, তবে আল্লাহ তাআলা তাদের দুআ অবশ্যই কবূল করে থাকেন। (মুস্তাদরাকে হাকিম, হাদীস নং ৫৪৭৮)

নামাযের পর সম্মিলিত দুআর বিষয়ে হাদীসে এসেছে, হযরত ছাওবান (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন, কোন ব্যক্তি লোকদের ইমাম হয়ে এমন হবে না যে, সে তাদেরকে বাদ দিয়ে দুআয় কেবল নিজেকেই নির্দিষ্ট করে। যদি এরূপ করে, তবে সে তাদের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করল। (তিরমিযী, হাদীস নং ৩৫৭)

হযরত উমর (রা.) সালাতুল ইসতিসকার নামাযান্তে হযরত আব্বাস (রা.) এর ওসীলাহ নিয়ে যে দুআ করেছিলেন সে দুআ সম্মিলিত দুআ ছিল। হাদীস শরীফের ভাষ্য এরই ইঙ্গিত করে। তিনি উক্ত দুআয় বলেছিলেন,

اللهم إنا كنا إذا قحطنا استسقينا بنبيك فتسقينا، وإنا نستسقيك اليوم بعم نبيك أو نبينا فاسقنا، فيسقون– صحيح لابن خزيمة: ١٢٤١ صحيح لابن حبان :١٦٨٢

-হে আল্লাহ! আমরা যখন নবী ﷺ এর যুগে দুর্ভিক্ষ কবলিত হতাম, তখন তোমার নবীর ওয়াসীলা নিয়ে বৃষ্টি চাইতাম, আর তুমি আমাদেরকে বৃষ্টি দিতে। আর আজ আমরা তোমার নবীর চাচার ওসীলা নিয়ে বৃষ্টি চাচ্ছি, আমাদেরকে বৃষ্টি দাও, তাই তারা বৃষ্টি প্রাপ্ত হলেন। (সহীহ ইবনে খুযাইমাহ, হাদীস নং ১৪২১; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস নং ২৮৬১)

হাদীসের বিভিন্ন ভাষ্য থেকে সম্মিলিতভাবে দুআ করার বিষয়টি প্রমাণিত আছে। যেহেতু সম্মিলিতভাবে দুআ করা নাজায়িয নয় তাই নামাযান্তে সম্মিলিত দুআ ও জায়িয।

বদরুল ইসলাম
সিলেট

প্রশ্ন: আমরা যেভাবে নামায পড়ি, এভাবে কি রাসূলুল্লাহ ﷺ নামায পড়তেন? পুরুষের নামাযের নিয়ম থেকে মহিলার নামাযের নিয়ম কতিপয় স্থানে আলাদা কেন?

জবাব: রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নামায আদায়ের পদ্ধতি সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসের নির্ভরযোগ্য বর্ণনাসমূহের ভিত্তিতে মাযহাবের ইমামগণ গ্রহণযোগ্য মূলনীতির ভিত্তিতে রায় প্রদান করেছেন। সুতরাং ইমাম আবূ হানীফা (র.) নামাযের পদ্ধতি সম্পর্কে যে রায় প্রদান করেছেন তা তার নিকট সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য হাদীস শরীফের ভিত্তিতেই ছিল। তাই আমাদের মধ্যে যারা মাযহাবের ইমামগণের কারো সিদ্ধান্ত মেনে সে অনুযায়ী নামায আদায় করছেন, তাদের নামায আদায়ের পদ্ধতি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নামায আদায়ের পদ্ধতির অনুসরণ ও অনুকরণে সুন্নাহ মুতাবিক হচ্ছে।

আর পুরুষের নামায থেকে নারীদের নামাযই কেবল ভিন্ন নয় বরং শরীআতের অন্যান্য বিধি-বিধানে ও নারী-পুরুষের পদ্ধতিগত পার্থক্য রয়েছে। এর কারণ হচ্ছে সৃষ্টিগত দিক থেকে উভয়ের কাঠামোগত ভিন্নতা। তাই রুকু, সিজদাহসহ যে সকল বিষয়ে ভিন্ন হওয়ার ব্যাপারে ফুকাহায়ে কিরামের সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, সে সম্পর্কে হাদীস শরীফে বর্ণনা রয়েছে। যেমন সিজদার পদ্ধতিতে ভিন্নতা প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে-

عن يزيد بن أبي حبيب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين تصليان فقال: إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى الأرض فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل

-তাবিঈ ইয়াযিদ ইবনে আবী হাবীব (র.) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাযরত দুই মহিলার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তাদেরকে বললেন, যখন সিজদা করবে তখন শরীর যমীনের সাথে মিলিয়ে দিবে। কেননা মহিলারা এক্ষেত্রে পুরুষদের মতো নয়। (আল মারাসিল লি আবী দাউদ, হাদীস নং ৮৭; সুনানে বায়হাকী, হাদীস নং ৩২০১; মা'রিফাতুস সুনান ওয়াল আসার, হাদীস নং ৪০৫৪)

সিজদা ও বৈঠক বিষয়ে ভিন্নতা সম্পর্কে অন্য হাদীসে এসেছে-

عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا جلست المرأة في الصلاة وضعت فخذها على فخذها الأخرى، وإذا سجدت ألصقت بطنها في فخذيها كأستر ما يكون لها، وإن الله تعالى ينظر إليها ويقول: يا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت لها

-হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, মহিলা যখন নামাযের মধ্যে বসবে তখন যেন এক (ডান) উরু অপর উরুর উপর রাখে। আর যখন সিজদা করবে তখন যেন পেট উরুর সাথে মিলিয়ে রাখে, যা তার সতরের জন্য অধিক উপযোগী। আল্লাহ তাআলা তাকে দেখে (ফিরিশতাদেরকে সম্বোধন করে) বলেন, হে ফিরিশতারা! তোমরা সাক্ষী থাক, আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম। (সুনানে বায়হাকী, হাদীস নং ৩১৯৯)

হাত উত্তোলন সম্পর্কে ভিন্নতা প্রসঙ্গে হযরত ওয়াইল ইবনে হুজরের বর্ণিত হাদীসে এসেছে-

فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا وائل بن حجر، إذا صليت فاجعل يديك حذاء أذنيك، والمرأة تجعل يديها حذاء ثدييها

-হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে ওয়াইল ইবনে হুজর! যখন তুমি নামায শুরু করবে তখন কান বরাবর হাত উঠাবে। আর মহিলা হাত উঠাবে বুক বরাবর। (আল মু'জামুল কাবীর, হাদীস নং ২২)

মৌলিকভাবে নারীদের নামাযের পদ্ধতির বর্ণনা সম্পর্কে হাদীসে এসেছে- **عن ابن عباس أنه سئل عن صلاة المرأة، فقال: تجتمع وتحتفز**

-হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) কে মহিলাদের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন, খুব জড়সড় হয়ে অঙ্গের সাথে অঙ্গ মিলিয়ে নামায আদায় করবে। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ, হাদীস নং ২৭৭৮)

আর এভাবে অন্যান্য স্থানের ভিন্নতা ও হাদীস শরীফের গ্রহণযোগ্য বর্ণনায় আলোকে স্থিরকৃত। তাই এ সম্পর্কে ফুকাহায়ে কিরামের সিদ্ধান্তের বিপরীতে সন্দেহ পোষণ কিংবা প্রশ্ন উত্থাপন অযৌক্তিক।

লিমান হোসাইন
জালালপুর, সিলেট

প্রশ্ন: পুরুষের ক্ষেত্রে হলুদ ও লাল রংয়ের কাপড় পরিধান করার বিধান কি?

জবাব: পুরুষদের জন্য হলুদ ও লাল জামা পরার ব্যাপারে হাদীসে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। উক্ত মাসআলায় উলামায়ে কিরামদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য অভিমত অনুযায়ী গাঢ় এক রংয়ের লাল, কিংবা হলুদ রংয়ের কাপড় পরিধান মাকরূহে তানযিহী। (ইমদাদুল ফাতওয়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৪৫)

সহীহ মুসলিমের এক বর্ণনায় এসেছে-

أخبره، قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين، فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها-

-হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে দুইটি হলুদ রংয়ের কাপড় পরা অবস্থায় দেখলেন এবং বললেন, এই রঙ কাফিরদের জন্য, এই রঙের কাপড় পরিধান করো না। (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২০৭৭)

হযরত উমার (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে লাল রঙের পোশাক পরতে নিষেধ করেছেন। (মুসনাদে আহমাদ, ইবনে মাজাহ, ৩৫৯১)

আদ দুররুল মুখতার গ্রন্থে লিখেছেন, وكره لبس المعصفر والمزعفر الاحمر والاصفر للرجال -পুরুষের জন্য হলুদ ও লাল রংয়ের কাপড় পরিধান করা মাকরূহ। (আদ দুররুল মুখতার, ১ম খণ্ড, ৬৫৪ পৃষ্ঠা)

রদ্দুল মুহতার গ্রন্থে লিখেছেন, তবে শুধু এক কালারের লাল না হয়ে যদি লালের মাঝে অন্য রঙের চেক থাকে তাহলে সেটা পরা জায়িয আছে। তবে অন্য রঙের চেক থাকলেও তাকওয়ার খাতিরে হলুদ ও লাল রঙ এড়িয়ে চলাই উত্তম।

মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী
কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার

প্রশ্ন: সোশ্যাল মিডিয়াগুলোতে অনেকে দুআ করাকে বিদআত বলে থাকেন। বিশেষ করে নামাযের শেষে সম্মিলিত মুনাজাত করা। আবার কেউ কেউ নামাযের নিয়তের উচ্চারণকে বিদআত বলতে শুনেছি। এ সম্পর্কে শরীআতের আলোকে সঠিক সিদ্ধান্ত জানালে উপকৃত হব।

জবাব: নামাযের পর দুআ কিংবা সম্মিলিত মুনাজাত সম্পর্কে পরওয়ানার এ সংখ্যার অন্য প্রশ্নের জবাবে সবিস্তারে জবাব পেয়ে যাবেন।

নামাযের নিয়ত মুখে উচ্চারণ সম্পর্কে ফুকাহায়ে কিরামের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ একে সুন্নাত বলেছেন, কেউ মুস্তাহাব বলেছেন। আবার কেউ ইহাকে বিদআত বলেছেন। তবে এসম্পর্কে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য অভিমত হচ্ছে, ইহা বিদআতে হাসানাহ বা উত্তম। (হাশিয়াতুত তাহতাভী আলা মারাকিল ফালাহ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২২০, ২২১)

এ সম্পর্কে ফাতাওয়া হিন্দিয়া গ্রন্থে চমৎকার রায় প্রদান করে লিখেছেন, অন্তরের নিয়ত সম্পাদনে মৌখিক উচ্চারণ প্রয়োজন নেই। তবে অন্তরের সংকল্পের প্রতি নামাযী ব্যক্তির মনোযোগ সৃষ্টির জন্যে মৌখিক বাক্য সংযোজন হলে ইহা উত্তম।

ولا عبرة للذكر باللسان فإن فعله لتجتمع عزيمة قلبه فهو حسن كذا في الكافي.

(আল ফাতাওয়া আল হিন্দিয়্যাহ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৫)

উল্লেখ্য যে, নামাযের নিয়তের উচ্চারণ মনে মনে তথা নিঃশব্দে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। (মারাকিল ফালাহ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮৪)

গয়াছ আলী সিরাজপুরী
দোয়ারাবাজার, সুনামগঞ্জ

প্রশ্ন: শরীআতের আলোকে নারী ও পুরুষের বিবাহের সঠিক বয়স কত? এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাই।

জবাব: নারী-পুরুষের বিবাহের ক্ষেত্রে বয়সের কোনো সীমা শরীআত নির্ধারণ করেনি। শরীআতের দৃষ্টিতে পিতা-মাতা কিংবা বৈধ অভিভাবক যদি নাবালক নর-নারীকেও বিবাহ করান তাহলে তা বৈধ। এ সম্পর্কে বিদায়াতুল মুতাদী গ্রন্থে লিখেছেন,

ويجوز نكاح الصغير والصغيرة إذا زوجهما الولي بكرا كانت الصغيرة أو ثيبا والولي هو العصبة فإن زوجهما الأب أو الجد فلا خيار لهما بعد بلوغهما وإن زوجهما غير الأب والجد فلكل واحد منهما الخيار إذا بلغ إن شاء أقام على النكاح وإن شاء فسخ

-অপ্রাপ্ত বয়সের ছেলে মেয়ের বিবাহ বৈধ হবে যদি অভিভাবক কর্তৃক সম্পন্ন করা হয়। উক্ত ছেলে মেয়ে কুমার-কুমারী হোক কিংবা না হোক। পিতা কিংবা দাদা বিবাহ করালে বালেগ হওয়ার পর তাদের বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করার কোনো এখতিয়ার থাকবেনা। অন্যান্যরা বিবাহ করালে বালিগ হওয়ার পর ইহা বহাল রাখার কিংবা ছিন্ন করার এখতিয়ার রাখবে। (বিদায়াতুল মুবতাদী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬০; আল হিদায়াহ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৯৩; আল মাবসূত, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ২১২)

উল্লেখ্য যে, বিবাহের জন্য কেবল বালেগ হওয়াই যথেষ্ট নয় বরং ভরন পোষণের ব্যয়ভার সংকুলানে সক্ষম হওয়া প্রয়োজন। পবিত্র কুরআন মাজীদে এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله -যারা বিবাহে সামর্থ নয়, তারা যেন সংযম অবলম্বন করে যে পর্যন্ত না আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেন। (সূরা নূর, আয়াত-৩৩)

মুদ্দাচ্ছির আল আমীন
দক্ষিণ সুরমা, সিলেট

প্রশ্ন: নামাযের মধ্যে স্মার্ট ফোনে অথবা সরাসরি কুরআন শরীফের কপি দেখে পড়ার বিধান কি? এতে নামায শুদ্ধ হবে কি?

জবাব: নামাযে স্মার্ট ফোন কিংবা কুরআন শরীফের কপি দেখে পড়লে বিশুদ্ধ অভিমত অনুযায়ী তার নামায বিনষ্ট হয়ে যাবে। ইমাম আবূ দাউদ তাঁর আল মাসাহিফে বর্ণনা করেন, হযরত উমর (রা.) ইমামগণকে নামাযে কুরআন দেখে পড়তে নিষেধ করতেন। সালফে সালেহীনের অনেকেই নামাযে কুরআন দেখে পড়াকে নিষেধ করতেন। (হাদীস নং ১৮৯, ১৯০, ১৯১)

এ সম্পর্কে আল মুহিতুল বুরহানী গ্রন্থে লিখেছেন, وإذا قرأ المصلي من المصحف فسدت صلاته، وهذا قول أبي حنيفة -নামাযী ব্যক্তি কুরআন শরীফ দেখে কিরাত পড়লে তার নামায নষ্ট হয়ে যাবে। ইহা ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর অভিমত।

(আল মাবসূত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২০১; আল মুহীতুল বুরহানী, ১ন খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৯১; আল ইখতিয়ার লি তা'লীলিল মুখতার, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬২; আল বাহরুর রাইক, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১১; আল আসলু লিশ শায়বানী, মুকাদ্দামাহ, পৃষ্ঠা ২৬৪)

মোহাম্মদ আব্দুল জলিল
সুনামগঞ্জ সদর, সুনামগঞ্জ

প্রশ্ন: ১ আহলে বায়তের নামে ৫টি মোমবাতি জ্বালিয়ে সম্মান করা সম্পর্কে শরীআতে কোন নির্দেশনা আছে কি?

প্রশ্ন: ২ অনেকে নামের সাথে গাজী ব্যবহার করেন, এটা কি জায়িয? প্রকৃত অর্থে গাজী কারা?

জবাব-১: মোমবাতি জ্বালিয়ে কাউকে সম্মান করার কোনো বিধান ইসলামে নেই। ইহা বিজাতীয় সংস্কৃতির আওতাভুক্ত অনর্থক কাজ। চাই সেটা আহলে বায়ত কিংবা অন্য যে কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে হোক তা সর্বাবস্থায় বর্জণীয়।

জবাব-২: গাজী শব্দের উৎপত্তি আরবী غـزوة গাযওয়া শব্দ থেকে। গাজী শব্দের অর্থ ধর্ম যুদ্ধে বিজয়ী বীর। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মুসলিমদের পদবি হিসেবে গাজী শব্দ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। জিহাদে

অংশগ্রহণকারী কেউ বিজয়ী হয়ে ফিরে এলে তাদেরকে গাজী উপাধি দেওয়া হতো। এরা মুসলিম সমাজে সম্মানীয় ব্যক্তিত্ব।

বর্তমান যুগে যারা নামের সাথে গাজী শব্দ ব্যবহার করে থাকেন সেটা তাদের পূর্ব-পুরুষগণের কারো প্রতি সম্পর্কিত বংশগত পদবী হিসেবে লিখা দূষণীয় নয়, যেমন অন্যান্য বংশগত পদবীর ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

মো. লালন আহমদ রাজু

নরসিংপুর, দোয়ারাবাজার, সুনামগঞ্জ

প্রশ্ন: নামাযে প্রথম রাকআতে সূরা ফীল পড়ে দ্বিতীয় রাকআতে সূরা মাউন পড়লে কি নামায মাকরূহ হবে? কোন ধরনের সূরা একটি পড়ে পরের রাকআতে মধ্যখানে একটি বাদ দিয়ে পড়লে মাকরূহ হবে?

জবাব: পাশাপাশি দুই রাকআত নামায পড়ার ক্ষেত্রে মধ্যখানে ছোট একটি সূরা বাদ দিয়ে অন্য দুই সূরা পড়া মাকরূহ। এ সম্পর্কে আদ দুররুল মুখতার কিতাবে লিখেছেন, ويكره الفصل بسورة قصيرة (রদ্দুল মুহতার, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৪৬; আদ দুররুল মুখতার, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭৫)

সুতরাং প্রথম রাকআতে সূরা ফীল পড়ে দ্বিতীয় রাকআতে সূরা মাউন পড়লে মধ্যখানে সূরা কুরাইশ ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ইহা ছোট সূরা সমূহের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় নামায মাকরূহ হবে।

আকবর হোসেন

জগন্নাথপুর, সুনামগঞ্জ

প্রশ্ন: শারীরিক ও মানসিক (অক্ষম) রোগীর জন্য একাকী ও জামাআতের সহিত নামায আদায়ের বিধান কি?

জবাব: শারীরিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তি তার সর্বোচ্চ সাধ্য অনুযায়ী নামায আদায় করবে। মসজিদে যাবার সক্ষমতা থাকলে মসজিদের জামাআতে শামিল হবে, নতুবা ঘরে জামাআতে কিংবা একাকী নামায পড়বে। আর দাঁড়িয়ে নামায আদায়ের ক্ষেত্রে অক্ষম হলে বসে রুকু-সিজদা আদায় করে নামায পড়বে। রুকু-সিজদা আদায়ে অক্ষম হলে ইশারায় রুকু-সিজদা করবে। সিজদায় রুকুর চেয়ে অধিক পরিমাণে মাথা নত করবে। আর যদি বসেও পড়তে না পারে তাহলে কাত হয়ে শুয়ে চেহারা কিবলার দিকে করে নামায পড়বে। যদি কাত হয়ে শুয়ে সম্ভব না হয়, তা হলে চিৎ হয়ে শুয়ে কিবলার দিকে পা দিয়ে নামায পড়বে। এটাও যদি সম্ভব না হয়, তাহলে যেভাবে সম্ভব সেভাবেই পড়বে।

হাদীস শরীফে এসেছে, হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) কে লক্ষ্য করে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তুমি দাঁড়িয়ে নামায পড়ো, যদি না পার তাহলে বসে, যদি না পার তাহলে শুয়ে" (সহীহ বুখারী)

আর মানসিক রোগী যতক্ষণ হুঁশ জ্ঞান থাকবে ততক্ষণ নামাযের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাবে না। অবশ্য অজ্ঞান কিংবা বেহুঁশ রোগী যদি লাগাতার একদিন ও এক রাত কিংবা তার চেয়ে বেশী বেহুঁশ থাকে তাহলে উক্ত সময়ের নামাযের কাযা করতে হবে না। আর যদি এর চেয়ে কম সময় বেহুঁশ থাকে কিংবা কিছুক্ষন বেহুঁশ থাকার পর আবার কিছু সময়ের জন্য হুঁশ ফিরে পায়, তাহলে ছুটে যাওয়া নামাযের কাযা করা আবশ্যক। উল্লেখ্য যে, মানসিক রোগীর জন্য জামাআতে নামায আদায়ের বাধ্যবাধকতা নেই।

মো. আবদুল্লাহ

সুনামগঞ্জ

প্রশ্ন: চার রাকাআত ফরয নামাযে শেষ দুই রাকআতে সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব নাকি সুন্নাত? কেউ ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় ছেড়ে দিলে নামায হবে কি?

জবাব: চার রাকাআত বিশিষ্ট ফরয নামাযের শেষ দুই রাকআতে সূরা ফাতিহা পাঠ মুস্তাহাব। বিশুদ্ধতম অভিমত অনুযায়ী শেষ দুই রাকআতে কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে সূরা ফাতিহা পাঠ ছেড়ে দিলেও তার নামায শুদ্ধ হবে। আর ভুলবশত ছেড়ে দিলে সাহু সিজদা ব্যতীত নামায শুদ্ধ হবে। এ সম্পর্কে আল মাবসূত গ্রন্থে লিখেছেন,

وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يتخير بين قراءة الفاتحة والتسبيح والسكوت ولا يلزمه سجود السهو بترك القراءة فيهما ساهيا، وهو الأصح.

-ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণনা করছেন যে, নামাযী ব্যক্তি (চার রাকাআত ফরয নামাযের) শেষ দুই রাকআতে সূরা ফাতিহা পড়া, তাসবীহ পাঠ কিংবা (তিন তাসবীহ পরিমাণ সময়) চুপ করে থাকার ইচ্ছাধীনতা রাখে। উক্ত দুরাকআতে ভুলে সূরা ফাতিহা না পড়লে তার জন্য সাহু সিজদাহ আবশ্যক নয়। ইহাই বিশুদ্ধতম অভিমত। (আল মাবসূত: ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮৬)

অনুরূপ বাদাইয়ুছ সানায়ী গ্রন্থে লিখেছেন,

وأما في الأخريين فالأفضل أن يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب، ولو سبح في كل ركعة ثلاث تسبيحات مكان فاتحة الكتاب أو سكت – أجزأته صلاته، ولا يكون مسيئا إن كان عامدا، ولا سهو عليه إن كان ساهيا

(বাদাইয়ুছ সানায়ী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১১১)

আবদুল্লাহ

দক্ষিণ সুরমা, সিলেট

প্রশ্ন: ১ সালাতুল ইশা কাযা হলে বিতর নামায কাযা পড়তে হবে কি?

প্রশ্ন:২ আমি একটি এনজিওতে (মাইক্রোক্রেডিট) কম্পিউটার অপারেটর হিসেবে কাজ করি। আমার কাজ হচ্ছে, কেবলমাত্র কম্পিউটারে চিটি পত্র লেখা সহ যাবতীয় কম্পিউটার টাইপিং এর কাজ। ঋন দেওয়া-নেওয়া কিংবা সুদের সাথে আমার কোন সম্পৃক্ততা নেই। কিন্তু ঋনের লেন দেনের লভ্যাংশ থেকে আমার বেতন-ভাতা দেওয়া হয়। উক্ত বেতন-ভাতা আমার জন্য শরীআতের দৃষ্টিতে বৈধ হচ্ছে কি না, জানতে চাই।

জবাব ১ : হ্যাঁ, বিতর নামায ফাওত হলে ইহার কাযা আদায় করা ওয়াজিব। সালাতুল ইশা বিতরসহ ফাওত হলে ইশার ফরযের কাযা পড়া ফরয এবং বিতরের কাযা ওয়াজিব। এ প্রসঙ্গে আল বাহরুর রাইক কিতাবে এসেছে-

والقضاء فرض في الفرض واجب في الواجب سنة في السنة

-ফরয নামাযের কাযা আদায় ফরয, ওয়াজিব নামাযের কাযা আদায় ওয়াজিব এবং সুন্নাত নামাযের কাযা সুন্নাত। (আল বাহরুর রাইক, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮৬; আল ফাতাওয়াল হিন্দিয়্যাহ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১২১)

জবাব ২: উক্ত এনজিওতে যেহেতু সুদভিত্তিক ঋনের আদান প্রদান হয় এবং আপনার বেতন এরই লভ্যাংশ থেকে আসে, তাই উক্ত রোজগার আপনার জন্য হালাল নয়। আপনার কাজ সুদের প্রত্যক্ষ লেনদেন কার্যক্রম থেকে আলাদা হলেও একই প্রতিষ্ঠানে চাকুরীর কারণে পরোক্ষ ভাবে আপনিও সুদসহ তাদের সকল অপকর্মের সহযোগী হিসেবে পরিগণিত হবেন। সুতরাং হালালভাবে জীবিকা নির্বাহের তাগিদে ইহা ছেড়ে সুদমুক্ত যে কোনো হালাল রোজগারের পথ অন্বেষণের চেষ্টা করা উচিত। পবিত্র কুরআন মাজীদে মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب -আর তোমরা পরস্পর নেকী ও খোদাভীরুতামূলক বিষয়ে সহযোগিতা করো, গোনাহ ও সীমালঙ্ঘনে সহযোগিতা করো না, আর আল্লাহকে ভয় কর, নিশ্চয় তিনি কঠিন শাস্তিদাতা। (সূরা মায়িদা, আয়াত-০২)

অভ্যন্তরীণ

বড়াইবাড়ি দিবস পালিত

কুড়িগ্রামের রৌমারীতে ঐতিহাসিক বড়াইবাড়ি দিবস পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষে গত ১৮ এপ্রিল রৌমারীর বড়াইবাড়ি বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) ক্যাম্পে শহীদদের স্মরণে নির্মিত স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ, মিলাদ মাহফিল ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে কুড়িগ্রাম জেলার একটি গ্রাম বড়াইবাড়ি। সীমান্তের অপর পাশে ভারতের আসাম রাজ্য। ২০০১ সালের ১৮ এপ্রিল এই গ্রামে ঘটে যায় বাংলাদেশ ও ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর মধ্যে ইতিহাসের সবচেয়ে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ। সে সংঘর্ষে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বা বিএসএফ'র ১৬ জন এবং বাংলাদেশের তৎকালীন সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিডিআরের (এখন বিজিবি) ২ জন সৈন্য নিহত হয়।

এ বছর বড়াইবাড়ি দিবস উপলক্ষে বিবিসি বাংলা যুদ্ধের কারণ ও প্রেক্ষাপট নিয়ে এক বিশেষ প্রতিবেদন প্রকাশ করে। প্রতিবেদনে বলা হয়, ১৮ই এপ্রিল ভোর রাতে গ্রামের কয়েকজন বাসিন্দা তাদের কৃষিজমিতে সেচ কাজ দেখতে যান। এ সময় তারা দেখেন, ধানক্ষেতে বহু বিএসএফের সৈন্য অস্ত্র নিয়ে হাঁটছে। *(এরপর পৃষ্ঠা ৫২-এর কলাম ২)*

খাদ্যকষ্টে ৮০ ভাগ দরিদ্র পরিবার

করোনার অতিমারির প্রভাবে সাধারণ মানুষের আয় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমেছে। আয় কমে যাওয়ায় দেশের ৮০ ভাগ দরিদ্র পরিবার তাদের নিত্যদিনের খাবার খরচ কমিয়ে ব্যয়ের সমন্বয় করছেন। যেভাবে দরিদ্র পরিবারগুলো খাদ্য খরচ কমাচ্ছে তাতে করে ভবিষ্যতে পুষ্টিহীনতা বাড়তে পারে। এছাড়া ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছে ৬০ শতাংশ পরিবার। এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম বাংলাদেশ আয়োজিত এক জরিপে এ তথ্য উঠে এসেছে। এই জরিপে চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশ জুড়ে প্রায় ১ হাজার ৬০০ খানায় একটি সমীক্ষা চালানো হয়েছে। সমীক্ষায় দেখা গেছে, গত মার্চ ২০২০-এর তুলনায় ফেব্রুয়ারি ২০২১-এ প্রান্তিক গোষ্ঠীর আয় ১৫ দশমিক ৮ শতাংশ ও ব্যয় ৮ দশমিক ১ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। এই পরিবারগুলোর প্রায় ৭৮ দশমিক ৮ শতাংশ অতিমারির ফলে আর্থিক সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিল। এদের মধ্যে ৭৮ দশমিক ৫ শতাংশ পরিবারে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার হয়নি। সমীক্ষা করা পরিবারের প্রায় ৬০ দশমিক ৮ শতাংশ পরিবারকে বিকল্প পন্থা হিসেবে ঋণ নিতে হয়েছিল এবং সেটি পরিশোধ করতে তাদের গড়পড়তা প্রায় দুই বছর সময় লাগতে পারে।

৩০২০ কোটি টাকার কৃষিযন্ত্র পাচ্ছেন কৃষকরা

সারা দেশে কৃষকদের মধ্যে কম্বাইন হারভেস্টার, রিপারসহ ৩ হাজার কোটি টাকার বিভিন্ন কৃষিযন্ত্র বিতরণ করা হবে। চলতি ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রকল্পের আওতায় দেশের ৫০০টি উপজেলায় এক হাজার ৬১৭টি কম্বাইন হারভেস্টার, ৭০১টি রিপার, ১৮৪টি রাইস ট্রান্সপ্লান্টারসহ মোট ৫ হাজার ৭৭৬টি কৃষিযন্ত্র বিতরণ করা হবে। যন্ত্রগুলো কৃষিকাজের খরচ কমিয়ে মুনাফা বাড়াবে এবং কৃষকদের সময়মতো বীজ বুনতে ও ফসল কাটতে সহায়তা করবে। এ ছাড়াও, রয়েছে সিডার, বেড প্ল্যান্টার, পাওয়ার থ্রেশার, মেইজ শেলার, ড্রায়ার, পটেটো ডিগার ও চিপস বানানোর যন্ত্র। সরকারের কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্পের আওতায় আগামী ৫ বছরে প্রায় ৫১ হাজার ৩০০টি কৃষিযন্ত্র ৭০ শতাংশ ভর্তুকিতে হাওড় ও উপকূলীয় জেলাগুলোতে এবং দেশের বাকি অংশে ৫০ শতাংশ ভর্তুকিতে বিতরণ করা হবে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর জানায়, ৪৮ লাখ হেক্টর জমির বোরো ধানের পুরোটা যন্ত্র দিয়ে কাটতে পারলে পাঁচ হাজার ২৭১ কোটি টাকা সাশ্রয় করা সম্ভব হবে।

ভোটার হতে প্রবাসীদের আবেদনের সুযোগ

২০২৫ সালের মধ্যে দেশের সব ভোটারের হাতে দেওয়া হবে উন্নতমানের স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র। এ লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন (ইসি) নতুন প্রকল্পে আরো ৩ কোটি স্মার্ট পার্সোনালাইজেশন ও বিতরণ পরিকল্পনা করছে। এদিকে প্রবাসী বাংলাদেশিরা জাতীয় পরিচয়পত্রের সেবা তথা ভোটার হওয়ার জন্য যে কোনো দেশ থেকে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। ইসি সূত্রে এসব তথ্য পাওয়া গেছে। করোনা মহামারির কারণে সশরীরে উপস্থিত হওয়ার কার্যক্রম আটকে থাকলেও অনলাইনে আবেদন করার সুযোগ রয়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে বাকি কাজ সম্পন্ন করা হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে মালয়েশিয়া, সৌদি আরব, আরব আমিরাত এবং যুক্তরাজ্য থেকে হাজার খানেক আবেদন অনলাইনে জমা পড়েছে।

জনপ্রতি ফিতরা সর্বোচ্চ ২৩১০, সর্বনিম্ন ৭০ টাকা

এ বছর ফিতরার হার জনপ্রতি সর্বোচ্চ ২ হাজার ৩১০ টাকা এবং সর্বনিম্ন ৭০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ইসলামী শরীআহমতে, গম, আটা, যব, কিসমিস, খেজুর, পনির ইত্যাদির যেকোনো একটি দ্বারা ফিতরা প্রদান করা যায়। উন্নত মানের গম বা আটা দিয়ে ফিতরা আদায় করলে ১ কেজি ৬৫০ গ্রাম বা এর বাজার মূল্য ৭০ টাকা দিতে হবে। যব দিয়ে আদায় করলে ৩ কেজি ৩০০ গ্রাম বা এর বাজার মূল্য ২৮০ টাকা, কিসমিস দিয়ে করলে ৩ কেজি ৩০০ গ্রাম বা এর বাজার মূল্য ১ হাজার ৩২০ টাকা, খেজুর (মরিয়ম) দিয়ে করলে ৩ কেজি ৩০০ গ্রাম বা এর বাজার মূল্য ১ হাজার ৬৫০ টাকা, পনির দিয়ে করলে ৩ কেজি ৩০০ গ্রাম বা এর বাজার মূল্য ২ হাজার ৩১০ টাকা করে ফিতরা দিতে হবে। দেশের সব বিভাগ থেকে সংগৃহীত গম, আটা, যব, কিসমিস, খেজুর ও পনিরের বাজার মূল্যের ভিত্তিতে এ ফিতরা নির্ধারণ করা হয়েছে। এসব পণ্যের স্থানীয় খুচরা বাজার মূল্যের তারতম্য রয়েছে। স্থানীয় মূল্যে ফিতরা পরিশোধ করা উত্তম।

বাঁশখালীতে পুলিশের গুলিতে ৭ শ্রমিক নিহত

চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে নির্মাণাধীন কয়লাবিদ্যুৎকেন্দ্রে বকেয়া বেতন ভাতা বিভিন্ন দাবিতে বিক্ষোভের সময় পুলিশের গুলিতে ৭ শ্রমিক নিহত হয়েছেন। গত ১৭ এপ্রিল সকালে শ্রমিকরা 'এস আলম ' কর্তৃপক্ষকে বিভিন্ন দাবি জানালে কর্তৃপক্ষ অস্বীকৃতি জানায়। প্রতিবাদে আন্দোলন করতে থাকে শ্রমিকরা। পরে পুলিশ আন্দোলন থামানোর চেষ্টা করলে এক পযার্য়ে শ্রমিক-পুলিশ সংঘর্ষ বাধে। এতে পুলিশের এলোপাতাড়ি গুলিতে ঘটনাস্থলে ৫ জন নিহত ও শতাধিক আহত হন। ২২ এপ্রিল পর্যন্ত গুলিবিদ্ধ শ্রমিকের নিহতের সংখ্যা দাঁড়ায় সাতে।

৫ তারিখের মধ্যে বেতন পরিশোধ, পবিত্র রামাদান মাসে কর্মঘণ্টা ১০ ঘণ্টা থেকে কমিয়ে ৮ ঘণ্টা করা, শুক্রবার ৮ ঘণ্টা থেকে কমিয়ে ৪ ঘণ্টা করাসহ নানা দাবিতে বিক্ষোভ করেন বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণকাজের শ্রমিকেরা। বিক্ষোভর একপর্যায়ে পুলিশের ওপর ইটপাটকেল নিক্ষেপ করেন কিছু শ্রমিক। তখনই পুলিশ গুলি ছুড়তে থাকে। সংঘর্ষ ও ক্ষয়ক্ষতির ঘটনায় পুলিশ ও মালিকপক্ষ বাদী হয়ে পৃথক দুটি মামলা করা হয়েছে। এতে ২২ জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাতপরিচয়ে সাড়ে তিন হাজার জনকে আসামি করা হয়েছে। বাঁশখালী বিদ্যুৎকেন্দ্র ঘিরে এর আগে ২০১৬ ও ২০১৭ সালেও হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে এবং সেসব ঘটনায় কমপক্ষে ৬ জন নিহত ও শতাধিক আহত হলেও ওই হত্যাকাণ্ডের কোনো সুষ্ঠু বিচার হয়নি।

দক্ষিণ এশিয়ার অর্থনীতিতে দ্বিতীয় হতে পারে বাংলাদেশ

করোনার প্রভাব কাটিয়ে অর্থনীতি পুনরায় ভালো করবে দক্ষিণ এশিয়া। ২০২১ অর্থবছরে দক্ষিণ এশিয়ার মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) গড় প্রবৃদ্ধি দাঁড়াতে পারে ৭ দশমিক ২ শতাংশ। তারপরের ২০২২ অর্থবছরে একটু কমে গড় প্রবৃদ্ধি হতে পারে ৪ দশমিক ৪ শতাংশ। 'সাউথ এশিয়ান ইকোনমিকস বাউন্স ব্যাক বাট ফেস ফ্রাজিল রিকভারি' শীর্ষক এক প্রতিবেদনে এসব তথ্য জানিয়েছে বিশ্ব ব্যাংক। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে চলতি অর্থবছরে সবচেয়ে ভালো করবে মালদ্বীপ। তারপর বাংলাদেশ। তারপরের অর্থবছরেও সবচেয়ে ভালো করবে মালদ্বীপ, তারপর ভারত এবং তৃতীয় স্থানে চলে যাবে বাংলাদেশ। তাদের পূর্বাভাস অনুযায়ী, ২০২১-২২ অর্থবছরে (জুন-জুলাই) বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি হতে পারে ৫ দশমিক ১ শতাংশ। তারপরের ২০২২-২৩ অর্থবছরে এ দেশে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হতে পারে ৬ দশমিক ২ শতাংশ।

আন্তর্জাতিক

ভারতে লাশের মিছিল: চিতা জ্বলছে দিনরাত

ভারতে করোনায় মৃত্যুর সংখ্যা ব্যাপক হারে বেড়েছে। চাপ পড়েছে শ্মশান ও কবরস্থানে। করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়া লাশ দাহ করার জন্য শ্মশানে এক টুকরো জায়গা পেতে দুদিনের বেশি সময় অপেক্ষা করতে হচ্ছে। করোনায় মৃত ব্যক্তিদের দাহ করার করুণ চিত্র উঠে এসেছে রয়টার্সের একটি ছবিতে। ড্রোন থেকে তোলা ছবিতে দেখা যায়, দিল্লির একটি শ্মশানে সারি সারি চিতা জ্বলছে। এর আগে গুজরাট, মধ্যপ্রদেশের জেলাগুলোতে শ্মশানের বাইরে মরদেহ নিয়ে সারি সারি অ্যাম্বুলেন্স দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। দিনরাত চিতা পুড়তে থাকায় শ্মশানের চিমনি ফেটে যেতে পারে, চিতা জ্বালানোর জন্য কাঠের সংকট দেখা দিয়েছে বলে জানাচ্ছেন ডোম ও স্বেচ্ছাসেবীরা।

ভারতে করোনার দ্বিতীয় বর্ষে প্রতিদিনই আক্রান্ত ও মৃত্যুতে রেকর্ড হচ্ছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ওয়েবসাইটে দেওয়া তথ্যমতে, ভারতে সংক্রমণের সংখ্যা ১ কোটি ৮৭ লাখ ছাড়িয়েছে। গত ২৯ এপ্রিল ২৪ ঘণ্টায় মারা গেছেন ৩ হাজার ৫০১ জন। কেবল অক্সিজেনের অভাবে দিল্লির গঙ্গারাম হাসপাতালে ২৫ জন এবং মুম্বাইর গোল্ডেন হাসপাতালে ২০ জন রোগী মারা গেছেন। এর আগে জাকির হোসেন হাসপাতালে অক্সিজেন ট্যাঙ্কার লিক হয়ে অক্সিজেন না পেয়ে আরো ২২ জন রোগী মারা যান।

দ্য হিন্দুর খবরে বলা হয়েছে, ভারতে অক্সিজেন সংকট নিরসনে ৮০ মেট্রিক টন তরল অক্সিজেন প্রেরণ করেছে সৌদি আরব। সিঙ্গাপুরের অক্সিজেন সিলিন্ডার ইতোমধ্যে দিল্লি পৌঁছে গেছে। পাকিস্তানও অক্সিজেন প্রেরণের প্রস্তাব দিয়েছে।

রোযা উপলক্ষে কাতারে পণ্যের মূল্য হ্রাস

রামাদান উপলক্ষ্যে ৬৫০টি পণ্যের দাম কমানোর ঘোষণা দিয়েছে কাতার সরকার। দেশটির শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের টুইট বার্তায় বলা হয়, ২০২১ সালের রামাদান উপলক্ষে ক্রেতাদের জন্য ৬৮০টি পণ্যের দাম কমানো হয়েছে। সেসব পণ্যের তালিকা টুইটে দেওয়া হয়। মন্ত্রণালয়ের ঘোষণা অনুযায়ী, এটি ৫ এপ্রিল থেকে শেষ রোযা পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য পণগুলো হচ্ছে, পাস্তা, চিনি, ফুল, মুরগি, মিল্ক ওয়েল, মধু, মাখন ও চালসহ অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য। এদিকে তালিকাভুক্ত সব পণ্যের দাম কম রাখা হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করতে রামাদান মাস জুড়েই নিয়মিত অভিযান চালানো হবে বলেও জানিয়েছে মন্ত্রণালয়।

বিশ্বে খাদ্যের দাম ৭ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ

গত বছর থেকে চলতি বছরের মার্চ মাস পর্যন্ত টানা দশম মাসের মতো বিশ্ববাজারে এই উল্লম্ফন দেখা গেছে।

২০১৪ সালের জুনের পর খাবারের দাম এতটা কখনোই বাড়েনি। জাতিসংঘের খাদ্য সংস্থা (ফাও) এই তথ্য জানিয়েছে। ফাও-এর খাদ্য মূল্যসূচকে মার্চে শস্য, তেলবীজ, দুগ্ধজাত পণ্য, মাংস এবং চিনির দরের পয়েন্ট ছিল ১১৮.৫। ফেব্রুয়ারিতে এটি ছিল ১১৬.১। ফাও বলছে, ২০২০ সালে সারা বিশ্বে শস্যের রেকর্ড ফলন হয়েছে। ২০২১ সালেও বাম্পার ফলন হবে এবং তা আগের বছরের রেকর্ডকেও ভেঙে ফেলতে পারে। ফাওয়ের শস্য মূল্যসূচক ১.৭ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। টানা আট মাস পর শস্যের দর কমল। তবে গত বছরের একই সময়ের তুলনায় খাদ্যশস্যের দর সাড়ে ২৬ শতাংশ বেশি। গুরুত্বপূর্ণ শস্যের মধ্যে গমের রপ্তানি মূল্য সবচেয়ে বেশি কমেছে। ফেব্রুয়ারির তুলনায় দাম কমেছে ২.৪ শতাংশ। উদ্ভিদজাত তেলের দর ৮ শতাংশ বেড়েছে। এটি ২০১১ সালের জুনের পর সর্বোচ্চ দর।

ফিলিস্তিনে বাইডেনের সহায়তা আটকে গেল

সম্প্রতি ফিলিস্তিনিদের আবারো সহায়তা দেওয়ার উদ্যোগ নেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। একইসঙ্গে দ্বি-রাষ্ট্র সমাধানেরও আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। হোয়াইট হাউসের এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানানো হয়। দেশটির পররাষ্ট্র দপ্তর থেকে বলা হয়েছে, সহায়তা হিসেবে সাড়ে ২৩ কোটি মার্কিন ডলার দেবে যুক্তরাষ্ট্র। এর মধ্যে ১৫ কোটি ডলার জাতিসংঘ সংস্থায়, সাড়ে ৭ কোটি পশ্চিম তীর ও গাজার অর্থনীতি ও উন্নয়ন সহায়তা হিসেবে এবং শান্তি স্থাপন প্রচেষ্টার জন্য এক কোটি ডলার দেবে। কিন্তু মার্কিন কংগ্রেসের পররাষ্ট্র সম্পর্ক বিষয়ক সিনেট কমিটির সদস্য জেমস রিশ এবং প্রতিনিধি পরিষদের সদস্য মাইকেল ম্যাককাউল সাড়ে সাত কোটি ডলারের তহবিল আটকে দেন। চরম ইসরাইলপন্থী নীতি অনুসরণের কারণে মার্কিন সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ২০১৮ সালে ফিলিস্তিনিদের জন্য অর্থ বরাদ্দ বাতিল করেছিলেন। এই আটকে দেওয়া সাড়ে সাত কোটি ডলার তারই অংশ। দ্য হিল

যুক্তরাষ্ট্রে মুসলিম ফেডারেল বিচারক

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে এই প্রথমবার একজন মুসলিম ফেডারেল বিচারপতি পেতে চলেছে যুক্তরাষ্ট্র। জাহিদ কোরেশি নামক এক পাকিস্তানি বংশোদ্ভূতকে ফেডারেল বিচারকের পদের জন্য মনোনীত করেছেন জো বাইডেন। যদি সিনেটে তার মনোনয়ন নিশ্চিত হয়, তাহলে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই পদে দায়িত্ব পালনকারী প্রথম মুসলিম হবেন। বর্তমানে তিনি নিউ জার্সিতে ম্যাজিস্ট্রেট বিচারক হিসেবে কাজ করছেন। গত ৪ বছর ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দেখেছে বৈষম্যমূলক আচরণ। হোয়াইট হাউজসহ বিভিন্ন সরকারি পদে মূলত সাদা চামড়ার মার্কিন নাগরিকদেরই ঠাঁই হয়েছে ট্রাম্পের আমলে। সেই বৈষম্যকে এবার ভেঙে দিচ্ছেন জো বাইডেন। এবিসি নিউজ

ইসরাইলি ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিহত করলো সিরিয়া

আবারো সিরিয়ার উপর ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে ইহুদিবাদী ইসরাইলের সামরিক বাহিনী। তবে তা প্রতিহত করেছে সিরিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। গত ৮ এপ্রিল সকালে এ হামলা চালায় ইসরাইল। সিরিয়ার সামরিক বাহিনীর বরাত দিয়ে রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা সানা জানিয়েছে, সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কের কাছে ইসরাইলের ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিহত করা হয়। দখলদার ইহুদিবাদীদের হামলায় সিরিয়ার চারজন সেনা আহত হয়েছেন। এছাড়া কিছু সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হয়। সিরিয়ার সামরিক সূত্র জানিয়েছে লেবাননের আকাশসীমা ব্যবহার করে দখলদার ইসরাইল এসব ক্ষেপণাস্ত্র ছোঁড়ে। তবে সিরিয়ার আকাশ প্রতিরক্ষা বিভাগ বেশিরভাগ ক্ষেপণাস্ত্র ভূপাতিত করতে সক্ষম হয়। এএইচপি

বড়াইবাড়ি দিবস *(৫১পৃষ্ঠার পর)*

বিএসএফের সৈন্যরা গ্রামবাসীর কাছে হিন্দি ভাষায় জানতে চান, বিডিআরের ক্যাম্প কোথায়? বাংলাদেশের সীমান্তের ভেতরে বিএসএফ ঢুকে পড়ার খবরটি দ্রুত বিডিআর ক্যাম্পে পৌঁছে দেওয়া হয়। স্থানীয়দের বর্ণনামতে, আনুমানিক কয়েকশ বিএসএফ সদস্য বাংলাদেশের ভেতরে প্রবেশ করেছিল। বিএসএফদের রুখতে গুলি চালান বিডিআর সদস্যরা। শুরু হয় গোলাগুলি। ক্যাম্পের আটজন বিডিআর সদস্য প্রচণ্ড মনোবল এবং সাহস নিয়ে প্রথম চার ঘণ্টা লড়াই চালিয়ে গেছেন। এরই মধ্যে আশপাশের আরো দুটি বিডিআর ক্যাম্প থেকে আরো ২০জন সদস্য বড়াইবাড়িতে আসেন। ময়মনসিংহ এবং জামালপুর থেকে সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ বিডিআরের আরো কিছু সদস্য সেখানে পৌঁছান। ভোর পাঁচটা থেকে সকাল এগারোটা পর্যন্ত একটানা গোলাগুলি হয়। এরপর কিছুক্ষণ বিরতি দিয়ে আবারো শুরু হয় গোলাগুলি। এভাবে ১৯শে এপ্রিল রাত পর্যন্ত থেমে থেমে গোলাগুলি চলে। স্থানীয় বাসিন্দা এবং তৎকালীন বিডিআর সদস্যদের দাবি ছিল, সে ঘটনায় বিএসএফ'র আরো বেশি সৈন্য মারা গেলেও অনেকের মৃতদেহ তারা ভারতে নিয়ে যায়। যে ১৬ জন সৈন্যের মৃতদেহ নিতে পারেনি সেগুলো বাংলাদেশের সীমান্তের ভেতরে ধানক্ষেতে পাওয়া যায়।

বিডিআরের তৎকালীন মহাপরিচালক মেজর জেনারেল (অব.) ফজলুর রহমান ২০১২ সালে বিবিসি বাংলাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, এ ঘটনার সূত্রপাত হয়েছিল সিলেটের পদুয়াতে। সেখানে বাংলাদেশের সীমান্তের ভেতরে ভারতের বিএসএফ একটি ক্যাম্প করে দীর্ঘদিন সে জায়গা দখল করে রেখেছিল। রৌমারি সংঘাতের পর অনেকে বিডিআরের ভূমিকাকে সাহসী হিসেবে বর্ণনা করেন।

জানার আছে অনেক কিছু

প্রাণিবৈচিত্র্য

বাদুড় একমাত্র স্তন্যপায়ী প্রাণী যে উড়তে পারে
হাতি একমাত্র স্তন্যপায়ী প্রাণী যে লাফাতে পারে না
পিঁপড়া কখনও ঘুমায় না
ব্যাঙ চোখ খোলা রেখে ঘুমায়
সাপ জিহ্বা দ্বারা গন্ধ নিয়ে থাকে
জিরাফ শিং নিয়ে জন্মগ্রহণ করে
উটপাখি, ইমু ও প্যাঙ্গুইন পাখি হলেও উড়তে পারে না
রেডলিপ ব্যাটফিশ মাছ হলেও সাঁতার কাটতে পারে না
জিরাফ শব্দ করতে পারে না
ক্যাঙ্গারু র‍্যাট কখনও পানি পান করে না।

টিকটিকি

টিকটিকির বৈজ্ঞানিক নাম Hemidactylus frenatus। দেখতে অনেকটা কুমিরের মতো মনে হলেও কুমিরের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই।

এরা সাধারণত তিন থেকে ছয় ইঞ্চি লম্বা হয়।

বেশিরভাগ টিকটিকিই নিশাচর। রাতে বিভিন্ন আলোকোজ্জ্বল স্থানে খাদ্য সংগ্রহের জন্য বের হয় এবং ভোর হওয়ার আগেই তার বাসায় চলে আসে।

খাবারের স্বাদের চাইতে নিরাপত্তাকে টিকটিকি অধিক গুরুত্ব দেয়। এজন্য দেয়ালের ফাটল বা তাৎক্ষণিক পালিয়ে যাওয়ার জন্য উপযুক্ত স্থান দেখে তারপর টিকটিকি খাদ্য শিকার করে।

মাকড়সা ও তেলাপোকা ধরতে গলদর্ম হলেও এরা টিকটিকির অত্যন্ত প্রিয় খাবার।

পায়ের আঠালো আঙুলের সাহায্যে পায়ের নিচ বায়ুশূন্য করে এরা মসৃণ দেয়ালেও সহজে চলাচল করতে পারে। হঠাৎ এর ব্যতিক্রম হলে নিচে পড়ে যায়।

বাংলাদেশ, মিয়ানমার, লাওস, থাইল্যান্ডে 'উড়ুক্কু টিকটিকি' নামেও একধরনের টিকটিকির খোঁজ মিলে। যারা গাছ থেকে গাছে উড়তে পারে। শরীরের রঙ পরিবর্তন করতে পারে বলে সহজে এদের দেখা যায় না।

এদের রক্তে লোহিত কণিকা নেই বলে রক্ত সাদা দেখায়।

নখ-চুলে রক্তনালি নেই বলে আমরা নখ-চুল কাটলে ব্যথা পাই না। লেজের আগেই টিকটিকির রক্তনালি থেমে যায়। এজন্য লেজ খসে পড়লে এরা বুঝতে পারে না।

শীতল রক্তের এই প্রাণীটি সাধারণত পাঁচ বছরের মতো বাঁচে।

দারাসবাড়ি জামে মসজিদ

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার ওমরপুরে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম প্রাচীন মসজিদ দারাসবাড়ি জামে মসজিদ অবস্থিত। জানা যায়, সুলতান শামস উদ্দিন শাহ'র নির্দেশে ১৪৭৯ খ্রিষ্টাব্দে মসজিদটি নির্মিত হয়। মসজিদটির প্রাচীন নাম ছিল ফিরোজপুর মসজিদ। ১৫০২ সালে সুলতান হোসেন শাহ কর্তৃক দারাসবাড়ি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে ফিরোজপুর নামটি ধীরেধীরে হারিয়ে যায়। ১৮শ শতকে ইংরেজ জেনারেল কানিংহাম মসজিদ সংলগ্ন একটি মাদরাসার ধ্বংসাবশেষ দেখতে পান। তিনি জায়গাটিতে অনুসন্ধানের জন্য প্রত্নতত্ত্ববিদদের নির্দেশ দেন। মূলত, কানিংহামের উদ্যোগেই মসজিদটি আবিষ্কৃত হয়। ৯৯ ফুট দৈর্ঘ্য এবং ৩৪ ফুট প্রস্থ মসজিদটিতে ৯টি গম্বুজ এবং ৩টি জানালা রয়েছে। খননের সময় পাওয়া শাহী লিপিটি বর্তমানে কলকাতা যাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর বর্তমানে মসজিদটি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছে।

*সংকলনে: **মোহাম্মদ সিদ্দীক হায়দার***

শব্দ শিখি

EARTH শব্দটি আরবী الأَرْض (আরদ) থেকে এসেছে। যার অর্থ পৃথিবী। পবিত্র কুরআনে বহু জায়গায় শব্দটি রয়েছে। একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায়, আরবী 'আরদ' ও ইংরেজি 'আর্থ' খুবই কাছাকাছি। ইংরেজিতে এর ব্যবহার শুরু হয় প্রায় এক হাজার বছর আগে।

বিজ্ঞান

শিশুদের শরীরে হাড় বেশি থাকে!

মানুষের শরীরের মূল কাঠামো বা কঙ্কাল প্রধানত হাড় দ্বারা গঠিত। একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের তুলনায় একটি শিশুর শরীর যেহেতু অনেক ছোট, তাই আমাদের মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, শিশুদের শরীরে হয়তো প্রাপ্তবয়স্কদের তুলনায় অনেক কম হাড় থাকে। কিন্তু বিজ্ঞানীদের হিসাব ঠিক বিপরীত! তাদের মতে, জন্মের সময় একটি শিশুর শরীরে যে পরিমাণ হাড় থাকে, সেই শিশুটি প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তার শরীরের হাড়ের সংখ্যা আরো কমে যায়। বিজ্ঞানীদের মতে, নবজাতকের শরীরে প্রায় ৩০০টি হাড় থাকে। কিন্তু একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের শরীরে হাড় থাকে মাত্র ২০৬টি। তাহলে বাকি হাড়গুলোর কী হয়? আসলে মানুষের শরীর যখন একটু একটু করে বড় হতে শুরু করে, তখন শরীরের ভিতরে অনেকগুলো হাড় জোড়া লেগে যায়। ফলে শিশুর শরীরের একাধিক হাড় প্রাপ্তবয়স্ক শরীরের একটি হাড়ে রূপান্তরিত হয়। এ জন্যই বয়স বাড়ার সাথে সাথে মানবদেহে হাড়ের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পেলেও কমে যায় হাড়ের সংখ্যা।

চাঁদে গেলে ওজন কমবে!

আমরা সাধারণত নিজেদের ওজন কমানোর জন্য বহু কসরত করে থাকি। তবে এসকল কসরত না করেই সহজে ওজন কমানোর একটা উপায় আছে। তবে সে জন্য আপনাকে পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করতে হবে। পৃথিবী থেকে যদি আপনি চাঁদে চলে যান, তবে আপনার ওজন হয়ে যাবে ছয় ভাগের এক ভাগ। অর্থাৎ ৯০ কেজি ওজনের একজন মানুষ যদি চাঁদে চলে যেতে সক্ষম হন, তবে তার ওজন হবে মাত্র ১৫ কেজি। এ হিসাব অবশ্য শুধু মানুষের জন্য প্রযোজ্য নয়, বরং পৃথিবীর যে কোন জিনিসেরই ওজন চাঁদে গেলে ছয় ভাগের এক ভাগ হয়ে যাবে। তার কারণ চাঁদের মধ্যাকর্ষণ শক্তি পৃথিবীর তুলনায় ছয় ভাগের এক ভাগ।

শুধু যে চাঁদেই এরকম হয়, বিষয়টা কিন্তু এমন নয়। বরং পৃথিবীর বাইরের যেখানেই যাবেন, মধ্যাকর্ষণ শক্তির কমবেশির কারণে ওজনেরও কিছুটা পার্থক্য হবেই। উদাহরণস্বরূপ বৃহস্পতিগ্রহের কথা বলা যায়। যদিও এখন অবধি বিজ্ঞান বৃহস্পতি গ্রহে পৌঁছাতে সক্ষম হয়নি, তবু মধ্যাকর্ষণের হিসাব কষে জানিয়ে দিয়েছে যে আপনি যদি কোনভাবে বৃহস্পতিগ্রহে পা রাখতে সক্ষম হন, তবে আপনার ওজন দ্বিগুণ হয়ে যাবে। অর্থাৎ পৃথিবী থেকে কোনভাবে বৃহস্পতিতে যেতে পারলে ৪৫ কেজি ওজন থেকে এক লাফে আপনার ওজন হয়ে যেতে পারে ৯০ কেজি!

মানবদেহে ব্যাক্টোরিয়ার বসতি

ভাইরাস, ব্যাক্টোরিয়া এসবের নাম শুনলেই আমাদের মাথায় চলে আসে জটিল জটিল নানা ধরনের রোগের কথা। কারণ আমরা সাধারণত জানতে পারি যে, বেশির ভাগ রোগের পিছনেই বিভিন্ন ভাইরাস কিংবা ব্যাক্টোরিয়াই দায়ী থাকে। সে জন্য এ সব থেকে মুক্ত থাকার জন্য নানা রকমের সচেতনতাও আমরা অবলম্বন করে থাকি।

কিন্তু আপনি কি জানেন, আপনার শরীরে সাধারণত কী পরিমাণ ব্যাক্টোরিয়া বসবাস করে? গবেষকদের দাবি, একজন মানুষের শরীরে যে পরিমাণ মানবদেহের কোষ থাকে, তার চেয়ে দশগুণ বেশি থাকে ব্যাক্টোরিয়ার কোষ। অবশ্য এ হিসাব শুনে ভয় পেয়ে যাওয়ার কোন কারণ নেই। কেননা সব ব্যাক্টোরিয়াই রোগ সৃষ্টি করে না, বরং আছে অনেক উপকারী ব্যাক্টোরিয়াও। সত্যি বলতে কী, টিকে থাকার জন্য আমরা বিভিন্ন ধরনের ব্যাক্টোরিয়ার উপর নির্ভরশীলও বটে। উদাহরণস্বরূপ খাদ্য থেকে পুষ্টি ও শক্তি গ্রহণের ক্ষেত্রেও মানুষের শরীর কিন্তু এক ধরনের ব্যাক্টোরিয়ার উপর নির্ভরশীল।

অক্টোপাসের অদ্ভুত দেহ

আমরা কারো নির্বুদ্ধিতা দেখে অনেক সময় বলে থাকি, ওই মানুষের কি ব্রেইন নেই? তবে ব্রেইন থাকাই যদি বুদ্ধিমান হওয়ার একমাত্র কারণ হতো, তাহলে অন্য সকল প্রাণীর চেয়ে বুদ্ধিতে এগিয়ে থাকতো অক্টোপাস। কারণ আর সকলে যেখানে একটি ব্রেইন দিয়েই কাজ চালিয়ে থাকে, সেখানে অক্টোপাসের আছে ৯টি ব্রেইন! ওদের একটি প্রধান ব্রেইন আছে, যা কেন্দ্রীয় বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্তগ্রহণের দায়িত্ব পালন করে থাকে। আর ওর আটবাহু পরিচালনায় প্রধান ব্রেইনটিকে সহায়তা করার জন্য আছে আরো ৮টি সহায়ক ব্রেইন।

আটবাহুবিশিষ্ট এই প্রাণিটি যে শুধু ব্রেইনের দিক থেকে এগিয়ে আছে, তা কিন্তু নয়। হৃদয় বা হার্টের দিক থেকেও অক্টোপাস অন্যদের চেয়ে এগিয়ে। অক্টোপাসের মোট ৩টি হার্ট বা হৃদয় রয়েছে।

অক্টোপাসের শরীরের আরেকটি অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য হলো এর রক্তের রঙ। অক্টোপাসের রক্ত কিন্তু আমাদের রক্তের মতো লাল নয়, বরং নীল। মানুষের রক্তের রঙ লাল, কারণ রক্তে হিমোগ্লোবিন রয়েছে, যা মূলত লৌহ দিয়ে গঠিত। অক্টোপাসের দেহে হিমোগ্লোবিন নেই, বরং এই হিমোগ্লোবিনের দায়িত্ব পালনের জন্য রয়েছে সিয়ানোগ্লোবিন। অবশ্য হিমোগ্লোবিনের তুলনায় সিয়ানোগ্লোবিন কিছুটা কম কার্যকর, এ জন্য অক্টোপাসের দৈহিক সক্ষমতা বা টিকে থাকার ক্ষমতা কিছুটা কমই হয়ে থাকে।

প্রতি মিনিটে সারা শরীর ঘুরে বেড়ায় প্রতিটি রক্তকণা

সাধারণত একজন সুস্থ মানুষের শরীরে কমবেশ ৫ লিটারের মতো রক্ত থাকে। মানবদেহে রক্তসঞ্চালনের দায়িত্বে থাকা হৃদয় মিনিটে সত্তর বার স্পন্দিত হয়। প্রতিটি স্পন্দনে হৃদয় সাধারণত ৭০ মিলিলিটার রক্ত সঞ্চালিত করতে পারে।

এ হিসাব থেকে দেখা যাচ্ছে, হৃদয় প্রতি মিনিটে প্রায় ৪.৯ লিটার রক্ত সঞ্চালন করতে সক্ষম, যেখানে পুরো শরীরে রক্ত থাকে মোট পাঁচ লিটারের মতো। অর্থাৎ প্রতি মিনিটে প্রায় সমস্ত রক্তই সঞ্চালিত হয়ে থাকে। এদিক থেকে বলা যায়, মানুষের শরীরে প্রতি মিনিটে সারা শরীর ঘুরে বেড়ায় প্রতিটি রক্তকণা।

সংকলনে: ***মিফতাহুল ইসলাম তালহা***

কম্পিউটার: ইনপুট পরিচিতি

কম্পিউটারের সাহায্যে কোনো কাজ সম্পন্ন করার জন্য প্রথমে কম্পিউটারকে ঐ কাজের তথ্য প্রদান করতে হয়। কম্পিউটারকে দেওয়া এই তথ্যই হচ্ছে ইনপুট (Input)। কম্পিউটারে ইনপুট প্রদানের জন্য অনেক রকম যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। এসব যন্ত্রকে বলা হয় ইনপুট ডিভাইস। সর্বাধিক ব্যবহৃত কিছু ইনপুট যন্ত্রপাতির বিবরণ দেওয়া হলো।

মাউস (Mouse)

মাউস হলো হাত দিয়ে নিয়ন্ত্রিত ইঁদুর সদৃশ একটি পয়েন্টিং ডিভাইস। এটি কীবোর্ডের নির্দেশ প্রদান ছাড়াই একটি কম্পিউটারকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। ১৯৬৩ সালে ডগলাস এঞ্জেলবার্ট মাউস আবিষ্কার করেন। ১৯৮৪ সালে মেকিন্টোস কম্পিউটারে সর্বপ্রথম মাউস ব্যবহৃত হয়। মাউস সমতলে নাড়ালে মনিটরের পর্দায় একটি তীর বা হাতের মতো চিহ্ন নড়াচড়া করতে দেখা যায়। একে কার্সর (Cursor) বলে। মাউস নড়াচড়া করে ইচ্ছেমতো কার্সরকে স্থানান্তর করা যায়। একটি স্ট্যান্ডার্ড মাউসে দুটি বা তিনটি বাটন থাকে। সাধারণভাবে বাম পাশের বাটন ব্যবহার করা হয়। তবে ডান পাশের বাটনে কিছু অতিরিক্ত অপশন রয়েছে যা কিছু কিছু প্রোগ্রামে কাজ করার সময় ব্যবহার করা হয়। স্ক্রল বাটনযুক্ত মাউসের স্ক্রল বাটন ঘুরিয়ে মনিটরে প্রদর্শনযোগ্য পৃষ্ঠাকে উপরে বা নিচে করে সহজেই দেখা যায়।

মাউস এর ব্যবহার (Use of Mouse)

পয়েন্টিং (Pointing): মাউস পয়েন্টারকে মনিটর স্ক্রীনের যে কোনো জায়গায় Move করানোকে পয়েন্টিং বলা হয়।

ক্লিক (Click): মাউসের বাটন একবার ক্লিক করে ছেড়ে দেওয়াকে সিঙ্গেল ক্লিক বা শুধু ক্লিক বলা হয়। মাউসের বাটন পরপর দুইবার চাপ দেওয়াকে ডাবল ক্লিক বলা হয়।

ড্র্যাগ এন্ড ড্রপ (Drag & Drop): কোনো ছবি, আইকন বা উইন্ডোকে সিলেক্ট করে মাউসের বাম বাটন চেপে ধরে টেনে আনাকে ড্র্যাগ বা ড্র্যাগিং বলা হয়। যে বিষয়ে ড্র্যাগ করা দরকার সেটির উপর মাউস পয়েন্টার নিয়ে ক্লিক করে সিলেক্ট করে মাউসের বাম বাটন চেপে ধরে যেখানে নেওয়া প্রয়োজন সেখানে টেনে এনে মাউসের বোতাম ছেড়ে দিতে হবে। এভাবে ড্র্যাগ করে ছেড়ে দেওয়াকে ড্রপিং বা ড্রপ বলা হয়।

সিলেক্ট (Select): কোনো অবজেক্ট (টেক্সট/Drawing/Picture ইত্যাদি) সিলেক্ট করতে হলে অবজেক্টের ডান বা বামদিকে আই-বিম ক্লিক করে মাউসে চাপ রেখে অবজেক্টের উপর দিয়ে বাম বা ডানদিকে টেনে নিয়ে যেতে হবে। এতে টেনে নিয়ে যাওয়া অংশটুকুর উপর অন্য রঙের আচ্ছাদন পড়ে যাবে। এ রকম অবজেক্টের উপর দিয়ে অন্য রঙের আচ্ছাদন পড়ে যাওয়া বা হাইলাইটেড (Highlighted) হয়ে যাওয়াকেই সিলেক্টেড হওয়া বলা হয়।

জয়স্টিক (Joystick)

জয়স্টিক হলো একটি ইনপুট ডিভাইস যাতে আয়তকার বেসের উপর একটি দন্ড বসানো থাকে। বেসের সাথে কম্পিউটারের সংযোগ থাকে। মনিটরের পর্দায় একটি ছোট আলোক চিহ্নকে বলে কার্সর। জয়স্টিকের সাহায্যে কার্সরকে পর্দার উপর ইচ্ছেমতো যে কোনো জায়গায় সরানো যায়। সাধারণত কম্পিউটারে গেম খেলতে জয়স্টিক ব্যবহৃত হয়। এছাড়া ভার্চুয়াল রিয়েলিটি এবং বিভিন্ন ধরনের সিমুলেশনের কাজেও জয়স্টিকের ব্যবহার রয়েছে।

ডিজিটাইজার (Digitizer)

ডিজিটাইজারে একটি আয়তকার চ্যাপ্টা ব্লক থাকে যাকে ডিজিটাইজার বোর্ড বলা হয়। বোর্ডের ভিতরে উপযুক্ত বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা আছে। একটি স্টাইলাস (কলমের মতো) এর সাহায্যে বোর্ডে যা কিছু লেখা বা আঁকা যায় তা মনিটরের পর্দায় ভেসে উঠে। ডিজিটাইজারের সাহায্যে বিভিন্ন গ্রাফ, ম্যাপ, বাড়ির নকশা ইত্যাদি সহজেই কম্পিউটারে ইনপুট দেওয়া যায়। বাংলাদেশ ভূমি জরিপ অধিদপ্তর ডিজিটাইজার ব্যবহার করে তাদের মৌজা ম্যাপগুলো সংরক্ষণ ও সম্পাদনা করেছে।

গ্রাফিক্স ট্যাবলেট (Graphics Tablet)

গ্রাফিক্স ট্যাবলেট কার্যত মাউসের বিকল্প যন্ত্র। গ্রাফিক্স ট্যাবলেট দেখতে অনেকটা পেন্সিলের স্লেটের মতো। বিশেষ কলম দিয়ে স্লেট বা প্যাডের উপরে ছবি বা কোনো অলংকরণের কাজ করা যায়। গ্রাফিক্স ট্যাবলেটের উপর বিশেষ কলমের লেখা প্রথমে গ্রাফিক্স ট্যাবলেট ধারণ ও সনাক্ত করে এবং x ও y স্থানাংক হিসেবে পর্দায় প্রেরণ করে।

লাইটপেন (Light Pen)

লাইট পেন দেখতে অনেকটা কলমের মতো, এজন্য এটির নাম দেওয়া হয়েছে লাইটপেন। এর এক মাথায় লাইট সেন্সর থাকে যা আলো অনুভব করতে পারে, অন্য প্রান্ত কম্পিউটারের সাথে যুক্ত। প্রকৌশল ডিজাইন, বিভিন্ন ধরনের নকশা বা ডায়াগ্রাম লাইট পেনের সাহায্যে করা যায়।

স্ক্যানার (Scanner)

স্ক্যানার অনেকটা ফটোকপি মেশিনের মতো। এর মাধ্যমে যে কোনো লেখা, ছবি, ড্রয়িং অবজেক্ট ইত্যাদি স্ক্যান করে কম্পিউটারে ডিজিটাল ইমেজ হিসেবে কনভার্ট করা যায়। পরবর্তীতে বিভিন্ন সফটওয়্যার যেমন, Adobe Photoshop এর মাধ্যমে ডিজিটাল ইমেজকে ইচ্ছেমতো এডিট করা যায়।

MICR

MICR এর সঠিক পূর্ণরূপ হলো Magnetic Ink Character Recognition। কিন্তু আমাদের অধিকাংশ পাঠ্যবইয়ে MICR এর পূর্ণরূপ Magnetic Ink Character Reader লেখা আছে। (সূত্র: প্রকৌশলী মুজিবুর রহমান রচিত দ্বাদশ শ্রেণির কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি)। প্রকৃতপক্ষে যে মেশিন MICR লেখা পড়তে পারে, তাকে MICR Reader বলে। চৌম্বক কালি বা ফেরোসোফেরিক অক্সাইডযুক্ত কালির সাহায্যে MICR লেখা হয়। এই কালিতে লেখা কাগজ শক্তিশালী চৌম্বকক্ষেত্রে রাখলে কালির ফেরোসোফেরিক অক্সাইড চুম্বকে পরিণত হয়। এরপর এই বর্ণচুম্বকগুলো তাড়িৎ চৌম্বকীয় আবেশের দ্বারা তড়িৎপ্রবাহ উৎপন্ন করে। এই আবিষ্ট তড়িৎপ্রবাহের মান থেকে কোনো বর্ণ পড়া হচ্ছে কম্পিউটার তা বুঝতে পারে ও সঞ্চিত রাখে। এই পদ্ধতিতে ব্যাংকের চেকের চেক নম্বর লেখা ও পড়া হয়। সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংকসহ সকল তফসিলি ব্যাংকে MICR যুক্ত চেক ব্যবহার বাধ্যতামূলক করেছে।

ওএমআর (Optical Mark Recognition- OMR)

অপটিক্যাল মার্ক রিডার এমন একটি যন্ত্র যা পেন্সিল বা কালির দাগ (OMR) বুঝতে পারে। পেন্সিলের দাগ বোঝা যায় পেন্সিলের সীসের উপাদান গ্রাফাইটের বিদ্যুৎ-পরিবাহিতা বিচার করে। কালির দাগ বোঝা যায় কালির দাগের আলোর প্রতিফলন বিচার করে। অপটিক্যাল মার্ক রিডার বিশেষ ব্যবস্থার সাহায্যে এই দাগগুলোর অস্তিত্ব বুঝতে পারে এবং সঠিক দাগ গণনা করতে পারে। অবজেকটিভ প্রশ্নের উত্তরপত্র পরীক্ষা, বাজার সমীক্ষা, জনগণনা ইত্যাদি কাজে OMR ব্যবহৃত হয়।

*সংকলনে: **মোহাম্মদ কামরুজ্জামান***

কবিতা

রায় বেরেলীর জঙ্গীপীর
ফররুখ আহমদ

সবাই যখন আরাম খুঁজে ছোটে ঘরের পানে
জঙ্গী পীরের ডাক শোনা যায় জঙ্গেরি ময়দানে।
সবাই ভাবে পীরের কথা শুনেছি তো ঢের
এমন পীরের কথাতো ভাই পাইনি কভু টের।
পাল্কী ছেড়ে পায়দলে বা তাজীতে সওয়ার
তসবি কোথায় হাতে যে তার নাঙ্গা তলোয়ার।
নাই জোব্বার রঙীন বাহার, সাজ সজ্জা নাই
হাত মেলালে বলেন তিনি, "লড়াই করা চাই"
বলেন শুধু, 'অন্যায় যা' করো ধূলিসাৎ
পাপ মুলুকে করো কায়েম দ্বীনী হুকুমাৎ।
ভুঁড়ির বহর বেশি যাদের পালান তারা সব
রুদ্ধ ঘরে আলোচনায় জমান কলরব,
তর্ক ধরেন ধর্ম নিয়ে হন না ঘরের বার
জামাত ভেঙ্গে করেন তাঁরা জিন্দিগী গুজার।
টাকা বাড়ে, ভুঁড়ি বাড়ে– বাড়ে রাতের ঘুম;
পথে পথে কেঁদে মরে মুসলিম মযলুম।
বিদেশ থেকে এলো কখন ফিরিঙ্গী ডাকাত
কৌশলে ভাই নিল কেড়ে তাদের হুকুমাৎ।
বন্দী থেকে সেই অবধি খাচ্ছে কেবল মার
শিকল পরা হাতে তাদের নাইকো হাতিয়ার।।

রায় বেরেলীর 'আওলিয়া পীর' সৈয়দ আহমদ
খান্দান যার সবার সেরা উচ্চ যাহার পদ
মুসলমানের বিপদ দেখে হলেন ঘরের বার
তসবি ছেড়ে হাতে নিলেন নাঙ্গা তলোয়ার।।

ভণ্ড যারা পালায় তারা পীরের সুরাত দেখে
সাচ্চা মুমিন পীরের কাছে জিহাদ করা শেখে।
হায়াত-মউত খোদার রাহে যিনি সপেন ভাই।
এমন পীরের কাছেই শুধু শিক্ষা নেওয়া চাই।
রায় বেরেলীর 'আওলিয়া পীর' মস্ত মুজাদ্দিদ
তার ডাকে ভাই মুসলমানের ভাঙে মরণ নিঁদ।।

মুসলমানের জামাত দেখে সবাই করে ভয়।
এক জামাতে এলেই তারা করবে জগৎ জয়!
শিখ মুলুকে ছিল রাজা বিষম যুলুমবাজ
মুসলমানের জামাত দেখে তুলিল আওয়াজ।।

হল্লা করে দল পাকালো হিংসুটে সব শিখ
রায় বেরেলীর আওলিয়া পীর বিপদে নির্ভীক!
খোদার নামে ঝাণ্ডা তুলে শংকাবিহীন প্রাণে
লক্ষবীরের সাথে লড়েন জঙ্গেরি ময়দানে।।
জিহাদী মেঘ ফাটলো আবার কালবৈশাখী ঝড়ে
জঙ্গী পীরের কথায় বুঝি যমীনে বাজ পড়ে।
সামনে লড়াই কঠিন দেখে চালাক শিখের রাজা
ভাবলো তখন পিছন থেকে দেবে কঠিন সাজা।।

হামলা করে পিছন থেকে, সামনে যেতে ভয়!
বালাকোটে শহীদ হলেন সেনানী দুর্জয়!
বুকের খুনে গেলেন এঁকে স্বাধীনতার পথ
রায় বেরেলীর জঙ্গী সে পীর নবীর উম্মত।।

সংগীত

রমজানের ঐ রোজার শেষে
কাজী নজরুল ইসলাম

ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ
তুই আপনাকে আজ বিলিয়ে দে, শোন আসমানী তাগিদ।
তোর সোনা-দানা, বালাখানা সব রাহে লিল্লাহ
দে যাকাত, মুর্দা মুসলিমের আজ ভাঙাইতে নিঁদ
ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ।
আজ পড়বি ঈদের নামাজ রে মন সেই সে ঈদগাহে
যে ময়দানে সব গাজী মুসলিম হয়েছে শহীদ।
ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ।
আজ ভুলে যা তোর দোস্ত-দুশমন, হাত মেলাও হাতে,
তোর প্রেম দিয়ে কর বিশ্ব নিখিল ইসলামে মুরিদ।
ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ।
যারা জীবন ভরে রাখছে রোজা, নিত্য উপবাসী
সেই গরীব ইয়াতীম মিসকিনে দে যা কিছু মুফিদ
ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ
আপনাকে আজ বিলিয়ে দে শোন আসমানী তাগিদ।
ঢাল হৃদয়ের তশতরীতে শিরনি তৌহিদের,
তোর দাওয়াত কবুল করবেন হজরত হয় মনে উম্মীদ।
ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ।
তোরে মারল ছুঁড়ে জীবন জুড়ে ইঁট পাথর যারা
সেই পাথর দিয়ে তোলরে গড়ে প্রেমেরই মসজিদ।
ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ
আপনাকে আজ বিলিয়ে দে শোন আসমানী তাগিদ।

একটি বালাকোটি গান
মুজাহিদ বুলবুল

সত্যের সংগ্রামী যেই চেতনা
জাগিয়ে দিয়েছো যা ম্লান হবে না
যুগে যুগে অমর রবে
চেতনায় সেই আজাদী
সায়্যিদ শহীদ আহমদ বেরলভী।

জিহাদের প্রয়োজনে রণাঙ্গনে
হাতে তুলে নিলে তলওয়ার
ইবাদাত মানে শুধু তাসবীর দানা নয়
চোখ খুলে দিলে জনতার
পথ দেখালে গড়ে দিলে
তরিকায়ে মুহাম্মদী
সায়্যিদ শহীদ আহমদ বেরলভী।

ব্রিটিশের দালালেরা মিথ্যাচারে
এখনও রয়েছে লিপ্ত
সব করে চুরমার বিপ্লবী রাহবার
তোমার চেতনা জাগ্রত
এক বালাকোট কোটি প্রাণে
তোলে জিহাদের দাবি
সায়্যিদ শহীদ আহমদ বেরলভী।

মুমিন হৃদয় জুড়ে তোমার আবাস
হোক যত মুনাফিকি ছল
মিথ্যার অজুহাতে যতই প্রলাপ
বকে যাক ভণ্ডের দল
হে মুজাদ্দিদ সিপাহসালার
সংগ্রামী প্রতিবাদী
সায়্যিদ শহীদ আহমদ বেরলভী।

মযলুমের দুআ

মুহাম্মদ উসমান গণি

নিরীহ জেলে। নিরহংকার ও সাদামাটা তাঁর জীবনাচার। নদীতে মাছ ধরে বিক্রি করে যা পায় তা দিয়ে সংসার চলে। কোনোদিন ভাগ্যে মাছ না জুটলে চুলায় হাঁড়ি বসে না। না খেয়ে দিন গুজরান করতে হয়।

একদিনের কথা। সকাল বেলা সে বের হয়েছে মাছ ধরার উদ্দেশ্যে। মাছ ধরে বিক্রি করবে, বিক্রিত টাকা দিয়ে ছেলে মেয়েদের জন্য খাবার নিয়ে ফিরবে। জেলে চলে যায় নদী অভিমুখে। এদিকে ছেলেমেয়েরা অপেক্ষমান। পিতা সন্ধ্যায় বাজার থেকে খাবার নিয়ে আসবে আর তারা আনন্দ ভরে খাবে। জেলে নদীতে গেল মাছও ধরল। মনে মনে খুব খুশি, আজকে তাহলে বাড়িতে ভালো কিছু খাবার নেওয়া যাবে। সন্তানগুলোও অনেকদিন যাবত ভালো কোনো খাবার চোখে দেখেনি। জেলের চোখে মুখে আনন্দের ঝিলিক খেলে যাচ্ছে। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস! মাছগুলো নিয়ে বাজারে যাবে ঠিক সেই মুহূর্তে স্থানীয় মাস্তান তাকে আক্রমণ করে বসে। ছিনিয়ে নেয় তার পুরো দিনের পরিশ্রমে ধরা মাছগুলো। গরীব জেলে আক্রমণকারীর সাথে শক্তিতে পারবে না মনে করে নিরুপায় হয়ে মাছগুলো দিয়ে দিলে সকল আনন্দ নিমিষেই নিঃশেষ হয়ে গেল। কষ্টভরা মন নিয়ে খালি হাতেই বাড়ি ফিরতে হলো। সন্তানগুলোও বাবার খালি হাত দেখে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে অসহায়ের মতো। অপরদিকে ছিনতাইকারী চরম খুশিতে মাছগুলো নেড়ে চেড়ে দেখছিল। হঠাৎ মাছের একটি কাঁটা ফুটে যায় তার আঙ্গুলে। ব্যথা নিয়েই বাড়ি ফিরল। চরম আয়েশে পেটপুরে খেল মাছগুলো। এদিকে আঙ্গুলের ব্যথা ধীরে ধীরে বাড়তে লাগল। ব্যথা মাত্রাতিরিক্ত হলে, স্মরণাপন্ন হলো ডাক্তারের। ডাক্তার ঔষধপত্র দিয়ে বললেন, যাও ব্যথা কমে যাবে। ঔষধ সেবন করেও কোনো কাজ হলো না ছিনতাইকারীর। আবারও ডাক্তারের কাছে ফিরে গেল। ডাক্তার অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা করে বললেন, আপনার একমাত্র সমাধান হলো, যে আঙ্গুলে ব্যথা সে আঙ্গুলটা কেটে ফেলতে হবে। অগত্যা তার আঙ্গুলটি কাটতেই হলো। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস! আঙ্গুল কাটার পরও ব্যথা কিন্তু কমলো না। সময়ের ব্যবধানে অন্যান্য আঙ্গুলেও ছড়িয়ে পড়তে লাগল বিষক্রিয়া। আবারও ডাক্তারের কাছে ছুটল। ডাক্তার এবার আরও কঠিন অপারেশনের সিদ্ধান্ত দিলেন। ডাক্তার তার হাতের কব্জি পর্যন্ত না কাটলে কোনো উপশমের সম্ভাবনা নেই বলে সিদ্ধান্ত দিলেন। কোনো উপায়ন্তর না দেখে শেষ পর্যন্ত হাতের কব্জি পর্যন্ত কাটতে বাধ্য হলো। কথায় আছে 'পাপ বাপকেও ছাড়ে না'। কব্জি কাটার পর ব্যথা কিন্তু একটুও কমেনি। উপায়ন্তর না দেখে আবারও ছুটল ডাক্তারের কাছে, ডাক্তারও খুব আশ্চর্য হন। আবারও পরীক্ষা নিরীক্ষা শেষে আরও কঠিন সিদ্ধান্ত দিলেন। ডাক্তার এবার বললেন আপনার পুরো হাতেই এর বিষক্রিয়া সংক্রমিত হয়ে গেছে। সুতরাং পুরো হাত কাঁধ পর্যন্ত আপনাকে কেটে ফেলতে হবে। শেষ পর্যন্ত পুরো হাত কেটে দেওয়া হলো। ব্যথা কমল কিন্তু হারাতে হলো তার একটি হাত ও উপার্জন ক্ষমতা। আসবাবপত্র সবকিছু বিক্রি করে একপর্যায়ে নিঃস্ব ভিখারীতে পরিণত হলো। হঠাৎ তার পূর্বপরিচিত এক ভদ্রলোকের সাথে দেখা। লোকটি তার এক হাত না দেখে বিস্মিত হন এবং হাত হারানোর কারণ জানতে চান। তাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কী কখনও কারো উপর যুলম করেছ? লোকটি তার কৃত মাছ ছিনতাইয়ের কথা বর্ণনা করল। তখন পরিচিত ভদ্র লোক তাকে বললেন, ওই লোকের উপর যুলম করার কারণেই তোমার এই পরিণতি। কারণ, মযলুমের দুআ আল্লাহ সাথে সাথে কবূল করেন। নবীজি ﷺ বলেছেন, মযলুমের বদদুআকে ভয় করো। তার আর আল্লাহর মাঝে কোনো পর্দা থাকে না।

নবীজি ﷺ আরো বলেন, তিন ব্যক্তির দুআ অবশ্যই কবূল করা হয়। এর মধ্যে একজন হলেন মযলুম।

লোকটি তার কৃতকর্মের কথা বুঝতে পারল। সে ঐ জেলে ব্যক্তির খুঁজে বের হলো। পেয়েও গেল ঐ জেলেকে। দেখতে পেল জেলে এক জায়গায় দিনমজুরের কাজ করছেন। লোকটি জেলের কাছে সে সময়ের ঘটনা খুলে বলল। জেলে বলল, আপনি যখন আমার সন্তানদের আহার আমার হাত থেকে কেড়ে নেন, তখন আমি একমাত্র আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করেছি। কারণ ঐ সময় আমার ফরিয়াদের জায়গা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কেউ ছিল না। আপনি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। আর এ পথে শক্তি থাকলেও কখনও পা বাড়াবেন না। হয়তো আল্লাহ আপনাকে অনুগ্রহ করবেন।

ঠ্যাং

আজমল খান

ছোট মাছ আর সস্তা দরের তরকারি খেয়ে অরুচি ধরে গেছে ছেলে মেয়েদের। এমন কি আমার নিজেরও। সেই কবে– ঈদের সময় কয়েক টুকরো মাংস মুখে পুরেছিলাম, তারপর আর মাংসের মুখ দেখিনি। দেখিনি ঠিক নয়, বাজারে গেলে একবার মাংসের দোকানগুলো ঘুরে আসি। মুরগির বাজারেও ঢু মারি। কিন্তু এ পর্যন্তই। কেনার সাহস হয় না। আসলে আমাদের মতো নিম্ন মধ্যবিত্তের বাজেট থেকে মাংসের আইটেমটা বাদই হয়ে গেছে প্রায়। বলতে দ্বিধা নেই, ভবিষ্যতে বোধ হয় বাদই থাকবে।

আজ ছুটির দিন। বাজারে গিয়ে দারুণ সাহসী হয়ে গেলাম। গতকাল বেতন পেয়েছি। কড়কড়ে নোট পকেটে। মুরগির বাজারে গিয়ে কোনো চিন্তা-ভাবনা না করেই কিনে ফেললাম একটি মুরগি।

মুরগিওয়ালাকে টাকা দিয়েই দমে গেলাম। মাসের শেষে টান পড়বে টাকায়। এতগুলো টাকা পূরণ করব কিভাবে? একটি পরিদপ্তরের হিসাব রক্ষণ বিভাগে চাকরি করি। আমার সহকর্মীরা বেতনের বাইরেও দু'পয়সা কামাই করেন। বিলেতি পাঁচশ পঞ্চান্ন সিগারেটও টানেন। অফিসে যাতায়াত করেন প্রাইভেট কারে চড়ে। আর আমি

যাই বাসের ভেতরের লোহার রড ধরে চ্যাপ্টা হয়ে দাঁড়িয়ে।
যাতায়াতের কথা মনে হতেই হঠাৎ চিন্তা মুক্ত হলাম। টাকাটা বোধ হয় পূরণ করতে পারব। আমার অফিস বাসা থেকে অল্প কয়েক মাইল মাত্র। প্রতি মাসে বাস ভাড়া লাগে ছয়-সাতশত টাকা। যদি এক মাস বাসে না গিয়ে হেঁটে যাই তাহলে টাকাটা পূরণ হয়ে যাবে অনায়াসে। মাত্র তো একটি মাস। দেখতে দেখতেই চলে যাবে। ছেলেমেয়েদের মুখের দিকে চেয়ে মাস খানেক না হয় একটু কষ্টই করলাম।

আমার হাতে ঝুলানো মুরগি দেখে ছেলেমেয়েরা খুশিতে হৈচৈ শুরু করে দিল। শোরগোল শুনে আমার স্ত্রী সাজেদা এলেন। হাতে মুরগি দেখে হাসলেন। এমনভাবে হাসলেন মনে হলো, তার এ হাসি আমি বহুদিন দেখিনি।

মুরগি জবাই হলো। রান্না হচ্ছে। গন্ধ পাচ্ছি শোবার রুম থেকে। ভুনা গোশতের স্বাদ ভুলেই গিয়েছি। লোকজন বেশি বলে সাজেদা গোশত রাঁধেন আলু বা অন্য কোনো তরকারি সহযোগে। ঝোল বেশি দেন। অবশ্য এতে স্বাদের এক আধটু তারতম্য হলেও অন্যান্য মশলাপাতি ও সাজেদার হাতের গুণে খেতে অপূর্ব লাগে।

বারোটার সময় গোসল সেরে নিলাম। খাবারের জন্য বসে আছি। রান্না হতে বড় দেরি হচ্ছে। একবার তাগিদ দিয়েও এলাম। সাজেদা বললেন, আরেকটু বসো। হয়ে গেছে প্রায়।

দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। কেউ এসেছে বোধ হয়। বড় ছেলে দরজা খুলে আগন্তুককে দেখে এসে বললো, আসগর চাচা এসেছেন।

তাঁকে বসতে বলো। আমি আসছি। জামা গায়ে দিয়ে বৈঠকখানায় এলাম। আসগর আমার প্রতিবেশি এবং বন্ধু। আমাকে বললেন, একটু বাইরে যেতে হয়, কামাল।

স্কুলের মিটিং বসেছে সামির মিয়ার বাসায়। তোমার সেখানে একটু যাওয়া দরকার। এই অসময়ে মিটিং?

মিটিং বসেছিল দশটায়। কিন্তু ক্যাশিয়ারের দায়িত্ব কাকে দেওয়া যায়, এ নিয়ে প্রচণ্ড বাক-বিতণ্ডা চলছে। তুমি না গেলে এর মীমাংসা হবে না। এ দিকটা তো তুমি ভালো বুঝো।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও যেতে হলো আসগরের সাথে। ক্যাশিয়ারের দায়িত্ব নিয়ে আলোচনা চললো বহুক্ষণ। কিন্তু আমার মন পড়ে আছে রান্না ঘরে। রান্না বোধ হয় হয়ে গেছে ইতোমধ্যে। ছেলেমেয়েদের খেতে দিয়েছে। সাজেদা আমার জন্য অপেক্ষা করছে। ঘড়ির দিকে তাকালাম। আড়াইটা বাজে। একটা অস্থিরতা অনুভব করলাম ভেতরে।

তিনটায় বেরিয়ে এলাম। সাজেদা বললেন, এতো দেরি করলে যে!

জবাব না দিয়ে হাত মুখ ধুতে গেলাম গোসলখানায়। এসে দেখি, ভাতের বোল টেবিলের উপর রেখে তরকারি আনতে গিয়েছেন। তার মানে মুরগির গোশত।

মুরগি আসছে। আসছে অত্যন্ত সুস্বাদু হয়ে। সাজেদার শাড়ি আর চুড়ির আওয়াজ পেলাম। হ্যাঁ, এসে গেছে। টেবিলের উপর ঢাকনা দেওয়া গোশতের বাটিটা রাখলেন তিনি।

মন্টু এসেছিল একটু আগে ওর দু'তিন জন বন্ধু-বান্ধব নিয়ে, বললেন সাজেদা।

মন্টু আমার ছোট শালা। জিজ্ঞেস করলাম, চলে গেছে ওরা?

হ্যাঁ।

একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। ওরা যে মাংসে ভাগ বসায়নি এর জন্যে ধন্যবাদ দিলাম ওদের।

পাশাপাশি নয়, সামনা সামনি খেতে বসলাম দু'জনে। গিন্নী বড় চামচ দিয়ে ভাত বাড়লেন দু'টো থালায়। বললেন, এতো কম দামের জিনিস দিয়ে কি অতো লোককে খাওয়ানো যায়?

মানে?

মন্টু আর ওর বন্ধু-বান্ধবদের খাইয়ে দিতে হলো। ছেলেমেয়েরা খেল। ক'টুকরো মাংসই বা ছিল মুরগির!

তাহলে কি আমাদের জন্য কিছু নেই। আমার কণ্ঠস্বরে শঙ্কা প্রকাশ পেল।

গিন্নি বুঝতে পেরে হেসে আশ্বাস দিলো আছে, তারপর তরকারির বাটির ঢাকনাটা আলগা করলেন।

প্রখর দৃষ্টি নিয়ে তাকালাম বাটির দিকে। আছে, বাটিতে আছে কিন্তু তবে সে আমার প্রার্থিত জিনিস নয়। বাটির অল্প একটু ঝোলের মধ্যে ভেসে আছে মুরগির রানের নিচের হাড় সর্বস্ব দু'টো ঠ্যাং।

আদিবার ইফতার

তাহেরা আখতার

এখনও আসরের আযান হয়নি। দারুল কিরাতের পড়া চলছে জোরেশোরে। ছাত্র শিক্ষক মিলে মোটে ছয়জন। দুই যবর দুই যের দুই পেশকে তানভীন বলে। পড়াচ্ছেন শিক্ষক, বাকীরা চিৎকার করে তা পুনরাবৃত্তি করছে। মিনিট পাঁচেক ধরে এভাবে চলল। শিক্ষকের গলা ধরে এল। তিনি ছাত্রদের সারিতে বসলেন। অন্য একজন দাঁড়িয়ে আবার শুরু করলেন, জযমওয়ালা নুনকে নুন ছাকিন বলে। দারুল কিরাত মানে ঘরে বসে পড়া, তারাও পড়ছেন পুবের ঘরের বারান্দায়। তবু উচ্চ আওয়াজ পুরো বাড়ি মাতিয়ে তুলেছে। হঠাৎ নজরুল সাহেব এসে বললেন, তোমাদের চিৎকারে তো বাড়ি থাকা যাচ্ছে না। বড় চাচা, চিৎকার করছি না। এখানে দারুল কিরাত চলছে, উত্তর দিল শিক্ষক উম্মে হানী আদিবা। নজরুল সাহেব হেসে বললেন, আচ্ছা তাহলে চলুক।

শিক্ষকের বয়স বছর ছয়েক হবে। ছাত্রদের বয়স তিন থেকে পাঁচের কোটায়। ছাত্র শিক্ষক যারা আছেন কেউ জানে না তানভীন বা নুন ছাকিন কী? এসব দেখতে কেমন। আদিবা একদিন মাকে বলেছিল, দারুল কিরাতে কী পড়া হয়? উত্তরে মা যা বলেছিলেন এতটুকুই তাদের পাঠ্য। গত বছর থেকে গ্রামের মক্তবে দারুল কিরাত হচ্ছে না। তাই বাড়িতেই চলছে আদিবাদের দারুল কিরাত।

আযান শোনা মাত্র ছুটি হলো। সবাই ঘরে ফিরল। আজ আখনি রান্না হচ্ছে। মুরাদ শরীফ, নাহিয়ান সবাই তৈরি হচ্ছে। আশপাশের বাড়িতে ইফতারি নিয়ে যেতে হবে। এমন সময় এল বৃষ্টি। কেউ বাইরে যাবে না। দাদু বললেন, এ বাড়িতে আখনি রান্না করে কখনও একা খাওয়া হয়নি। ছাতা নিয়ে যেতে হবে। নাহিয়ান দাবি করে বসল, হুমাম মৌলভী না গেলে তারা কেউ যাবে না। হুমাম মৌলভীর বয়স সবেমাত্র তিন বছর। আমিরাত থেকে বাবা কাবুলি পাঞ্জাবি ও তুর্কি টুপি পাঠিয়েছেন। এসব পরে মসজিদে গিয়েছিল হুমাম। সেদিন থেকে হুমাম মৌলভী খেতাব পেয়েছে। দাদু বলেছেন তার নাতি বড় হলে হাফিয সাহেব হবে।

বৃষ্টি কমে গেলে তারা দলবলে বাহির হলো। যা নিয়ে গিয়েছিল তার দিগুণ নিয়ে ফিরল। প্রতিবেশি চাচিরা খালি বাটি ফেরত দেননি। ইফতারের সময় খুব নিকটে। আদিবার চাচা সূরা মুলক তিলাওয়াত করছেন। মা গেলাসে শরবত ঢালছেন, আদিবা সবার সামনে পৌঁছে দিচ্ছে। মসজিদের চোঙা থেকে ভেসে এল 'আল্লাহু আকবার'। পুরো বাড়ি ছেঁয়ে গেল নিরবতায়।

এখনই সময়
পিয়ার মাহমুদ

অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকা ছাড়া
কি আর করার আছে বলো?
আমরাই বাজিয়েছি দু'হাতে তালি
বলেছি বাহ! বাহ! এগিয়ে চলো।

ইতিহাস ভুলে যাওয়া জাতি
কিছুদিন করি বলাবলি
তারপরে ভুলে যাই সব
পুরোনো পথেই আবার চলি।

কেউ কেউ স্বার্থের জালে হই বন্ধি
কেউ আবার নিঃস্বার্থেই করি সব
আগ-পিছ না ভেবেই বুঝে থাকি
হয়তোবা এখানেই খুশি হন রব।

না, এভাবেই চললে হবেনা তো আর
সিদ্ধান্ত নিতে হবে আবার
কার ডাকে সাড়া দেবো
কাকে ডেকে কাছে নেবো
সময় এসেছে এটা ভাববার।

ঈদের চাঁদ
সালাহ উদ্দিন ইবনে শিহাব

সুদূর আকাশে এলো ওই আবারো সে ঈদের চাঁদ
মুর্দা দিলে জাগে আশা জাগে আজাদির স্বপ্ন-সাধ;
মৃত দরিয়ায় জোয়ার এসেছে জেগেছে দুকূলে আশা
আজ বিদ্বেষ নেই চারদিকে শুধু নিখাদ ভালোবাসা।

আজ বাঁকা ধনুকে স্বপ্ন ফুটেছে আলোয় প্লাবিত মন
প্রেমে ও পূণ্যে সকল হৃদয়ে সকলে গড়েছে আসন;
পথে-পথে আজ সালাম-দুআ মুলাকাত সবার মাঝে
আজ ধনী ও গরীব নেই ব্যবধান একই জায়নামাযে।

আজকের মতো ফোটে যদি গো এমন সাম্য আলো
দিকে দিকে ফের জাগবে ঈমান কাটবে নিশিকালো;
ইরান তুরান ফোরাতের তীরে আসবে উমরী শাসন
ধুলোয় লুটাবে লাত মানাতের সকল আগ্রাসন।

এসো হে ঈদ এসো দুনিয়ায় নতুন করে আবার
হেরার আলোয় উঠুক কেঁপে আসন সে কিসরার;
শৃঙ্খল ভেঙে আসুক আজাদি বন্দি লাশের দেশে
নয়া দুনিয়ার নতুন শাসনে সূর্য্য উঠুক হেসে।

ধিক
শাহ সরোয়ার আলী

গায়ের জামা পরিপাটি
সুগন্ধি ও আছে বেশ
দাড়ি-টুপি সবই আছে
ঈমানেরতো নেই লেশ।

আমার কথা অন্যের কাছে
অন্যের কথা বাজারে
মুখোশধারী হিংস্র দেখি
আছে শত হাজারে।

মুখে যেমন মিষ্টি কথা
অন্তরেতে সাপের বিষ
চলাফেরায় সাধু বাবা
খুব ভয়ংকর তাহার শিস।

দেখতে লাগে ফিরিশতা আর
চরিত্রটা শয়তানের
আগলা থেকে ঝগড়া লাগায়
ফায়দা লুঠে সবখানের।

তোর হিসেবও হবে একদিন
মন থেকে দিলাম ধিক
এই সমাজে তুই হলে ওই
মানুষরূপি মুনাফিক।

এলো খুশির ঈদ
ইয়াহইয়া আহমদ চৌধুরী

মুমিন হৃদে খুশির জোয়ার
ঈদ এসেছে ঈদ
কি খুশিতে মাতোয়ারা
টুটলো চোখের নিদ।

নেই ভেদাভেদ ধনী গরীব
ফকির ও বাদশাহ
মস্তে টুপি হস্তে আতর
সুগন্ধির ঈদগাহ।

এক কাতারে নামায শেষে
কোলাকুলির টান
মুসাফাহা মুআনাকায়
ফিরবে ঈদের প্রাণ।

সব যাতনা দূর হয়ে যাক
ঈদের প্রেরণায়
একে অন্যের ভালোবাসা
উজ্জীবিত হোক ধরায়।

ঈদ
লিমান হোসাইন

দূর আকাশে ওই যে দেখো
চাঁদ উঠেছে চাঁদ
তাই বলে আজ সবার মাঝে
ভাঙ্গলো খুশির বাধ।

ধরার সবে ঈদের দিনে
খুশির বানে ভাসে
ধনী-গরীব চাষা-জেলে
একই সাথে হাসে।

সকল প্রকার বিভেদ ভুলে
কাঁধে মিলায় কাঁধ
এই তো হলো মিলন মেলা
দ্বীন ইসলামের স্বাদ।

বলতো দেখি?

এ সংখ্যার প্রশ্ন

১. ঈদ শব্দের অর্থ কী?
২. কম্পিউটারের মাউস কে আবিষ্কার করেন?
৩. হুদায়বিয়ার সন্ধি কত হিজরীতে হয়?
৫. 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ' এর লেখক কে?
৬. বালাকোট যুদ্ধ কবে সংঘটিত হয়?

গত সংখ্যার উত্তর

১. সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা (৩১৩ গ্রাম) অথবা সাড়ে সাত তোলা সোনা (প্রায় ৮৮ গ্রাম)
২. ৮টি
৩. ২০৯ হিজরীতে
৪. সাফওয়াতুত তাফাসীর
৫. ১৯৪৬ সালে

যাদের উত্তর সঠিক হয়েছে [প্রথম তিনজন পুরস্কৃত]

মুজাহিদুল ইসলাম সাজু, সিলেট সরকারি আলিয়া মাদরাসা, সিলেট # মো. রইছ উদ্দিন, পুরান পারকুল, কোম্পানীগঞ্জ, সিলেট # সাইদুল ইসলাম মামুন, সৎপুর দারুল হাদীস কামিল মাদরাসা, বিশ্বনাথ, সিলেট # মো. ওলিউল্লাহ, সিলেট পাল্প এন্ড পেপার মিলস মাদরাসা, ছাতক, সুনামগঞ্জ # রাহীন আহমদ সালেহ, হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা, সোবহানীঘাট, সিলেট # আব্দুল্লাহ আল হোসাইন, হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা, সোবহানীঘাট, সিলেট # মাছুমা বেগম, মনজলাল, বিরাহিমপুর, মোগলাবাজার, সিলেট # তাহিয়াত মাহবুবা, সম্রাট টাওয়ার-০১, শাহজালাল লতিফিয়া আ/এ, সোবহানীঘাট, সিলেট # তাহমিনা বেগম, মনজলাল, বিরাহিমপুর, মোগলাবাজার, সিলেট # আব্দুল হাই মাসুম, বাংগালীয়া, করিমপুর, রাজনগর, মৌলভীবাজার # রাহিমা চৌধুরী ঊর্মি, বরমচাল উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, বরমচাল, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী, কমলগঞ্জ সরকারি মডেল উচ্চ বিদ্যালয়, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার # আলী আহমদ ফাহিম, মনজলাল, বিরাহিমপুর, মোগলাবাজার, সিলেট # মো. শাহজাহান আলম, সহকারি শিক্ষক, কুলাউড়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # মো. ফাহিম উদ্দিন, তালিমপুর বাহারপুর ইয়াকুবিয়া দাখিল মাদরাসা, বড়লেখা, মৌলভীবাজার # মো. রায়হান হোসেন, মৌলভীবাজার টাউন কামিল মাদরাসা, মৌলভীবাজার # সাদিয়া আক্তার ঝুমা, মাইজপাড়া দাখিল মাদরাসা, মৌলভীবাজার।

আন্দালিব ভাই সমীপে...

প্রিয় আন্দালিব ভাই! পরওয়ানা এপ্রিল সংখ্যার প্রচ্ছদ খুবই চমৎকার হয়েছে। রামাদান সংখ্যা হিসেবে প্রচ্ছদটি খুবই মানানসই হয়েছে। পাশাপাশি ভেতরের লেখাগুলোও সময়োপযোগী। পরওয়ানার উত্তরোত্তর উন্নতি ও সফলতা কামনা করে শেষ করছি।

ইসতিয়াক আহমদ জামি
শিক্ষার্থী, লতিফিয়া ইসলামিক কিন্ডারগার্টেন, সোবহানীঘাট, সিলেট

-আন্দালিব ভাই: তোমার অভিব্যক্তির জন্য ধন্যবাদ। তোমাদের অংশগ্রহণ পরওয়ানাকে আরো হৃদয়গ্রাহী করে তুলবে। পরওয়ানার সাথেই থাকবে আশা করি। তোমার জন্য অনেক শুভকামনা।

প্রিয় আন্দালিব ভাই! আমি পরওয়ানার নিয়মিত পাঠক। পরওয়ানার সকল লেখার পাশাপাশি জীবন জিজ্ঞাসা বিভাগটি আমার ভীষণ ভালো লাগে। অনেক অজানাকে জানার সুযোগ হয় এ বিভাগের মাধ্যমে। আবাবীল ফৌজের ছোট ছোট গল্প ও ছড়া-কবিতাগুলোও বেশ মজাদার হয়। পরওয়ানা পরিবারকে ধন্যবাদ সুন্দর সুন্দর জিনিস উপহার দেওয়ার জন্য।

মো. মিজানুর রহমান
হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা, সোবহানীঘাট, সিলেট

-আন্দালিব ভাই: পরওয়ানার বিভিন্ন বিভাগ তোমার ভালো লাগে শুনে খুশি হলাম। আবাবীল ফৌজে তুমিও অংশগ্রহণ করতে পারো। পরওয়ানা নিয়মিত পড়ার পাশাপাশি তোমার বন্ধুদেরও পাঠক বানাবে। তোমার জন্য শুভকামনা রইল।

প্রিয় আন্দালিব ভাই! পরওয়ানায় অনেকেই চিঠি লিখেন। আমি পড়িও নিয়মিত। কিন্তু জানি না কীভাবে লিখতে হয়। সাহস করে তোমাকে লিখে পাঠালাম। আশা করি উত্তর দিবেন।

হাসানুল হক আব্দুল্লাহ
জামিয়া হোসাইনিয়া আসআদুল উলূম নূরানী কিন্ডারগার্টেন ও হাফিযিয়া মাদরাসা, শাহজালাল উপশহর, সিলেট

আন্দালিব ভাই, কথায় আছে, সাহসে হিম্মত। তুমি সাহস করে লিখেছ বলেই তো তোমার উত্তর দিয়ে দিলাম। এবার সাহস বেড়েছে তো? তুমি যেভাবে চিঠি লিখেছ এভাবেই সবসময় লিখে যাও কেমন। তোমার জন্য শুভকামনা রইল।

প্রিয় আন্দালিব ভাই! আবাবীল ফৌজের লেখাগুলো আমার ভীষণ ভালো লাগে। আমি খুব মনোযোগ সহকারে আবাবীলের লেখাগুলো পড়ি। আমি জানতে চাই আমিও কী লিখতে পারব এ বিভাগে?

ইসমাইল হোসেন তামীম
বায়তুন নূর মাদরাসা, মেরাদিয়া, রামপুরা, ঢাকা

-আন্দালিব ভাই: তুমি আবাবীল ফৌজের একজন যত্নশীল পাঠক জেনে খুশি হলাম। তোমাকে ফৌজের পক্ষ থেকে অভিনন্দন। হ্যাঁ, অবশ্যই তুমিও লিখতে পারো এ বিভাগে। ছোট গল্প,

ছড়া-কবিতা, হাসতে জানিসহ শিশুতোষ যেকোনো বিষয়ে লিখতে পারো স্বাচ্ছন্দ্যে।

প্রিয় আন্দালিব ভাই! রামাদান সংখ্যা খুব সুন্দর হয়েছে। আমল, আকীদা, মাসআলা-মাসাইল সংক্রান্ত তথ্য ও মাহে রামাদানে করণীয় বিভিন্ন আমল বাতানোর জন্য পরওয়ানা পরিবারকে ধন্যবাদ জানাই।

এছাড়াও আবাবীল ফৌজের বন্ধুদের লেখা গল্প, ছড়া/কবিতা খুবই ভালো হয়েছে। তাদেরও ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং প্রত্যেকের নেক হায়াত ও সুস্থতা কামনা করছি। এদিকে রামাদান সংখ্যায় সমাপ্তি ঘটলো উজবেকিস্তানে ওলী আউলিয়ার পাশে সফরনামার। গত চারটি সংখ্যা জুড়ে এ রচনার পরিধি ছিল। এতে ফুটে উঠেছে মুসলিম মনীষীদের যাদের নাম ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ তাদের কর্ম ইতিহাস। ইসলামী স্থাপত্য, নিদর্শন, শাসনামল ও ইসলামের প্রচার-প্রসারের ইতিহাস এই সফরনামায় ফুটে উঠেছে। লেখক অত্যন্ত সুন্দরভাবে তাঁর প্রতিদিনের কার্যক্রম এখানে উপস্থাপন করেছেন।

এভাবে ইসলামী ইতিহাস, স্থাপত্য, নিদর্শন পরওয়ানায় ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করার এবং ঈদ সংখ্যায় ঈদুল ফিতরের প্রয়োজনীয় আমল, মাসআলা-মাসাইল প্রকাশের কামনা করছি।

বদরুল ইসলাম
ডাইকের বাজার, নোয়াগাঁও, ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট

আন্দালিব ভাই: তোমার ফিডব্যাকের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আবাবীল ফৌজের লেখকদের কাছে তোমার ধন্যবাদবার্তা পাঠিয়ে দিলাম। রামাদান সংখ্যা সম্পর্কে তোমার মূল্যায়নকে সাধুবাদ জানাই। সফরনামা তোমার খুব ভালো লেগেছে জেনে খুশি হলাম। আমরা চেষ্টা করব লেখকের অন্য কোনো সফরের লেখা সংগ্রহ করার। তুমিও লিখে যেও নিয়মিত। তোমার জন্য রইল শুভকামনা।

সদস্য কুপন

প্রিয় আন্দালিব ভাই, আমি 'আবাবীল ফৌজ' এর সদস্য হতে চাই। আমার বয়স ১৬ বছরের বেশি নয়। আমি ফৌজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে নিজেকে সচেষ্ট রাখবো।

নাম: ----------

পিতা/অভিভাবক: ----------

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: ---------- শ্রেণি: ----------

গ্রাম: ---------- ডাক: ----------

থানা: ---------- জেলা: ----------

কুপনটি পূরণ করে ডাকযোগে নিচের ঠিকানায় অথবা ছবি তুলে ই-মেইলে পাঠিয়ে দাও।

আন্দালিব ভাই
পরিচালক, আবাবীল ফৌজ
মাসিক পরওয়ানা
বি.এন টাওয়ার, ২৮/১ বি, দৈনিক বাংলা মোড়, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
সিলেট অফিস: পরওয়ানা ভবন ৭৪, শাহজালাল লতিফিয়া আ/এ, সোবহানীঘাট সিলেট-৩১০০

Mobile: 01799 629090, E-mail: parwanaafbd@gmail.com

আন্দালিব ভাইয়ের চিঠি

সুপ্রিয় বন্ধুরা!

চলছে মাহে রামাদান। সিয়াম সাধনা ও তারাবীহ আদায়ের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হচ্ছে তোমাদের রামাদানের রুটিন।

এ মাসের শেষ দশকে রয়েছে হাজার রজনীর চেয়ে উত্তম লাইলাতুল কদর। কদরের রাতের ইবাদাতে অবশ্যই তোমরা মনোনিবেশ করবে। আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে দুআ করবে। দুআ করবে নিজের জন্য। মা-বাবা, ভাই-বোন ও সকল আত্মীয়-স্বজনের জন্য। রামাদান শেষ হলেই আমাদের মাঝে সমাগত হবে পবিত্র ঈদুল ফিতর। মুসলিম বিশ্ব এক আনন্দ হিল্লোলে মেতে ওঠবে এইদিন। তোমরা অনেকেই ঈদকে কেন্দ্র করে নতুন জামা কেনার উৎসবে মেতে ওঠবে। ঈদগাহে যাবে, নামায পড়বে। মহান রবের কাছে নিজের ও বিশ্ব মুসলিমের জন্য মুনাজাত করবে। আল্লাহর কাছে এই মহামারী সংকট থেকে পরিত্রাণের প্রার্থনা করবে।

ঈদের এই আনন্দে তোমার আশপাশের দুঃখী মানুষগুলোকে ভুলে গেলে চলবে না কিন্তু। তাদের পাশে অবশ্যই দাঁড়াতে হবে। সাধ্যানুযায়ী তাদেরও নতুন জামার ব্যবস্থা করতে হবে। মনে রাখবে, তোমার আনন্দের সাথে তারাও যেন ঈদের পরিপূর্ণ আনন্দে মেতে ওঠতে পারে সেদিকে খেয়াল রাখা খুবই জরুরি।

বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯ এর কারণে গত বছরের ন্যায় এ বছরও দারুল কিরাতের পাঠদান সম্ভব হয়নি। এতে তোমাদের মনে যেমন কষ্টের অনুভব হচ্ছে তেমনি সকল কুরআন প্রেমিকদেরও কষ্ট অনুভব হচ্ছে। তাই বলে কুরআন তিলাওয়াত বন্ধ রাখা যাবে না। প্রয়োজনে বাসায় তোমার ভাইবোনদের নিয়ে একসাথে তিলাওয়াতের আসর বসাবে। বড়দের কাছ থেকে কুরআন চর্চা চালিয়ে যেতে হবে এবং নিয়মিত তিলাওয়াত করতে হবে।

বন্ধুরা, তোমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এখনো খুলেনি। ক্লাস হচ্ছে অনলাইনে। এখন অনলাইনের ক্লাসগুলোকেই গুরুত্ব দিতে হবে। আর পাশাপাশি বাসায় চালিয়ে যেতে হবে পড়াশোনা।

এদিকে মহাসংকট অতিক্রম করছে আজকের বিশ্ব। এই সংকট থেকে মহান আল্লাহ আমাদেরকে পরিত্রাণ না করলে আমাদের কোনো শক্তি নেই এই কঠিন সংকট থেকে মুক্ত হওয়ার। আল্লাহর কাছে সর্বদা সুরক্ষার দুআ করতে হবে।

পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষ্যে ফৌজের সকল বন্ধুদের জানাচ্ছি ঈদ মুবারক। ঈদ বয়ে আনুক তোমাদের জীবনে অনাবিল শান্তি, সুখ ও সমৃদ্ধি।

সবশেষে বলব, তোমরা সচেতন থাকবে। নিয়ম শৃঙ্খলা ও স্বাস্থ্যবিধি নিয়মিত পালন করবে। তোমাদের সুস্বাস্থ্য ও মঙ্গল কামনা করে আজকের জন্য বিদায় নিচ্ছি।

শুভেচ্ছাসহ
তোমাদেরই আন্দালিব ভাই

শব্দকল্প

১	২	■	৩	৪	৫
৬		৭	■	৮	
	■	৯	১০	■	
■	১১			১২	■
১৩	■	১৪			১৫
১৬			■	১৭	

সূত্র : পাশাপাশি

১। বৃহত্তম মুসলিম উৎসব ৩। সামর্থবান মুসলিমের উপর প্রযোজ্য আর্থিক ইবাদত ৬। লক্ষস্থল ৮। লোহিত কণিকা ৯। পাখি বিশেষ ১১। উপস্থাপিত বিষয় ১৪। পরজীবি উদ্ভিদ ১৬। পূত, বিশুদ্ধ ১৭। ব্রততী, কুঞ্জ

সূত্র : উপর-নীচ

১। প্রখর দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন পাখি ২। দাঁত ৪। অবধি, পর্যন্ত ৫। ডাকঘরের চিঠি পৌঁছে দেন যিনি ৭। রোগীকে প্রদত্ত চিকিৎসকের পরামর্শপত্র ১০। সমাধি ১২। সংস্পর্শ, নৈকট্য ১৩। উষ্ণতা ১৫। রোদ বৃষ্টি থেকে রক্ষার প্রয়োজনীয় জিনিস

গত সংখ্যার সমাধান

রা	মা	দা	ন	■	বি
গ	গ	ন	■	■	ন
■	ফি	■	ত	ন	য়া
কি	রা	ত	■	■	ব
না	ত	■	কা	ন	ন
রা	■	হি	দা	য়া	ত

গত সংখ্যার শব্দকল্পের পরিকল্পনাকারী

মো. নাছির উদ্দিন তালহা

দ্বীনী সিনিয়র আলিম মডেল মাদরাসা, সদর, সুনামগঞ্জ

শব্দকল্পে যাদের উত্তর সঠিক হয়েছে (প্রথম তিনজন পুরস্কৃত)

মুহাম্মদ কাওছার মাহমুদ, শাহজালাল জামেয়া ইসলামিয়া কামিল মাদরাসা, পাঠানটুলা, সিলেট # তাহিয়াত মাহবুবা, সম্রাট টাওয়ার-০১, শাহজালাল লতিফিয়া আ/এ, সোবহানীঘাট, সিলেট # জান্নাতুল ফেরদৌস মরিয়ম, শাহজালাল লতিফিয়া আ/এ, সোবহানীঘাট, সিলেট # তায়্যিবা আক্তার চাঁদনী, ক্লাসিক স্কুল এন্ড কলেজ, শাহজালাল উপশহর, সিলেট # রেদওয়ান আহমদ মুস্তাকিম, হযরত শাহজালাল লতিফিয়া দাখিল মাদরাসা, লতিফনগর আবাসিক প্রকল্প, মিরের চক, শাহপরাণ, সিলেট # মো. ওলিউল্লাহ, সিলেট পাল্প এন্ড পেপার মিলস আদর্শ দাখিল মাদরাসা, ছাতক, সুনামগঞ্জ # সাব্বির আহমদ, ক্লাসিক স্কুল এন্ড কলেজ, শাহজালাল উপশহর, সিলেট # মাইনুল হক আব্দুল্লাহ, জামিয়া হুসাইনিয়া আসআদুল উলূম নূরানী কিন্ডারগার্টেন ও হাফিযিয়া মাদরাসা, শাহজালাল উপশহর, সিলেট # তুফাজ্জল হোসেন, ক্লাসিক স্কুল এন্ড কলেজ, শাহজালাল উপশহর, সিলেট # সাবিহা সুলতানা, বনশ্রী, রামপুরা, ঢাকা # মাহবুবা জান্নাত ছামিয়া, ছকাপন উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, কাদিপুর, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # রাসেদ আহমদ, হাসিমপুর আহমদিয়া দাখিল মাদরাসা, কাদিপুর, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার।

বর্ণকল্প

এ সংখ্যার বর্ণকল্প

বর্ণগুলো এলোমেলো আছে। এগুলো সাজিয়ে কেন্দ্রের ফাঁকা ঘরে একটি মাত্র বর্ণ বসালে চারটি অর্থবোধক শব্দ তৈরি হবে। চেষ্টা করে দেখতো অর্থসহ শব্দ চারটি তৈরি করতে পারো কি না! সঠিক উত্তরদাতাদের নাম আগামী সংখ্যায় ছাপা হবে।

গত সংখ্যার সমাধান

গত সংখ্যার পরিকল্পনাকারী

বুরহান উদ্দিন

শিমুলকান্দি, ভৈরব, কিশোরগঞ্জ

বর্ণকল্পে যাদের উত্তর সঠিক হয়েছে

তাহিয়াত মাহবুবা, হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা, সোবহানীঘাট, সিলেট # মহরম আলী, চিতলিয়া, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার # ফাহিম উদ্দিন, তালিমপুর বাহারপুর ইয়াকুবিয়া দাখিল মাদরাসা, বড়লেখা, মৌলভীবাজার # রাহীন আহমদ সালেহ, দক্ষিণ রাইগ দাড়া, ওসমানীনগর, সিলেট # মো. জাবেল আহমদ, দক্ষিণ ভবানীপুর, জুড়ী, মৌলভীবাজার # আনোয়ার হোসেন সাইফ, হাউসা আলিম মাদরাসা, সদর, সিলেট # মিছবাহ উদ্দিন চৌধুরী, ইছামতি দারুল উলুম কামিল মাদরাসা, ইছামতি, জকিগঞ্জ, সিলেট # মাহদিয়া হক, চানপুর, জাউয়া বাজার, ছাতক, সুনামগঞ্জ # আহমদ আল মারুফ, লতিফিয়া ইসলামিক আইডিয়াল একাডেমী, আটগ্রাম, জকিগঞ্জ, সিলেট # সুমাইয়া ফেরদৌস তান্নি, হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা, সোবহানীঘাট, সিলেট # সাদিয়া আক্তার ঝুমা, মাইজপাড়া দাখিল মাদরাসা, মৌলভীবাজার # মো. রায়হান হোসেন, মৌলভীবাজার টাউন কামিল মাদরাসা, মৌলভীবাজার # আবিদা সুলতানা ইমা, মাইজপাড়া দাখিল মাদরাসা, মৌলভীবাজার # মোতাহির রহমান তানজিম, রঙ প্রিন্টার্স, রংমহল টাওয়ার, বন্দরবাজার, সিলেট # সাজ্জাদুর রহমান সাগর, টেককামাল পুর, বিশ্বনাথ, সিলেট # মো. আবু রায়হান, পতনউষার, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার # মো. ছমর উদ্দিন, বারহাল হাটুবিল গাউছিয়া দাখিল মাদরাসা, বারহাল, জকিগঞ্জ, সিলেট # মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী, কমলগঞ্জ সরকারি মডেল উচ্চ বিদ্যালয়, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার # বদরুল ইসলাম, নোয়াগাও, ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট # মোজাহিদুল ইসলাম হাসান, মৌলভীবাজার টাউন কামিল মাদরাসা, মৌলভীবাজার # কাওছার আহমদ, গণকিয়া আলিম মাদরাসা, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # মো. ইমরান উদ্দিন, মৌলভীবাজার টাউন কামিল মাদরাসা, মৌলভীবাজার # আলী আহমদ ফাহিম, জালালিয়া সিনিয়র ফাযিল মাদরাসা, সিলেট # মোহাম্মদ আব্দুল লতিফ, সৎপুর কামিল মাদরাসা, বিশ্বনাথ, সিলেট # জাবির আহমেদ ইয়াহইয়া, ছৈলা, পীরগঞ্জ বাজার, ছাতক, সুনামগঞ্জ # সাইদুল ইসলাম মামুন, সৎপুর দারুল হাদীস কামিল মাদরাসা, বিশ্বনাথ, সিলেট # মো. রইছ উদ্দিন, পুরান পারকুল, কোম্পানীগঞ্জ, সিলেট # আব্দুল্লাহ আল হোসাইন, হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা, সোবহানীঘাট, সিলেট # মাছুমা বেগম, মনজলাল, বিরাহিমপুর, মোগলাবাজার, সিলেট # তাহমিনা বেগম, মনজলাল, বিরাহিমপুর, মোগলাবাজার, সিলেট # আব্দুল হাই মাসুম, মৌলভীবাজার টাউন কামিল মাদরাসা, মৌলভীবাজার # রোমান আহমদ, বরমচাল উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, বরমচাল, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # ওলিউল্লাহ, সিলেট পাল্প এন্ড পেপার মিলস আদর্শ দাখিল মাদরাসা, ছাতক, সুনামগঞ্জ।

হাসতে জানি

মরুভূমিতে দৌড়

আমি যখন মরুভূমিতে গিয়েছিলাম তখন আমার কারণে একটি বেদুইন গোষ্ঠী দৌড়ের ওপর ছিল। একদিন তামীম কথাগুলো বলছেন গর্বের সঙ্গে। কিন্তু কীভাবে?

একেবারে সহজ। হঠাৎ ওদের সামনে দিয়ে যেই দৌড় লাগিয়েছি, অমনি পুরো দলটা আমার পিছু পিছু দৌড় লাগাল, ব্যস।

কালামনের ষাঁড়

এক কালামনের ষাঁড় রহিমের বাগানের বেড়া ভেঙে ভেতরে ঢুকে তছনছ করে দিয়ে মালিকের কাছে ফিরে গেল। রহিম পুরো ব্যাপারটা লক্ষ্য করলেন, তারপর একটা বেত নিয়ে বেরিয়ে এসে ষাঁড়টাকে পেটাতে শুরু করলেন। কোন সাহসে আমার ষাঁড়কে আপনি পেটাচ্ছেন! কালামন চেঁচিয়ে বলল। কিছু মনে করবেন না আপনি, রহিম বললেন, ও পুরো ব্যাপারটা জানে। এটা ওর আর আমার ব্যাপার!

গাধার পিঠে লবণ বোঝাই

একদিন কলিম উদ্দিন গাধার পিঠে লবণ বোঝাই করে বাজারের দিকে রওনা দিলেন। পথে একটা নদী পড়ল। গাধাসহ নদী পার হলেন। কিন্তু নদীর পানিতে লবণ গলে একাকার। পণ্য হারিয়ে কলিম উদ্দিন বিরক্ত। গাধা তো মহা খুশি বোঝা থেকে বেঁচে গিয়ে।

এর পরেরবারও কলিম উদ্দিন ওই পথ দিয়ে গেলেন, তবে এবার তুলা বোঝাই করে। গাধা যখন নদী পার হলো তখন তুলা ভিজে ওজন বেড়ে গেল। গাধা ওজনদার মাল নিয়ে টলমল পায়ে এগিয়ে যেতে লাগল।

কলিম উদ্দিন চেঁচিয়ে বললেন, ভেবেছিলি প্রতিবার পানি দিয়ে গেলে পিঠের ওপরের মালের ওজন কমে যাবে, তাই না?

বিড়াল সব গোশত খেয়ে ফেলেছে

মিনহাজ উদ্দিন এক কেজি গোশত কিনে এনে গিন্নিকে দিলেন রান্না করতে। গিন্নি রান্নার পর সব গোশত খেয়ে ফেললো। মিনহাজ উদ্দিন নদী থেকে গোসল সেরে এসে খেতে বসলে গোশত না দেখে জিজ্ঞেস করলে গিন্নি জানালো, বিড়াল সব গোশত খেয়ে ফেলেছে।

মিনহাজ উদ্দিন তাড়াতাড়ি বিড়ালটাকে ধরে ওজন করে দেখলেন যে সেটার ওজন এক কেজি। গিন্নিকে তখন বললেন, এটা যদি বিড়াল হয় তবে গোশত কোথায়, আর এটা যদি গোশত হয় তবে বিড়ালটা কোথায়?

সংগ্রহে:
ডা: আব্দুল জলিল
মা ফার্মেসি, হাকালুকি বাজার,
কালীকৃষ্ণপুর, গোলাপগঞ্জ, সিলেট

অদ্ভুত পৃথিবী

রেসট্র্যাক প্লায়া

আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ার ডেথ ভ্যালিতে অবস্থিত রেসট্র্যাক প্লায়া বা চলমান পাথর উপত্যকা। এখানের পাথরগুলো আপাতদৃষ্টিতে দেখলে মনে হবে নিজে নিজেই স্থান পরিবর্তন করে। পাথরগুলিকে চলমান অবস্থায় কেউ কখনো দেখেনি, তবুও পাতলা কাদার স্তরে থেকে যাওয়া ছাপ থেকে পাথরগুলোর স্থান পরিবর্তন নিশ্চিত হওয়া যায়। কিছু কিছু পাথরের কয়েকশ পাউন্ড পর্যন্ত ওজন হয়। এই ভারি ভারি পাথরগুলো কিভাবে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যায়। সে রহস্য আজও উন্মোচিত হয়নি।

পাথরের ট্রেইলে রেখে যাওয়া সূক্ষ্ম ছাপ থেকে বোঝা যায় পাথরগুলো এমন সময়ে স্থান পরিবর্তন করে যখন উপত্যকায় পাতলা কাদামাটির আস্তরণ রয়েছে । মানুষ বা অন্য কোনো প্রাণীর দ্বারা পাথরের স্থান পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও আশপাশের কাদায় তাদের কোনো চিহ্ন পাওয়া যায় না। রেসট্র্যাক প্লায়ার এমন বিশ্বয়কর ঘটনাটি বিশেষজ্ঞদের নজরে আসে ১৯৪৮ সালে। বিজ্ঞানীরা আজও পাথরের চলার ভিন্নতার কারণ রহস্য উন্মোচন করতে পারেন নি।

তবে প্রায় অর্ধশত বছর ধরে এই রহস্যটি নিয়ে গবেষণা চালিয়ে কিছু বিজ্ঞানী ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, হয়তো বাতাস, পানির স্রোত এবং বরফখণ্ডের ধাক্কার প্রভাবে তা হতে পারে। তবে এ দাবির পক্ষে কোনো বিশেষ প্রমাণ দেখাতে পারেননি বিজ্ঞানীরা।

আবাবিল ফৌজের সদস্য হলো যারা

৩০৫১. বদরুল ইসলাম
পিতা: মো. তাহির আলী
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: ফেঞ্চুগঞ্জ সরকারি কলেজ
গ্রাম: নোয়াগাঁও
ডাক: দনারাম
থানা: ফেঞ্চুগঞ্জ
জেলা: সিলেট

৩০৫২. মারজানা আক্তার
পিতা: মো. লিটন মিয়া
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: ইলামের গাঁও উচ্চ বিদ্যালয়
গ্রাম: গড়গাঁও
ডাক: বিশ্বনাথ
থানা: বিশ্বনাথ
জেলা: সিলেট

৩০৫৩. রেদওয়ান আহমদ মুস্তাকিম
পিতা: মো. রিয়াজ মিয়া
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ লতিফিয়া দাখিল মাদরাসা
গ্রাম: মুক্তিরচক
ডাক: মুক্তিরচক
থানা: সিলেট সদর
জেলা: সিলেট

৩০৫৪. মুহাম্মদ আব্দুল করিম
পিতা: আব্দুর রহমান
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: সৎপুর দারুল হাদীস কামিল মাদরাসা
গ্রাম: কালাগুল
ডাক: সাহেবের বাজার
থানা: বিমানবন্দর
জেলা: সিলেট

৩০৫৫. মোছা. রাহিমা চৌধুরী ঊর্মি
পিতা: সাহেল আলী চৌধুরী
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: বরমচাল স্কুল ও কলেজ
গ্রাম: ইটাখলা
ডাক: বরমচাল
থানা: কুলাউড়া
জেলা: মৌলভীবাজার

৩০৫৬. মোছা. সাহেরা আক্তার মুক্তা
মো. ফজর আলী
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: সিলেট পাল্প এন্ড পেপার মিলস আদর্শ দাখিল মাদরাসা
গ্রাম: বাশখলা
ডাক: পেপার মিলস
থানা: ছাতক
জেলা: সুনামগঞ্জ

৩০৫৭. তাহসিন হাসান তুহিন
পিতা: খলিলুর রহমান
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: হাউসা আলিম মাদরাসা
গ্রাম: হাউসা
ডাক: বলাউরা বাজার
থানা: জালালাবাদ
জেলা: সিলেট

৩০৫৮. মাছুম আহমদ
পিতা: আজাদ আহমদ
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: সিলেট আলিয়া মাদরাসা
গ্রাম: চান্দগ্রাম
ডাক: চান্দগ্রাম বাজার
থানা: বড়লেখা
জেলা: মৌলভীবাজার

৩০৫৯. জাহেদা আক্তার শবনম
পিতা: মাওলানা মুফতি মোকাররাম আলী
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: রাখালগঞ্জ দারুল কুরআন ফাযিল মাদরাসা
গ্রাম: মুন্সিপাড়া
ডাক: কৈলাশ্র
থানা: গোলাপগঞ্জ
জেলা: সিলেট

৩০৬০. জুনাইদ আহমদ
পিতা: জিল্লুর রহমান
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: লাকেশ্বর দাখিল মাদরাসা
গ্রাম: বড়পলিরগাঁও
ডাক: লাকেশ্বর বাজার
থানা: ছাতক
জেলা: সুনামগঞ্জ

৩০৬১. মোহাম্মদ মাহি ফরাজী
পিতা: মো. আব্দুর রেহান ফরাজী মুজিব
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: মশরিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
গ্রাম: উত্তর নন্দীউড়া
ডাক: কর্ণিগ্রাম
থানা: রাজনগর
জেলা: মৌলভীবাজার

[আবাবীল ফৌজের বন্ধুরা! তোমরা যে কেউ পরিকল্পনা করে 'শব্দকল্প', 'বর্ণকল্প', অথবা শিক্ষামূলক 'ছোটগল্প' ও 'ছড়া/কবিতা' লিখে পাঠাতে পারো। অবশ্যই লেখা পাঠানোর ক্ষেত্রে নিচের নিয়মগুলো মেনে চলবে। আর মনে রাখবে, প্রত্যেক লেখার কপি রেখে পাঠাতে হবে, কারণ অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া হয় না।]

নিয়মাবলি

- আবাবীল ফৌজের সদস্য হতে হলে নির্ধারিত সদস্য কুপনটি পূরণ করে ডাকযোগে অথবা ছবি তুলে ই-মেইলে পাঠাতে হবে।
- ইসলামী ভাবধারার যেকোনো উন্নত মানের শিশুতোষ রচনা এ বিভাগে ছাপা হয়। সর্বোপরি শিশু-কিশোরদের প্রতিভা বিকাশ, তাদেরকে ইসলামী মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ করে সাংস্কৃতিক বিপ্লব সাধনের জন্যই 'আবাবীল ফৌজ'।
- লেখা সংক্ষিপ্ত হতে হবে। লেখার সাথে লেখকের পূর্ণ ঠিকানা থাকা চাই।
- বলতো দেখি, শব্দকল্প ও বর্ণকল্পের জবাব ও সমাধান চলতি মাসের ১৬ তারিখের মধ্যেই পত্রিকা অফিসে পৌঁছাতে হবে।
- 'বলতো দেখি'র সঠিক জবাবদাতাদের মধ্য থেকে নম্বরের ভিত্তিতে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান নির্ধারণ করে তাদেরকে পুরস্কৃত করা হবে।
- আবাবীল ফৌজের যেকোনো সদস্যের তৈরি করে পাঠানো শব্দকল্প, বর্ণকল্প মনোনীত ও প্রকাশিত হলে তাকে আকর্ষণীয় পুরস্কার প্রদান করা হবে।
- বর্ণকল্পে অংশগ্রহণকারী সঠিক জবাবদাতাদের নাম- ঠিকানা পরবর্তী সংখ্যায় যত্ন সহকারে ছাপানো হবে।
- A4 কাগজে স্পষ্ট করে হাতে লিখে অথবা কম্পোজ করে আবাবীল ফৌজের ঠিকানায় পাঠাতে হবে।
- ই-মেইলে লেখা পাঠানোর ক্ষেত্রে অবশ্যই আবাবীল ফৌজ ও লেখার শিরোনাম উল্লেখ করতে হবে।
- ই-মেইলের ক্ষেত্রে প্রতিটি লেখা স্বতন্ত্র ফাইল করে মেইলের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।
- প্রতিটি লেখার সাথে নিজের নাম, পূর্ণ ঠিকানা, যোগাযোগ নম্বর, শ্রেণি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম লিখে পাঠাতে হবে।

চিঠিপত্র

বুলেটের মূল্য কত?

গণতান্ত্রিক বাংলাদেশে মিছিল সমাবেশ সাংবিধানিক অধিকার। অথচ রাস্তায় বের হলেই পুলিশের গুলিতে মরছে মানুষ। গত এক মাসে এ চিত্র আরো বিভীষিকাময় রূপলাভ করছে। মোদি বিরোধী মিছিলে সারাদেশে মারা গেল ১৭ জন। ফরিদপুরে লকডাউন বিরোধী মিছিলে ঝরে গেল আরো একটি প্রাণ। চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে বকেয়া বেতন ভাতার দাবিতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করে বিদ্যুৎকেন্দ্রের শ্রমিকরা। সেখানেও পুলিশের বেপরোয়া গুলিতে পাঁচজন মারা যান। এখানে তো কথিত রাষ্ট্রদ্রোহের কিছু ছিল না।

ইটপাটকেলের জবাবে পুলিশেকে নির্বিচারের গুলি চালানোর অনুমতি কে দিল এটা জানতে চাচ্ছি না। একটি প্রাণের মূল্য কত? ২০১৮ সালে রাজধানীতে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত দুই শিক্ষার্থীর পরিবারকে প্রধানমন্ত্রীর তহবিল থেকে ২০ লাখ করে দেওয়া হয়েছিল। আন্দোলনরত ছাত্ররা প্রতীকী লাশ সামনে নিয়ে ২০ লাখ করে নিলাম হাঁকতে থাকে। বিগত তিন বছরে এ লাশের মূল্য কমবেশি হলো কিনা , তাও জানার ইচ্ছে নেই।

জানতে চাচ্ছি, দেশের মানুষের টাকায় কেনা যে বুলেট ছুড়ছে পুলিশ তার মূল্য কত? বুলেটের অপচয় জাতীয় অর্থনীতিতে প্রভাব ফেলবে না তো?

মো. আতিকুর রহমান
পোর্টস মাউথ, ইউকে

লকডাউনের বিকল্প ভাবতে হবে

করোনার প্রাদুর্ভাব প্রতিরোধে গত বছর থেকে সময়ে সময়ে লকডাউন নামক অবরোধে দিন পার করছি। কখনও শিথিল বা কখনও সর্বাত্মক। এর ফলে রাজধানী বা জেলা শহর থেকে চাকরিজীবী ও ব্যবসায়ীদের গ্রামে যেতে বাধ্য করা হয়। গণপরিবহণে ঠাসাঠাসি করে গ্রামে যাওয়া ও ফিরে আসায় সামাজিক দূরত্ব চরমভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে।

এদিকে মাছ-তরকারি ও ফলমূলের আড়তে প্রতিদিন যে পরিমাণ ক্রেতা-বিক্রেতার যে সমাগম হয় তা ভয়ানক। আবার প্রতি পরিবারের কেউ না কেউ প্রতিদিন নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য ক্রয়ে বাইরে যেতে হচ্ছে। যেহেতু করোনাভাইরাস ব্যক্তি থেকে ব্যক্তি পর্যায়ে ছড়ায় তাই কোন পরিবারই এই ঝুকি থেকে মুক্ত নয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে লকডাউন কোনো সুরক্ষিত পন্থা নয়। অধিকন্তু লকডাউন পারিবারিক ব্যয় সংকুলান ও জাতীয় অর্থনীতিতে ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। সুতরাং এটা দীর্ঘস্থায়ী করাও সম্ভবপর নয়। এক্ষেত্রে সামাজিক দূরত্ব ও কঠোর স্বাস্থ্যবিধি মেনে আবারও স্বাভাবিক পরিবেশে ফিরে আসা সঠিক সমাধান হতে পারে। এ বিষয়ে নীতিনির্ধারণী কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

হোসেন মাহমুদ
সিলেট

পাঠকের প্রতি,
আপনার চারপাশের প্রয়োজনীয়তা ও সমস্যা নিয়ে অনধিক ২০০ শব্দে চিঠি লিখে chitipatra.parwana@gmail.com-এ পাঠিয়ে দিন। —বিভাগীয় সম্পাদক

বিশ্বের সর্বাধুনিক প্রযুক্তি, উন্নত স্বাস্থ্যসেবা
সর্বোচ্চ মান নিয়ে আমরা আছি আপনার পাশে

- আই.সি.ইউ
- এন.আই.সি.ইউ
- পি.আই.সি.ইউ
- পি. এইচ. ডি. ইউ
- সি.সি.ইউ, এইচডিইউ
- ডেন্টাল কেয়ার
- জেনারেল সার্জারী
- ডায়ালাইসিস ইউনিট
- নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা
- ২৪ ঘন্টা ফার্মেসী বিভাগ
- ২৪ ঘন্টা জরুরী বিভাগ
- মাদার এন্ড চাইল্ড কেয়ার
- ২৪/৭ ডায়াগনস্টিক সার্ভিস
- আই.সি.ইউ এম্বুলেন্স সার্ভিস
- ইনফার্টিলিটি (বন্ধ্যাত্ব) কেয়ার।

ওয়েসিস হসপিটাল
সোবহানীঘাট, সিলেট

Subhanighat, Sylhet

E-mail: oasishospitals@gmail.com, info@oasishospitalbd.com, Cell: 01611-990000, 01763-990055

শতভাগ প্রস্তুতি নিয়ে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অর্জনে

বই পড়ুন!

লেকচার

মাদরাসা সিরিজের

লেকচার একের ভিতর সব (২য় থেকে ৮ম শ্রেণি)

লেকচার সমাপনী পরীক্ষা সহায়িকা (পঞ্চম ও অষ্টম)

লেকচার কাওয়াইদুল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ (৩য়-১০ম শ্রেণি)

লেকচার দাখিল অনুশীলনমূলক বই

লেকচার আলিম কিতাব সিরিজ

লেকচার বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি (৩য়-১০ম শ্রেণি)

লেকচার আলিম অনুশীলনমূলক বই

লেকচার ফাযিল (অনার্স) হ্যান্ডনোট সিরিজ

Lecture
Practial English
Grammar And Composition
(Class 3-10)

লেকচার ফাযিল (অনার্স) টেক্সটবুক সিরিজ

লেকচার প্রশ্নপত্র সাজেশন্স (পঞ্চম, অষ্টম, দাখিল ও আলিম)

লেকচার সাপ্লিমেন্ট সিরিজ (দাখিল ও আলিম)

লেকচার ফাযিল স্নাতক (পাস) হ্যান্ডনোট সিরিজ

লেকচার মডেল টেস্ট (পঞ্চম, অষ্টম, দাখিল ও আলিম)

অপ্রতিরোধ্য মেধাবীদের পথপ্রদর্শক
লেকচার পাবলিকেশন্স লি.

HELP LINE 01991-181468
Email: madrasah@lecturepublications.com

RTM AL-KABIR TECHNICAL UNIVERSITY
(RTM-AKTU)
ADMISSION
OPEN
CSE EEE ENGLISH
BBA MBA MPH
40%-100%
WAIVER
ON
TUITION FEE
HOTLINE :
01324 310050
01322 533651
East Shahi Eidgah TB Gate, Sylhet
www.rtm-aktu.edu.bd
info@rtm-aktu.edu.bd
Rtm International
RTMI-HRDC
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার অনুমোদিত বাংলাদেশ রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা অনুষদ
কর্তৃক নিবন্ধিত এবং বাংলাদেশ নার্সিং এন্ড মিডওয়াইফারি কাউন্সিল কর্তৃক নিবন্ধিত
নিজস্ব স্থায়ী ক্যাম্পাস ও ছাত্রী হোস্টেল সুবিধা
আর.টি.এম.আই. নার্সিং কলেজ, ম্যাটস, প্যারামেডিক এবং হেলথ টেকনোলজি ইন্সটিটিউট
আমাদের কোর্স সমূহ
ম্যাটস (ডিএমএফ)
(ভর্তি যোগ্যতা : বিজ্ঞান বিভাগে SSC/ সমমান)
৪ বছর
বেসিক বিএসসি ইন নার্সিং
৪ বছর
হেলথ টেকনোলজি কোর্স সমূহ :
ফার্মেসী ল্যাব/প্যাথলজি ফিজিওথেরাপী
(ভর্তি যোগ্যতা : বিজ্ঞান বিভাগে SSC/ সমমান)
৩ বছর
ভর্তি চলছে
পোস্ট বেসিক বিএসসি ইন নার্সিং
২ বছর
ডিপ্লোমা ইন নার্সিং সাইন্স এন্ড মিডওয়াইফারি
(ভর্তি যোগ্যতা : যে কোন বিভাগে HSC/ সমমান)
৩ বছর
ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি
(ভর্তি যোগ্যতা : যে কোন বিভাগে HSC/ সমমান)
৩ বছর
২ বছর
কমিউনিটি প্যারামেডিক
(ভর্তি যোগ্যতা : যে কোন বিভাগে SSC/ সমমান)
আর.টি.এম.আই-এইচ.আর.ডি.সি কমপ্লেক্স, টিবি গেইট (পুর্ব শাহী ঈদগাহ) সিলেট।
মোবাইল : ০১৭৬৬-৮৫৭৩২২, ০১৭১৫-৬৪৪৬৬৬, ০১৭১৭-৫১৯৮৯৪